তফসীরে নূরুল কোরআন

অষ্টম পারা

৮

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

অষ্টম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

অষ্টম খন্ড

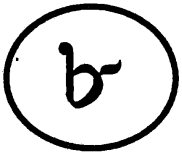

অষ্টম পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, মরহুম ইমাম ও খতীব, লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

تفسير نور القران
للعلامة محمد امين الاسلام
الجزء الثامن

চতুর্থ প্রকাশ	ঃ	রজব-১৪৩৮ এপ্রিল-২০১৭ চৈত্র-১৪২৩
প্রকাশক	ঃ	মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
সর্বস্বত্ব	ঃ	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে	ঃ	নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১১০০
হাদিয়া	ঃ	৩০০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (8): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam (R). Published by Al-Balag Publications. 12/17, Sir Sayed Ahmed Road. Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889
Price : 300.00

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের অষ্টম খণ্ড (অষ্টম পারা) পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। যদি সারা জীবন, সর্বক্ষণ এ নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় করতে থাকি তবুও শোকর গুজারীর হক্ব আদায় হবে না। অগণিত দরুদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আল্লাহ্ পাক তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন।

আল্লাহ্ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ যুগোপযুগী মোজেযা দান করেছেন।

"মোজেযা" শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হল যে জিনিস অন্যকে তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে অপারগ এবং অক্ষম করে দেয়। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে যাদুবিদ্যা প্রসার লাভ করেছিলো, ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় হাজার হাজার যাদুকর একত্রিত করেছিলো। তারা তাদের যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে মূসা (আঃ)-এর দিকে লক্ষাধিক সাপ ছেড়ে দেয়। আল্লাহ্ পাক মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেনঃ হে মূসা! তোমার হাতের লাঠিটি ছেড়ে দাও। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি তখন বিরাট অজগর সর্পে পরিণত হল যা যাদুকরদের সকল সর্পকে এক মুহূর্তের মধ্যে গিলে ফেলে। তাদের যাদুবিদ্যা এখানেই শেষ হল। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মোকাবেলায় অপারগ হল। তাই বলা হয় হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক লাঠির মোজেযা দান করেছেন।

ঠিক এভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিলো। তাই আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে মোজেযা দান করলেন। তিনি জন্মান্ধকে ফুঁক দিলে সে চক্ষুষ্মান হত। যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের যুগ শেষ হয়েছে, তাই তাঁর মোযেজাও শেষ হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগ শেষ হয়েছে তাই তাঁর মোজেযার যুগও শেষ হয়েছে, কেননা মোযেজা নবুওয়্যতের দলিল হয়ে থাকে।

আর যেহেতু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বকালের জন্যে নবী হিসেবে আগমন করেছেন, তিনি স্ব-শরীরে পৃথিবীতে

বর্তমান না থাকলেও কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়্যত বহাল থাকবে, তাই তাঁকে এমন মোজেযা দান করা হয়েছে যা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর তা হল পবিত্র কোরআন।

আজ থেকে ১৪২৪ বছর পূর্বে যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তাঁর আবির্ভাব হয় তখন কাব্য সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল, তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে মোজেযা স্বরূপ পবিত্র কোরআন দান করেন এবং পবিত্র কোরআন আরববাসীকে চ্যালেঞ্জ করল। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا. الاية

"আমি যা কিছু আমার বন্দার প্রতি নাযিল করেছি তার ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তবে পবিত্র কোরআনের অনুরূপ একখানি সূরা তোমরা আনয়ন কর"।

আরববাসী ৩ আয়াত বিশিষ্ট পবিত্র কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা কাওসারের অনুরূপ রচনা পেশ করতে অক্ষম হয়ে লিখে দিয়েছিলঃ

ليس هذا اكلام البشر

"এ নয় মানুষের কথা"।

পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকার, তার বর্ণনা-শৈলীর সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য আরববাসী বুঝত, সঙ্গে সঙ্গে একথাও উপলব্ধি করত যে, এর মোকাবেলা করতে তারা সম্পূর্ণ অপারগ, অক্ষম। পবিত্র কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরেই আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে কিন্তু পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করা ইতিপূর্বেও সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবেনা।

হযরত সালেহ (আঃ)-এর মোজেযা ছিল পাথর থেকে বের হয়ে আসা একটি উষ্ট্রী। হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা ছিল তাঁর লাঠি। এসব মোজেযাই চোখে দেখা যেত। যে জিনিস দেখা যায় দর্শকের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তা-ও বিদায় হয়। পবিত্র কোরআন এমন একটি মোজেযা যা শুধু চর্ম চক্ষে নয়; বরং জ্ঞান-চক্ষেও দেখা যায়, তাই এ মোজেযা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে।

প্রশ্ন হল কি কারণে পবিত্র কোরআন মোজেযা হল? এ প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ

১. যেহেতু পবিত্র কোরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার বিবরণ পেশ করেছে পবিত্র কোরআন, যা পরবর্তীতে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। আর এমন কথা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

২. পবিত্র কোরআন পূর্বকালের ঘটনাবলী এভাবে বর্ণনা করে যেন কোন প্রত্যক্ষদর্শী তার দেখা ঘটনার বর্ণনা দেয়। এটিও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কেননা, মানুষ যেমন ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলতে পারেনা, ঠিক তেমনি অতীত সম্পর্কেও সে কিছুই জানেনা।

৩. পবিত্র কোরআন মানুষের মনের কথা বলে দেয়, মানুষ যা তার মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে অত্যন্ত যত্নসহকারে গোপন রাখে তার সন্ধান দেয় পবিত্র কোরআন। যিনি অন্তর্যামী, তিনি ব্যতীত আর কারো পক্ষেই এ কাজ সম্ভব নয়।

৪. পবিত্র কোরআনের এক আয়াতের সঙ্গে অন্য আয়াতের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথচ প্রত্যেক আয়াতেই স্বতন্ত্র বক্তব্য রয়েছে। বক্তব্যের স্বাতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও একটি কথা আরেকটি কথার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। এটি এমনি একটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষের কথা বা রচনায় পাওয়া যায় না।

৫. পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকার, ভাবের উচ্ছ্বাস অদ্বিতীয়, অনন্য- সাধারণ। আর এ অবস্থা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে নয়, বরং সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, কোথাও এর অনুপস্থিতি নেই। মানব রচনায় এ অবস্থা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়।

৬. পবিত্র কোরআনের যে সৌন্দর্য এবং তার ভাষার যে মাধুর্য সমঝদার পাঠক উপলব্ধি করে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেনা। যেমন কোন মধুর কণ্ঠী ব্যক্তির কণ্ঠের মধুরতা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারেন যাদেরকে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন।

৭. পবিত্র কোরআনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যখন পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা হয় তখন মানব মন তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়, যদি শ্রোতা অর্থ বোঝে তবে তো কথাই নেই, আর যদি কেউ অর্থ না বোঝে তবুও শ্রবণ করতেই মন চায়।

বস্তুতঃ এত হৃদয়গ্রাহী কালাম পেশ করা কোন মানুষের পক্ষে কোনদিন সম্ভবই নয়।

৮. পবিত্র কোরআন পাঠ করার অথবা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মানব অন্তরে এক প্রকার ভয় ভীতি সৃষ্টি হয় যা কোন মানব রচিত গ্রন্থের ব্যাপারে অকল্পনীয়। যেমন কোরআনে করীমেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

"যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি দেখতে যে তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে"। (সূরা হাশর)

৯. তত্ত্বজ্ঞানীদের একদল এ মত পোষণ করেন যে, পবিত্র কোরআন মোজেযা হওয়ার আরেকটি কারণ হল তা অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছুই তাতে রয়েছে। পবিত্র কোরআনেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِكُلِّ شَيْءٍ.

"আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা"।

১০. তত্ত্বজ্ঞানীগণ আরো বলেছেন, পবিত্র কোরআন মোজেযা হওয়ার আরেকটি কারণ হল পবিত্র কোরআন যত বারই পাঠ করা হোক না কেন কোনদিন তা পুরাতন মনে হয়না। পাঠক তা পাঠ করে ক্লান্তি বোধ করেনা। এমনভাবে শ্রোতাও পবিত্র কোরআন যতবারই শ্রবণ করুক তার আকর্ষণ এতটুকু কমেনা, অথচ কোন মানব রচিত গ্রন্থ এমন হয় না।

১১. তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম একথাও বলেছেন যে, পবিত্র কোরআনে এত এলম একত্রিত করা হয়েছে যার সংখ্যা নির্ণয় করাও অসম্ভব।

১২. মানব রচিত গ্রন্থে কোন কথা বেশী থাকে আবার কোন কথা কমও থাকে অথচ আল্লাহ পাকের মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন এত বিস্ময়কর, এত বৈশিষ্ট্য মন্ডিত যে, এতে একটি শব্দও বেশী বা অপ্রয়োজনীয় নেই। অথবা একটি শব্দ কমও নেই।

১৩. পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব ও তথ্য কোন দিন শেষ হবার নয়; যুগে যুগে মানব মনে যে সব নব নব জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হবে তার বিস্ময়কর জবাব পাওয়া যাবে পবিত্র কোরআনে এবং বিভিন্ন যুগে মানব জীবনে যে সব সমস্যা দেখা দেবে তার সমাধান পাওয়া যাবে পবিত্র কোরআনে। মূলতঃ এ কারণেই যুগে যুগে, বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের তফসীর হয়েছে এবং হতে থাকবে। যুগ-সমস্যার সমাধান পেশ করতে পবিত্র কোরআন কোনদিন কার্পণ্য করেনি, ভবিষ্যতেও করবেনা। মানব জীবনকে সাফল্য মন্ডিত করতে হলে, বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে হলে এবং বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। আর এ প্রয়োজনের আয়োজনেই তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা। আল্লাহ পাকের তৌফিকেই এ মহান গ্রন্থের অষ্টম খন্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

এ শুভলগ্নে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীতভাবে আরজী পেশ করি হে আল্লাহ! এই অধমের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল কর এবং তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান কর এবং যাঁরা তোমার রহমতের নজর লাভ করে ধন্য হয়েছেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত কর, আমীন।

বিনীত–
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
৯. ৯. ৯০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

সূচিপত্র

তফসীরুল কোরআন ১২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১২
তারা ঈমান আনবেনা ১২
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতি সান্ত্বনা ১৩
হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে ১৪
শয়তান হলো মানুষের শত্রু ১৪
আখেরাতের প্রতি ঈমান হল রক্ষাকবচ ১৬
তফসীরুল কোরআন ১৮
শানে নুযুল ১৮
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৮
পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য ১৯
কাফেরদের সাজানো কথার নমুনা ২৩
পৌত্তলিকদের অসৎ উদ্দেশ্য ২৪
শানে নুযুল সম্পর্কে আরও কথা ২৪
তফসীরুল কোরআন ২৬
আয়াতের মর্মকথা ২৮
তফসীরুল কোরআন ৩১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৩১
শানে নুযুল ৩১
আয়াতের মর্মকথা ৩২
মোমেন জীবিত, কাফের মৃত ৩২
মানব জীবনের উদ্দেশ্য ৩৩
উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা ৩৩
শানে নুযুল ৩৫
আয়াতের মর্মকথা ৩৫
তফসীরুল কোরআন ৩৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৩৭
হেদায়েত লাভে আল্লাহ পাকের তওফিক পূর্বশর্ত ৩৭
শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভীর (রহঃ) মন্তব্য ৩৯
তফসীরুল কোরআন ৪৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৪৪
কাফেরদের শাস্তি প্রসঙ্গ ৪৫
আলোচ্য আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা ৫১
তফসীরুল কোরআন ৫২

দুনিয়ার জীবন প্রতারণা..... ৫৩
দুনিয়ার জিন্দেগীর দৃষ্টান্ত..... ৫৩
জ্বীনদের মধ্য থেকে কি কোন রসূল হয়েছিলো?..... ৫৪
তফসীরুল কোরআন..... ৫৭
আল্লাহর সৃষ্টি চার প্রকার..... ৫৯
আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন..... ৬০
তিনিই দয়াবান..... ৬০
কেয়ামত অবশ্যই আসবে..... ৬১
ইতিহাসের অমোঘ বিধান..... ৬৩
তফসীরুল কোরআন..... ৬৪
শানে নুযুল..... ৬৫
তফসীরুল কোরআন..... ৬৭
তফসীরুল কোরআন..... ৭০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক..... ৭২
আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব মহিমা..... ৭২
"হক্ব" শব্দের ব্যাখ্যা..... ৭৩
আয়াতের মর্মকথা..... ৭৭
তফসীরুল কোরআন..... ৭৮
শানে নুযুল..... ৭৮
জালেম হেদায়েতের পথ থেকে চির বঞ্চিত..... ৮০
আয়াতের মর্মকথা..... ৮০
তফসীরুল কোরআন..... ৮২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক..... ৮২
তফসীরুল কোরআন..... ৮৬
আয়াতাংশের অন্য একটি ব্যাখ্যা..... ৯১
তফসীরুল কোরআন..... ৯৩
শানে নুযুল..... ৯৪
আয়াতের বৈশিষ্ট্য..... ৯৫
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর ওসিয়তনামা..... ৯৫
সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহ হল শেরক..... ৯৬
আধুনিক কাল ও আলোচ্য আয়াত..... ১০২
তফসীরুল কোরআন..... ১০৪
অভিভাবকদের জন্যে সময়সীমা..... ১০৫
এতীমের হক্ব রক্ষা করার বিশেষ তাগিদ..... ১০৫
সীরাতুল মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা..... ১০৯
তফসীরুল কোরআন..... ১১৪
ইসলাম গ্রহণ না করার কোন ওজর রইল না..... ১১৫
পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদের তালিকা..... ১১৬

তফসীরুল কোরআন ১১৯
কেয়ামতের আলামত সমূহ ১২১
ঈমান কখন উপকারে আসবে না ১২২
দাজ্জালের ফেতনা ১২৩
ইমাম মাহদী (আঃ) প্রসঙ্গে ১২৫
তফসীরুল কোরআন ১৩৯
সূরা আরাফ প্রসঙ্গে ১৪৭
পূর্ববর্তী সূরার সঙ্গে সম্পর্ক ১৪৭
পবিত্র কোরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত ১৫১
মানুষ দু' প্রকার ১৫২
তফসীরুল কোরআন ১৫৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৫৭
দ্বিতীয় অভিমত ১৫৯
তৃতীয় অভিমত ১৬০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে ১৬৬
তফসীরুল কোরআন ১৬৯
তফসীরুল কোরআন ১৭৬
তফসীরুল কোরআন ১৮১
অদৃষ্টের লিখন কে করবে খন্ডন ১৮২
শানে নুযুল ১৮৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৮৭
তাকওয়ার পোষাক ১৮৮
তফসীরুল কোরআন ১৯১
ন্যায় বিচার কায়েম করার আদেশ ১৯৩
তফসীরুল কোরআন ১৯৭
শানে নুযুল ১৯৭
নামাযের জন্যে উত্তম পোষাক ১৯৭
মাসআলা ১৯৮
এসরাফের তাৎপর্য ১৯৯
এক আয়াত দ্বারা ৭টি মাসআলা ২০০
চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে ২০০
উত্তম পোষাক, সুস্বাদু খাবার ইসলামের পরিপন্থী নয় ২০১
তফসীরুল কোরআন ২০৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২০৬
বাতিল ফেরকা কাদিয়ানীদের পথভ্রষ্টতা ২০৮
তফসীরুল কোরআন ২১২
তফসীরুল কোরআন ২১৬
জান্নাতীদের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করার তাৎপর্য ২১৯

বেহেশতবাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা ২২১
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ২২২
তফসীরুল কোরআন ২২৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২২৪
জান্নাতবাসী ও দোযখীদের মধ্যে কথাবার্তা ২২৪
তফসীরুল কোরআন ২৩০
দোযখীদের আবেদন ২৩২
তফসীরুল কোরআন ২৩৪
তফসীরুল কোরআন ২৩৯
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৩৯
সৃষ্টির জন্যে ছয় দিনের প্রয়োজন কেন হলো? ২৪০
আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বে রাত দিন কিভাবে পরিচিত হয়েছে ২৪০
জিকর তিন প্রকার ২৪৪
জিকিরে খফীর ফজিলত ২৪৫
সীমালঙ্ঘন না করার তাগিদ ২৪৬
দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত ২৪৮
তফসীরুল কোরআন ২৫১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৫২
হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশ পরিচয় ২৫৪
নামকরণ ২৫৪
তফসীরুল কোরআন ২৫৭
বংশ পরিচয় ২৬০
আদ জাতির ঘটনা ২৬০
তফসীরুল কোরআন ২৬৪
তফসীরুল কোরআন ২৬৮
সামুদ জাতির পরিচয় ২৬৯
তফসীরুল কোরআন ২৭১
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ২৭২
তফসীরুল কোরআন ২৭৫
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ২৭৬
সামুদ জাতির ইতিকথা ২৭৬
তফসীরুল কোরআন ২৮৩
লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কথা ২৮৫
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ২৮৫
বংশ পরিচয় ২৮৬
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা ২৮৭
তফসীরুল কোরআন ২৮৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم.

তফসীরে নূরুল কোরআন

অষ্টম খন্ড অষ্টম পারা

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ
حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ
اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ
عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ
وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

তরজমা

(১১১) যদি আমি তাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল করি এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলে আর সব কিছুকে তাদের সম্মুখে একত্রিত করে দেই তবুও তারা ঈমান আনবেনা। অবশ্য যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয় তবে ঈমান আনতেও পারে। তাদের অধিকাংশ লোকই যে মূর্খ।

(১১২) আর এভাবেই আমি দুষ্ট প্রকৃতির মানব দানবকে প্রত্যেক নবীর দুশমন করে দিয়েছি। তারা একে অন্যকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে সাজানো কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা তা করতে পারত না। অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করুন।

(১১৩) আর তারা এ উদ্দেশ্যে প্রতারণা করে যে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের মন যেন এসব সাজানো কথার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা যেন তা পছন্দ করে নেয়। আর তারা যে অপকর্ম করে তাই যেন করতে থাকে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ইসলামের দুশমনদের দুশমনীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের দুশমনীর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র কোরআনকে যারা বিদ্রুপ করত তাদের মধ্যে এই পাঁচজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

১. ওলীদ এবনুল মুগীরা আল মাখজুমী,
২. আস এবনে ওয়ায়েলুছ সাহমী,
৩. আসওয়াদ এবনে আবদ ইয়াগুছ জুহরী
৪. আসওয়াদ এবনুল মোত্তালিব
৫. আলহারম এবনে হানজালা।[১]

তারা একবার দলবল নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলল, যদি ফেরেশতারা আমাদের সম্মুখে এসে সাক্ষ্য দেয় অথবা আমাদের মৃত ব্যক্তি এসে আপনার সত্যতার কথা বলে তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। কাফেরদের একথারই জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

তারা ঈমান আনবেনা

যদি আমি ফেরেশতাদেরকে আসমান থেকে নাযিল করি আর ফেরেশতাগণ আল্লাহর নবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে, এভাবে কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরা উঠে আসে এবং আল্লাহর নবীর সত্যতার কথা প্রকাশ করে এমনকি, যদি পূর্বকালের সমস্ত উম্মতকে পুনর্জীবন দান করা হয় এবং তারা এ দূরাত্মা কাফেরদের সম্মুখে হাযির হয় তবুও তারা ঈমান আনবেনা। কোন অবস্থাতেই তারা সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না। এর কারণ, তাদের হীন এবং নীচ প্রবৃত্তি, তাদের হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, তাদের জেদ-হঠকারিতা এবং অহমিকা। এসব চারিত্রিক দুর্বলতাই তাদের ঈমানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এসব বাধা তারা অতিক্রম করবেনা তাই ঈমানও আনবেনা।

إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

তবে হ্যাঁ স্বয়ং আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে সকল পৌত্তলিককেই তিনি বলপূর্বক মোমেন বানাতে পারেন। এমন অবস্থায় তাদের একজনও মুশরেক থাকতে পারবেনা। কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক জবরদস্তি করা বা বলপ্রয়োগের নীতি পছন্দ করেন না। ঈমান আনতে হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৪৯

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা। কেননা, তারা মূর্খ। আর মূর্খতার কারণেই তারা এমন মোজেযা দেখতে চায় যা তাদের জন্যে মহাবিপদের কারণ হতে পারে। কেননা, যদি এমন মোজেযা দেখাবার পরও তারা ঈমান না আনে তবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ এবং তাদের শাস্তি হবে অনিবার্য। মূর্খতাবশতঃ তারা এ সত্য উপলব্ধি করেনা বলেই এমন মোজেযা দাবী করে।[১]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) তাদের মূর্খতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তাদের জাহালত বা মূর্খতা এই যে, তারা ঈমান আনয়নের ইচ্ছাই করে না। তাদের মধ্যে ঈমান লাভের অন্বেষণ নেই। অথচ তারা বিস্ময়কর, অলৌকিক বস্তু তথা মোজেযা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আল্লাহর নবীর আসল শিক্ষা এবং ঈমানের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে তারা চিন্তাই করেনা। আর আল্লাহর নবীকে তারা যাদুকর মনে করে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা এ সত্যই উপলব্ধি করেনা যে, মোজেযা প্রদর্শনের ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে, বন্দার হাতে নয়।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) একথাও লিখেছেন যে, কোন নবীর জন্যে একটি মোজেযা জরুরী যেন মানুষ সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু যখন কোন সম্প্রদায় একাধিক মোজেযা দাবী করে এবং একটি মোজেযা দেখার পর আরেকটির দাবী উত্থাপিত হয় তখন বুঝতে হবে যে, এ সম্প্রদায় সত্য গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, বরং একাধিক মোজেযা প্রদর্শনের দাবীর মধ্যেই রয়েছে তাদের হঠকারিতা এবং জেদ। আর যারা ঈমানের ব্যাপারে হঠকারিতা করে, জেদ ধরে তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না।[৩]

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ.

(আর এভাবেই আমি দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ও জ্বীনকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করে দিয়েছি।)

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর প্রতি সান্ত্বনা

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা শওকানী (রঃ) লিখেছেন যে, এতে সান্ত্বনা রয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে। কেননা, কাফেরদের আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান না আনার কারণে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হতেন। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ যেভাবে এ কাফেররা ঈমান আনে না এবং পবিত্র কোরআনের তথা ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ করে ঠিক তেমনি পূর্ববর্তী নবীগণের সঙ্গেও

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃঃ ১৪৯-৫০
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃঃ ১৮৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃঃ ৩০৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃঃ ৫১৮
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃঃ ১৫০

মানবতার দুশমনরা অনুরূপ ব্যবহার করেছে। অতএব, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা বা আপনার সাথে শত্রুতা করা, মোমেনদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা নতুন কিছু নয়।[১]

হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে

বস্তুতঃ সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীতে ভাল-মন্দ এবং পাপ-পূণ্যের, সত্য-অসত্যের সংঘর্ষ বিদ্যমান রয়েছে। একদিকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আগমন করেছেন নবী রসূলগণ, অন্যদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট করার জন্যে সচেষ্ট রয়েছে শয়তানী শক্তি। তাই আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে শয়তানী শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে যুগে যুগে। আলোচ্য আয়াতে এ সত্যেরই ঘোষণা রয়েছে যে, (হে রসূল!) এ যুগের দূরাত্মা কাফেররা যেমন আপনার সাথে শত্রুতা করছে, আপনার বিরোধিতা করছে প্রতি পদক্ষেপে, ঠিক এভাবেই মানুষ ও জ্বীনের মধ্যে যারা শয়তান তারা প্রত্যেক নবীকে কষ্ট দিয়েছে। অতএব, এদের আচরণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা, এই শয়তানদের আচরণ যেমন চির পরিচিত তেমনি চির নিন্দিতও।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি চিন্তিত হবেন না, যেভাবে আপনার যুগের কাফেররা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করছে এবং আপনার বিরোধিতা করছে ঠিক তেমনি প্রত্যেক নবীর সাথে তার যুগের কাফেররা এমন ব্যবহারই করেছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ.

(হে রসূল!) আপনার পূর্বে আগমনকারী রসূলগণকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। তাদেরকেও কষ্ট দেয়া হয়েছে যার উপর তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হয় তখন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ওয়ারাকা এবনে নওফেলের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, আপনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন, এ বাণী যিনিই ইতিপূর্বে এনেছেন তাঁর সাথে শত্রুতা করা হয়েছে।

শয়তান হলো মানুষের শত্রু

নবীগণের শত্রু দুষ্ট মানুষও হয় এবং দুষ্ট জ্বীনও হয়, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে

شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ এরশাদ হয়েছে।

অর্থাৎ- মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে এবং জ্বীনের মধ্যেও। বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত আবুজর (রাঃ) নামায আদায় করছিলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি কি জ্বীন ও মানুষ শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করেছ? হযরত আবুজর (রাঃ) আরজ করেন, মানুষের

১। তফসীর ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৩

মধ্যেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি এরশাদ করেনঃ হ্যাঁ রয়েছে। আর মানুষ শয়তান জ্বীন শয়তান থেকেও মারাত্মক।

يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا.

অর্থাৎ- এই শয়তানদের কাজ হল মানুষকে তারা প্রতারণা করে, একে অন্যের কাছে তারা মানুষকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কথা সাজিয়ে বলে। এভাবে যেন মানুষ সহজে তাদের প্রতি আকৃষ্ট এবং প্রতারিত হয়। যেহেতু আখেরাতে তাদের বিশ্বাস নেই, তাই তারা এমন অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে।[১]

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ.

অর্থাৎ- যদি আপনার পরওয়ারদেগার ইচ্ছা করতেন তবে এ দূরাত্মারা এমন কাজ করতে পারত না। কিন্তু যেহেতু কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা আল্লাহ পাকের নীতি বিরুদ্ধ কাজ, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব, (হে রসূল!) আপনিও তাদেরকে ছেড়ে দিন, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ কোন মোমেনকে প্রতারণা করা যখন ইবলিস শয়তানের পক্ষে সম্ভব না হয় তখন সে দুষ্ট লোকের নিকট যায় এবং মোমেন বন্দাকে প্রতারিত করার জন্যেই দুষ্ট লোকটিকে প্ররোচনা দেয়। হযরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসেও একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উক্ত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে, মানুষ শয়তান জ্বীন শয়তান থেকেও মারাত্মক হয়। মালেক এবনে দীনারের কথা হল জ্বীন শয়তানের চেয়ে মানুষ শয়তান অধিকতর কঠোর হয় তার প্রমাণ এই, আমি যখন জ্বীন শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি তখন সে আমার নিকট থেকে চলে যায় কিন্তু মানুষ শয়তান আমাকে গুনাহর দিকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে।

তফসীরকার একরামা, যাহ্যাক, সুদ্দী এবং কালবীর মতে, মানুষ শয়তান বলতে বোঝানো হয়েছে সেই শয়তানগুলোকে যারা মানুষকে প্রতারণা করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। কেননা, মানুষ শয়তান হয় না। আর জ্বীন শয়তান হল সেগুলো যারা জ্বীনদেরকে প্রতারণা করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। ইবলিস তার সৈন্যদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। একভাগ জ্বীনদেরকে প্রতারণা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আর একভাগ মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। উভয় দলই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের দুশমন। প্রত্যেক দল সর্বদা অন্য দলের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং বলে যে, আমি এভাবে অমুককে প্রতারিত করেছি তুমিও এভাবেই মানুষকে প্রতারিত কর। জ্বীন শয়তান মানুষ শয়তানকে এভাবেই বলে। আর এ অর্থেই এরশাদ হয়েছেঃ

يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ.

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫

অর্থাৎ তারা একে অন্যকে এভাবেই নিজেদের প্রতারণার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করত।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) আরেকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ জ্বীন জ্বীনই, তারা শয়তান নয়। আর শয়তান হল ইবলিসের বংশধর। তাদের মৃত্যু হবে ইবলিসের মৃত্যুর সময়। আর জ্বীনের মৃত্যু হয়ে থাকে সর্বদা। জ্বীন মোমেনও হয় এবং কাফেরও হয়।[২]

ইমাম রাজী (রাঃ) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে, "শায়াতীন" যাদেরকে বলা হয়েছে তারা হল দুষ্ট জ্বীন বা মানুষ। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, শয়তান যে সর্বদা জ্বীনই হবে তা নয়; বরং কোন কোন সময় মানুষও শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ এই মত হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ পোষণ করতেন।[৩] হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ যারা গণক তারা হলো মানুষ শয়তান।

وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ-যাতে করে শয়তানদের বানানো এবং সাজানো কথার দিকে সে সব লোকের মন আকৃষ্ট হয় যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা।

এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শয়তান ওয়াস ওয়াসা কেন দেয় তার কারণ কি একথা প্রকাশ করা যে, মন্দ এবং সাজানো কথার প্রতি মানব মনকে আকৃষ্ট করাই হল শয়তানের প্ররোচনার উদ্দেশ্য।

আখেরাতের প্রতি ঈমান হল রক্ষাকবচ

এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করার মৌলিক পন্থা হল আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। আখেরাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসই হল এ পর্যায়ে মানুষের জন্যে রক্ষাকবচ। যে আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, যে একথা মনে করে যে, অবশেষে আমার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব পেশ করতে হবে। ভাল কাজের জন্যে রয়েছে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে রয়েছে শাস্তি সে শয়তানের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হবে না। এজন্যে পবিত্র কোরআনে আখেরাতের কথা বহুবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আরো কয়েকটি কথা প্রমাণিত হয়। শয়তানের প্ররোচনার কারণে সর্বপ্রথম মানব মন মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ

আর দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যায় কাজকে মানুষ পছন্দ করে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৭, পৃঃ ৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃঃ ২০২
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃঃ ১৫৪
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃঃ ৩০৭

وَلِيَرْضَوْهُ

এবং তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ মন্দ এবং নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِيَقْتَرِفُوْا

কিন্তু এ অবস্থা তাদের হয় যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা। পক্ষান্তরে, যারা আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস রাখে তারা শয়তানের প্রতারণার প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট শয়তানের ধোকাবাজি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।[১]

أَفَغَيْرَ

اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ
وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾
فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

তরজমা

(১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যকে শালিস মানব? অথচ তিনিই নাযিল করেছেন তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব। আর আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা বিলক্ষণ জানে যে, তা আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্যসহ নাযিল হয়েছে। অতএব, আপনি সন্দিহান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৭

(১১৫) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ সত্য এবং ন্যায্য, তাঁর কথা কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(১১৬) (হে রসূল!) যদি আপনি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা যে শুধু নিজেদের অনুমানেরই অনুসরণ করে আর শুধু অনুমান-ভিত্তিক কথাবার্তা বলে।

(১১৭) আপনার প্রতিপালক উত্তম রূপেই জানেন যে কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত, আর কে সৎ পথ প্রাপ্ত।

(১১৮) অতএব, যদি তোমরা তাঁর নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে থাক তবে সে সব জন্তুদের খাও যাদের উপর আল্লাহ পাকের নাম লওয়া হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

মক্কার পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই দাবি করেছিল যে, আমাদের এবং আপনার মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে একজন শালিস মনোনীত করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেররা যে সব মোজেযার দাবি করে সে সব মোজেযা প্রকাশ করা হলেও তারা ঈমান আনবেনা। যদি তাদের মধ্যে ঈমান আনয়নের সামান্যতম যোগ্যতাও থাকত তবে তারা এ পর্যন্ত যে সব মোজেযা দেখেছে তার উপর ঈমান আনত। বিশেষতঃ কোরআনে করীম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা এবং তাঁর নবুওয়্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এ মোজেযা দেখার পর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি।

দ্বিতীয়তঃ আহলে কিতাবদের ধর্মযাজকরা খুব ভাল ভাবেই জানত যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী। তাই নতুন করে মোজেযার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিলনা। ঈমান আনয়নের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ জ্ঞান সমৃদ্ধ, অতুলনীয়, মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনই যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের শালিস নিযুক্তির যে দাবী করেছে তা অহেতুক এবং অযৌক্তিক।[২] তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا.

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৮
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহ.) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২২

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে রেসালত এবং নবুওয়্যতের ব্যাপারে যে মোকদ্দমা রয়েছে তার বিবরণ হল এই যে, আমি নবুওয়্যতের দাবীদার এবং তোমরা তার অস্বীকারকারী। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের এজলাস থেকে আমার পক্ষে রায় হয়ে গেছে যে, আমি আল্লাহর সত্য রসূল, এর দলিল হিসেবে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন দান করেছেন যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী হওয়ার ব্যাপারে কারো যদি কোন প্রকার সন্দেহ থাকে তবে এই পবিত্র কালামের ক্ষুদ্র একখানি সূরা বা আয়াতের মোকাবেলা করে দেখাও। কিন্তু আরববাসী পবিত্র কোরআনের ক্ষুদ্র সূরার ন্যায় কোন সূরা বা আয়াত রচনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শুধু আরববাসী কেন বলবো, সমগ্র বিশ্ববাসী পবিত্র কোরআনের ন্যায় কোন কালাম পেশ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছে। সকলেই অবশেষে এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এটি মানুষের কথা নয়; বরং আল্লাহ পাকের বাণী।

অতএব, আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের সত্য রসূল এবং কোরআনে করীম আল্লাহ পাকের মহান বাণী। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি চাও যে আমি এই ফয়সালার পর অন্য কোন শালিসের অনুসন্ধান করবো? তথা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন শালিসের অন্বেষণ করবো? তা কোন অবস্থাতেই হতে পারে না।[১]

বস্তুতঃ যিনি আল্লাহর নবী এবং যাঁরা আল্লাহর নবীর অনুসারী, তাঁরা আল্লাহ পাকের পূর্ণ অনুগত। তাঁরা এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ পাককেই সব বিষয়ে একমাত্র বিচারক মানে। তাঁরা কোন অবস্থাতেই শয়তানদের মন্দ কথায় কর্ণপাত করে না। আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো নিকট মাথা নত করে না; করতে পারে না। বিশেষতঃ যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পবিত্র কোরআনের ন্যায় মহান গ্রন্থ নাযিল হয়েছে, যে গ্রন্থে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান রয়েছে, বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের পথ ও পন্থা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যারা আহলে কিতাব, তারা সুস্পষ্ট ভাবেই জানত যে, এই কিতাব সত্য সত্যই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ, যার প্রতিটি বিষয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যে মহান গ্রন্থ চির অপরিবর্তনীয়, কোন দিন এতে রদবদলের কোন সম্ভাবনা নেই। এমনি অবস্থায় যারা এ মহান গ্রন্থকে অস্বীকার করে তারা নিজেদেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে। এর পরবর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, এরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا.

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য

তিনিই তোমাদের নিকট নাযিল করেছেন বিস্তারিত গ্রন্থ। এতে পবিত্র কোরআনের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা হলঃ

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৮২-৮৩

১. এ মহান গ্রন্থ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ।

২. এ মহান গ্রন্থ পরিপূর্ণ, চিরন্তন, সারা বিশ্ব তার মোকাবেলায় অপারগ।

৩. এ মহান গ্রন্থে মানব জীবনের যাবতীয় জরুরী কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আরও এরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

অর্থাৎ যারা আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারা, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সত্য বাণী। যাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও গুণ ছিল তারা তা প্রকাশ করে, পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে ইসলামের দুশমনী ছিল, যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি হিংসা করত, তাদের পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা একথা প্রকাশ করত না। পবিত্র কোরআনের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ.

অর্থাৎ এই সমস্ত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দেখার পর (হে রসূল!) আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তো কখনো সন্দেহ পোষণকারী ছিলেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁকে সম্বোধন করে একথা বলার তাৎপর্য কি?

তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশে যদিও সম্বোধন করা হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যদেরকে শ্রবণ করানোই হলো এর উদ্দেশ্য। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হল একথাটিতে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা যে, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমন কথা বলা হয়েছে তখন অন্যদের কি অধিকার আছে সন্দেহ করার!

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন। তিনি ইহুদীদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করেননি। এতদসত্ত্বেও তিনি এমন কিতাব পেশ করেছেন যাতে এমন বহু কথা ছিল যা ঐসব কিতাবের বিবরণের অনুরূপ। এছাড়া আহলে কেতাবরা যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করত তখন এ সত্য উপলব্ধি করত যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ গ্রন্থ।

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ.

আর এ বাক্যের অর্থ হলো, আর হে (শ্রোতা) তুমি এ সম্পর্কে আদৌ কোন প্রকার সন্দেহ করোনা কেননা, পবিত্র কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কিতাব।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৪

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ)-এর মতে, আয়াতাংশের খেতাব পবিত্র কোরআনের পাঠক মাত্রকে করা হয়েছে, তাই তিনি উপরোক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

আল্লামা শওকানী (রঃ) লিখেছেন ঃ এ আয়াতাংশের খেতাব হল সমগ্র উম্মতের জন্যে, তাঁর ভাষায়ঃ

اى فلا يكونن احد من الناس من الممترين.

অর্থাৎ কোন মানুষই যেন পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে সন্দিহান না হয়। আর এ পর্যায়ে একথাও সত্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে উম্মতকেই সম্বোধন করা হয়।[১]

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا.

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার পরওয়ারদেগারের বাণী সত্যতায় এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত সংবাদ সমূহ সম্পূর্ণ সত্য এবং সন্দেহাতীত।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনে যত অঙ্গীকার করা হয়েছে অথবা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে সবই সত্য এবং চিরন্তন সত্য।

মূলতঃ পবিত্র কোরআনের বাণীকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

(এক) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খবর এবং অতীত জাতি সমূহের ঘটনাবলী।

(দুই) আহকাম বা বিধি-নিষেধ।

আলোচ্য আয়াতের صدق শব্দটি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত খবর এবং যাবতীয় ঘটনাবলী যে ধ্রুব সত্য এ সম্পর্কে আর عدل শব্দটি কোরআনে করীমের আহকাম বা বিধি-নিষেধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ইনসাফ-ভিত্তিক তথা ইনসাফ বিরোধী কোন বিধি-নিষেধ এতে নেই।

অতএব, পবিত্র কোরআনের প্রতিটি কথা সত্যতা এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, যুক্তিসংগত এবং সুবিচার সম্মত।[২]

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

অর্থাৎ-পবিত্র কোরআনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল এই, তাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়না। পবিত্র কোরআন চির অপরিবর্তনীয়। কেউ তাতে কোন কথা পরিবর্তন করতে পারেনা। এ বাক্যের ব্যাখ্যায় হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল পবিত্র কোরআনের কোন আদেশ নিষেধ কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা, এর যাবতীয় সিদ্ধান্ত চিরন্তন।

অথবা এর অর্থ হল পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর আর কোন আসমানী কিতাব নাযিল হবেনা যা পবিত্র কোরআনের বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে আর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আর কোন নবীর আগমনও হবেনা। কেননা, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর মাধ্যমেই নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।[৩]

১। তফসীরে ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৫

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৩

৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৪

আর কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যটির এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, যুগের আবর্তন-বিবর্তন বা পরিবর্তনের কারণে পবিত্র কোরআনের ভাষায় বা মর্মে অথবা বিধানে কোন পরিবর্তন হবেনা। কেননা, পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সার্বজনীন, যুগোপযুগী এবং সকল দেশ ও পরিবেশের মানুষের জন্যে তথা কেয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে– সবার জন্যে কল্যাণকর।[১]

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

অর্থাৎ ইসলামের দুশমনরা যেসব সাজানো এবং বানোয়াট কথা বলে তার সবই তিনি শ্রবণ করেন। আর তারা যেসব কথা তাদের অন্তরে গোপন রাখে সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত। তারা যা কিছু প্রকাশ করে সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল। অতএব, তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের পরিণাম ভয়াবহ।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ.

(হে রসূল!) যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। তারা যে শুধু নিজেদের খেয়াল খুশীতেই চলে এবং অনুমানের পেছনে ছুটে বেড়ায়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই পথভ্রষ্ট যেমন সূরা ইয়াসীনের একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

"অধিকাংশ লোক সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত যে তারা ঈমান আনবেনা"। আর অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ.

(হে রসূল!) যদিও আপনি আকাঙ্ক্ষা করেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবেনা।

সাধারণতঃ সংখ্যাধিক্যের একটা প্রভাব মানুষের মনে বিস্তার হয়ে থাকে। মানুষ এভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত যে, যখন সব লোকই এ পথের যাত্রী তখন আমি কেন একলা চলো নীতি অবলম্বন করব! কিন্তু এমন ভাবনা মানব মনের দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই পথভ্রষ্ট, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এমনি অবস্থায় আপনি যদি অধিকাংশ লোকের মতে চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহ পাকের সত্য, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যদিও আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু এর দ্বারা তাঁর মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাঁর উম্মত তথা সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের উদ্দেশ্যে।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ আয়াত মক্কাবাসীর ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে কেননা, মক্কাবাসীই ছিল কাফের। এর অর্থ হল (হে রসূল!) যদি আপনি এই কাফেরদের কোন কথা মেনে চলেন তবে আপনাকে তারা সরল-সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। কেননা, তারাতো নিতান্ত আন্দাজ বা অনুমানের ভিত্তিতেই চলে। যেমন, তাদের দাবী ছিল যে, আপনার এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে একজন সালিশ মনোনীত করা। যদি আপনি তাদের এ দাবী মেনে নেন তবে তারা আপনাকে সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হল দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। আর দুনিয়ার মানুষের জ্ঞান সে যতবড় জ্ঞানীই হোক না কেন তা অনুমান ভিত্তিক। সঠিক এলম শুধু আল্লাহ পাকের, যা তিনি ওহীর মাধ্যমে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের কাছে এসেছে।[২]

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ج وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক নিশ্চিতভাবে জানেন যে, কে পথভ্রষ্ট আর কে হেদায়েত প্রাপ্ত। আর তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দান করবেন। যে সামান্য নেক আমলও করবে সে তার শুভ পরিণতি লাভ করবে, পক্ষান্তরে যে সামান্য মন্দ কাজও করবে তার শাস্তিও সে ভোগ করবে।

কাফেরদের সাজানো কথার নমুনা

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেররা সাজানো ও মনগড়া বানানো কথা বলে। তাদের এহেন মনগড়া কথার মধ্যে একটি উদ্ভট কথা হল স্বাভাবিক ভাবে যে সব জন্তুর মৃত্যু হয় সেগুলো খাওয়া মুসলমানগণ নিজেদের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করে। অথচ নিজেরা যে সব জন্তুকে মারে তথা জবাই করে সেগুলো খাওয়া নিজেদের জন্যে হালাল মনে করে। কি বিস্ময়কর বিষয়! আল্লাহর হুকুমে যে জন্তু মারা গেল সেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গেল আর যেগুলোকে নিজেরা জবাই করে মারল সেগুলো হালাল হয়ে গেল! এতে কি মুসলমানগণ আল্লাহ পাক অপেক্ষা নিজেদের প্রাধান্য পেশ করছে না? এর জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছেঃ

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

অতএব, তোমরা সে সব জন্তু আহার কর যাদের উপর আল্লাহ পাকের নাম লওয়া হয়েছে যদি তোমরা তাঁর বিধান সমূহের উপর ঈমান এনে থাক। কেননা, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের শুভ পরিণতি হল এই, আল্লাহ পাক যে বস্তুকে হালাল ঘোষণা

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৮
তফসীরে ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৫

করেন তাকে বৈধ মনে করা আর আল্লাহ পাক যাকে হারাম ঘোষণা করেন তাকে হারাম বা অবৈধ মনে করা।

তফসীরকারগণ বলেছেন কোন জন্তু স্বাভাবিকভাবে মারা গেল অথবা কেউ তাকে জবেহ করল– এ বিষয়টি তার হালাল বা হারাম হওয়ার মানদন্ড নয়। আর কোন্‌টি আমাদের দৃষ্টিতে রুচি বিরুদ্ধ অথবা রুচিমাফিক এসব বিষয় কোন বস্তুর হালাল হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিচার্য নয়, বরং এখানে বিচার্য বিষয় হল আল্লাহ পাক কোন্ বস্তু খেতে অনুমতি দিয়েছেন আর কোন্ বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন।

অতএব, আল্লাহ পাকের নির্দেশ মেনে নেয়াই আমাদের কর্তব্য। আর আল্লাহ পাকের নির্দেশই আমাদের কর্তব্য নির্ধারণের মানদন্ড। আর এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় কে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে আর কে আল্লাহর নাফরমান হয়েছে।

পৌত্তলিকদের অসৎ উদ্দেশ্য

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, পৌত্তলিকরা যে এ সত্য উপলব্ধি করত না তা নয়; তবে তাদের এসব বানানো কথার পেছনে যে অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকত তা হল সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে প্রতারিত করা। তাদের উদ্ভট কথাবার্তা শুনে নও মুসলিমগণ যেন ইসলামের কোন বিধান সম্পর্কে সন্দিহান হয়- এ অসৎ উদ্দেশ্যেই তারা এমন মনগড়া কথা প্রচার করত।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ পাকেরই হাতে। জবেহ করার সময় ছুরি ব্যবহার করা বন্দার কাজ, কিন্তু প্রাণ বের করা আল্লাহ পাকের কাজ, যে জন্তুর জবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম উচ্চারিত হয় তা হালাল। আর যার উপর আল্লাহ পাকের নাম পাঠ করা হয়না তা হারাম।[১]

শানে নুযুল সম্পর্কে আরও কথা

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিছু লোক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এর কি কারণ যে, আমরা যখন নিজেরা কোন জানোয়ারকে হত্যা করি তা আমরা খেতে পারি আর যাকে আল্লাহ পাক মেরে ফেলেন তাকে আমরা খেতে পারিনা। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ মুশরেকদের একটি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললঃ যদি কোন বকরীর মৃত্যু হয় তার সম্পর্কে ইসলামের কি নির্দেশ? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তাকে আল্লাহ পাকই মেরে ফেলেছেন। (মুশরেকরা বললো) তাহলে যা আপনি বা আপনার সাহাবীগণ হত্যা করেন তা হালাল। আর যাকে কোন পাখী বা কুকুরও হত্যা করে তা-ও হালাল, কিন্তু যাকে আল্লাহ পাক হত্যা করেন তা হারাম হবে? তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৪
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮৪

২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৫

আর একরামা বলেছেনঃ মৃত জন্তু যখন হারাম ঘোষণা করা হল তখন পারস্যের অগ্নি পূজকরা মক্কার কাফেরদেরকে চিঠি লিখল। বর্বরতার যুগে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল এবং চিঠি-পত্রের আদান প্রদানও হত। তারা লিখল যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মনে করেন যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করে চলেন, আর তাঁরা একথাও মনে করেন যে, তাঁরা যা জবেহ করেন তা হালাল অথচ আল্লাহ পাক যা জবেহ করেন তা হারাম। এ কারণে কিছু মুসলমানের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হল, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন।[১]

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ
لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

তরজমা

(১১৯) যে জীব-জন্তুর উপর (জবাই করার সময়) আল্লাহ পাকের নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা কেন খাবেনা? অথচ তোমাদের জন্যে যা হারাম তা তিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা খেতে পার। অনেকেই অজ্ঞানতার কারণে নিজেদের খেয়াল-খুশী মোতাবেক অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সীমা লঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(১২০) আর তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন পাপ বর্জন কর। যারা পাপ কার্যে লিপ্ত হয় তারা অচিরেই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩

(১২১) যে সব জীব-জন্তুর ওপর আল্লাহ পাকের নাম নেয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করোনা। তা আহার করা অবশ্যই পাপ। শয়তান তার বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয় যেন তারা তোমাদের সাথে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। যদি তোমরা তাদের কথা মত চল তবে তোমরাও নিশ্চয় মুশরেক হবে।

তফসীরুল কোরআন

মানুষের জন্য কি হালাল এবং কি হারাম তা আল্লাহ পাক বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব, যে জীব-জন্তুকে জবেহ করানোর সময় আল্লাহ পাকের নাম নেয়া হয় তা তোমরা কেন খাবে না? কেননা, যা আল্লাহ পাক হালাল করেছেন তা আহার করতে কোন বাধা থাকতে পারে না। যে জীব জন্তুকে আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয় তা হালাল। কিন্তু যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয় অথবা অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করা হয় অথবা যদি জন্তুর মালিকের অনুমতি ব্যতীত জবেহ করা হয় অথবা যদি অমুসলিম জবেহকারী হয় বা যদি মুসলিম এহরাম অবস্থায় জবেহ করে তবে এসব হালাল নয়।[১]

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.

তবে তোমরা যদি অনন্যোপায় অবস্থায় থাক যেমন প্রাণ রক্ষার জন্যে হারাম গোশ্ত ব্যতীত আর কিছুই না থাকে, এমন অবস্থায় তা গ্রহণের অনুমতি রয়েছে।

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

আর অনেকেই অজ্ঞানতাবশতঃ নিজের মতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াসী হয়। কাফেররা মুসলমানদেরকে বলেছিল, আল্লাহ পাক যে জীব-জন্তুকে মারেন তাকে তোমরা হারাম মনে কর অথচ নিজেরা যা জবেহ কর তা হালাল মনে কর। কেমন বিস্ময়কর কথা! আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এ অন্যায় উক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাফেররা যা জানেনা তা সম্পর্কে তাদের মন্তব্য নিতান্ত মূর্খতা প্রসূত।

এখানে একথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জীব-জন্তু যা মারা যায় তা আল্লাহর হুকুমেই মারা যায়, আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কোন প্রাণীর প্রাণ বায়ু বের হয় না। তবে এ বিষয়টিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়।

যে জন্তুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় আর যে জন্তুকে ছুরি দিয়ে মারা হয় উভয় প্রকার মৃত্যুই আল্লাহর হুকুমে হয়। মৃত জন্তুকে পুনরায় দু'ভাবে বিভক্ত করা যায়।

যে সব জন্তুকে মানুষের সুস্থ বিবেক স্বভাবগত কারণে ঘৃণা করে বা যেগুলোকে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য বা আত্মার জন্যে আল্লাহ পাক ক্ষতিকর বলেছেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় কোন রক্ত সম্পন্ন জন্তুর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে রক্ত তার গোশ্তে মিশে যায় এবং মানুষের জন্যে তা ক্ষতিকর হয়, তাই তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, যে সব

১। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬

হালাল পবিত্র জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয় তা আল্লাহ পাকের নামের গুণে তাঁর আদেশ মোতাবেক জবেহ করার ফলে তা হালাল এবং পবিত্র।

উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা উপলব্ধি করার জ্ঞান এ মূর্খ লোকদের নেই। কথাটি অত্যন্ত সহজ। উভয় প্রকার জন্তুর মৃত্যুই আল্লাহর হুকুমে হয়েছে, একটির সঙ্গে আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের মহিমা জড়িয়ে আছে তাই তা হালাল পবিত্র, পরিচ্ছন্ন।

পক্ষান্তরে, যে জন্তুকে তিনি মৃত্যু দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পবিত্র নাম তার সাথে জড়ানো হয়নি তাই তা হালাল নয়।[১]

যারা এ পার্থক্য বোঝেনা তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ.

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার পরওয়ারদেগার খুব ভাল ভাবেই জানেন সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে, আর তাই তিনি তাদের শাস্তি বিধান করবেন। তারা তাঁর শাস্তি থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই পাবে না।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, সীমালঙ্ঘনকারী হল তারা, যারা কোন বস্তুর হালাল হারাম হওয়াকে নিজের এখতিয়ার ভুক্ত মনে করে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ হল যারা হালাল হারামের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করে তথা হালালকে হারাম বলে।[২]

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ.

"হে মুসলমানগণ! তোমরা সকল প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন কর"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, জাহের বা প্রকাশ্য গুনাহ হল যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয় আর গোপন গুনাহ হল যা অন্তর দ্বারা করা হয়। যেমন বাতিল আকীদা পোষণ করা বা হালাল বস্তুকে হারাম মনে করা।

ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যে সব কাজ নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যদি সম্পাদিত হয় তবে তা প্রকাশ্য গুনাহ। আর যদি আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের বরখেলাফ মানব অন্তরে কোন কিছু স্থান পায় তা হল গোপন গুনাহ।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে পাপকার্য করে তা প্রকাশ্য গুনাহ। আর যে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে তথা মনে মনে মন্দ কাজের কথা ভাবে তা গোপন গুনাহ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এ পর্যায়ে সর্বোত্তম কথা হল যে সব পাপ কার্য প্রকাশ্যে করা হয় তা হল প্রকাশ্য গুনাহ আর যে পাপ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে তথা গোপনে করা হয় তা হল গোপন গুনাহ।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮৪
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৯

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, প্রকাশ্যে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া হলো প্রকাশ্য গুনাহ। আর গোপনে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া হলো গোপন গুনাহ। কালবী বলেছেন, পুরুষ ঘরের মধ্যে যদি নগ্ন হয় তবে তা প্রকাশ্য গুনাহ আর মেয়েরা যদি রাত্রিকালে অনাবৃত হয় তবে তা গোপন গুনাহ।

আয়াতের মর্মকথা

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ তথা সর্বপ্রকার গুনাহ পরিত্যাগ কর। সগীরা বা কবীরা সকল প্রকার পাপ কার্য আল্লাহ পাকের হক্বের ব্যাপারে হোক অথবা বন্দার ব্যাপারে যাবতীয় পাপাচার পরিহার কর। অথবা জাহেরী পাপ অর্থ হলো কুফর আর গোপন পাপ হলো মুনাফেকী অথবা জাহের বা প্রকাশ্য গুনাহ হলো শরীয়তের বিধান প্রকাশ্যে অমান্য করা যেমন নামায-রোজা না করা। আর গোপন পাপ হলো যত্ন সহকারে নামায আদায় না করা বা রমজানে পানাহার পরিহার করেও পাপাচারে লিপ্ত থাকা বা হারাম রিয্ক গ্রহণ করা আর গোপন পাপ হলো যা অন্তরের সাথে সম্পর্কিত যেমন লোক দেখানোর জন্য সৎ কাজ করা। হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, ঔদ্ধ্যত্ব, লোভ-লালসা প্রভৃতি।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এর অর্থ হলো প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় পাপ কার্য পরিত্যাগ কর।

জাহের তথা প্রকাশ্য গুনাহ হলো যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। আর বাতেন তথা গোপন গুনাহ হলো যা অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ اثم শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন ব্যাভিচার তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে- এ ঘৃণ্য কাজ পরিত্যাগ কর।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ তাদের সাথে বিবাহ করা হলো প্রকাশ্য গুনাহ আর باطن বা গোপন গুনাহ হলো ব্যাভিচার।

এবনে যায়েদ বলেছেনঃ প্রকাশ্য গুনাহ হলো নগ্ন অবস্থায় তওয়াফ করা (যা বর্বরতার যুগে করা হতো) আর গোপন গুনাহ হলো ব্যাভিচার। কালবীর আরও একটি মত বর্ণিত আছে, দিনের বেলা পুরুষের নগ্ন অবস্থায় তওয়াফ করা এবং রাতের বেলা মেয়েদের নগ্ন হয়ে তওয়াফ করা হলো গোপন গুনাহ (যা প্রাক-ইসলামী যুগে করা হতো)।[২]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ.

নিশ্চয় যারা দুনিয়ার এ জীবনে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আখেরাতে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করা হবে।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

আর যে সব জীব-জন্তুর উপর আল্লাহ পাকের নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা আহার করোনা। যে জন্তুকে জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া না হয় তা আহার করা

১। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০০৬

হারাম। এ পর্যায়ে এবনে ওমর (রাঃ), ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রঃ) এবং দাউদ, জাহেরী (রঃ) এ মত পোষণ করেছেন যে, যে জন্তুর জবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করা হয়নি আর এ নাম না নেয়া তা ইচ্ছা করে হোক বা ভুলক্রমে– কোন অবস্থাতেই এমন জন্তুর গোশ্ত খাওয়া বৈধ নয়। তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে এ আয়াত পেশ করেন। কেননা, এর পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ[১]

وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.

আর নিশ্চয় তা অত্যন্ত পাপ কার্য। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ ও এছহাক এবনে রাহবিয়াহ এ মত পোষণ করেছেন যে, যদি জবেহ করার সময় ভুল করে বিসমিল্লাহ পাঠ করা না হয় তবে তা হালাল হবে। আর যদি ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ পাঠ বর্জন করা হয় তবে তা হালাল হবে না। আর এ মত পোষণ করতেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), তাউছ (রহঃ), হাসান বসরী (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), আবদুর রহমান এবনে আবি লায়লা (রহঃ), জাফর এবনে মোহাম্মদ (রহঃ) এবং রবীয়া এবনে আবু আবদুর রহমান (রহঃ)। এবনুল মুনজের বলেছেন, এ মতের পক্ষে দলিল পেশ করা যায় কোরআনে করীমের এ আয়াত–

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যদি আমাদের ভুল-ত্রুটি হয় তবে ধর-পাকড় করোনা"।[২]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি জবেহকারী জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ভুলে যায় তবে তার অন্তরে এই পবিত্র নাম আছে একথা ধরে নেয়া যেতে পারে। কেননা, সে আল্লাহর অনুগত, সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি ভুল ক্রমে কিন্তু আল্লাহর নাম উচ্চারণকে বর্জন করেনি। তাই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য তার অন্তরের জিকরের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর মুসলমানের ভুল ক্ষমার যোগ্য। কেননা, সে ইচ্ছা করে আল্লাহর নাম উচ্চারণকে পরিত্যাগ করেনি। তাই আমাদের ইমাম সাহেব সুস্পষ্ট ভাষায় এ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কেউ জবেহ করার সময় ভুলে বিসমিল্লাহ পাঠ না করে তবে তা হালাল। কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ পাঠ করাকে পরিত্যাগ করে তবে তা হারাম।[৩]

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ.

আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদের অন্তরে প্ররোচনা দেয় যেন তারা তোমাদের সঙ্গে কলহ করে। যদি তোমরা তাদের কথা মান তবে নিশ্চয় তোমরাও মুশরেক। পারস্যের অগ্নিপূজকরা মক্কার পৌত্তলিকদের নিকট এ কর্মসূচী প্রেরণ করে যে, তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া কর যে, তোমাদের একথা খুবই বিস্ময়কর যে, যা তোমরা ছুরি দিয়ে জবেহ কর তা হালাল হয়ে যায়। আর

১। তফসীরে ফাতহুল কাদীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৭
২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৮
৩। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৭-৮

যা আল্লাহ পাক জবেহ করেন তথা মৃত্যুদান করেন তা হারাম হয়ে যায়। এ প্রশ্নের জবাব ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "শায়াতীন" বলতে পারস্যের অগ্নি পূজকদেরকে বোঝানো হয়েছে। আর আওলিয়া শব্দ দ্বারা তাদের মুশরেক বন্ধুদেরকে বোঝনো হয়েছে।[১]

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ

এ বাক্যাংশ দ্বারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, হে মোমেনগণ! যদি তোমরা মুশরেকদের অনুসরণ কর তবে তোমরাও এমন অবস্থায় মুশরেক বলে পরিগণিত হবে। এ আয়াত দ্বারা ফেকাহবিদগণ একথা প্রমাণ করেছেন, যদি কোন মানুষ আল্লাহর হারাম ঘোষিত বস্তুকে হালাল মনে করে তবে পরিণামে সে মুশরেক হয়। ইমাম কুরতবী এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তফসীরে মাজেদীতে এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে।[২]

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۚ وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ
آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

তরজমা

(১২২) যে ব্যক্তি মৃত ছিল, আমি তাকে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলাফেরার জন্যে আমি নূর দান করেছি, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে এবং সেখান থেকে কোন ভাবেই বের হতে পারেনা। এভাবেই কাফেরদের চোখে তাদের কৃতকর্ম সুন্দর করে দেখানো হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৯

(১২৩) আর এভাবেই প্রত্যেক জনপদে পাপিষ্ঠদের প্রধানকে দিয়ে রেখেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে অথচ তারা তা উপলব্ধি করেনা।

(১২৪) আর যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে আল্লাহর রসূলগণকে যা দেয়া হয়েছিল যতক্ষণ আমাদেরকেও তা না দেয়া হবে আমরা তা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ পাক রেসালতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন। অচিরেই পাপিষ্ঠরা তাদের চক্রান্তের পরিণামে আল্লাহ পাকের নিকট থেকে লাঞ্ছনা এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেকদের কলহ দ্বন্দ্বের উল্লেখ ছিল। এরপর মুসলমানগণকে তাদের অনুসরণ না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমান এবং কাফেরের সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যেন মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং একথা জানা যায় যে, কে নিন্দনীয় আর কে অনুসরণীয়।

শানে নুযুল

আবু শায়খ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত ওমর (রাঃ) এবং আবু জেহেল সম্পর্কে আর এবনে জরীর যাহ্যাকের এ বর্ণনারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত হযরত হামজা (রাঃ) এবং আবু জেহেলের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ঘটনা হয়েছিল এই যে, আবু জেহেল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠ মোবারকে উষ্ট্রের নাড়ি-ভূড়ি রেখে দিয়েছিল। হযরত হামজা (রাঃ) তখন শিকার থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তিনি এ সংবাদ পেয়ে সরাসরি আবু জেহেলের নিকট রাগান্বিত অবস্থায় পৌঁছলেন। তাঁর অবস্থা দেখে আবু জেহেল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললো, দেখুন মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের সম্মুখে কি পেশ করেছেন। আমাদের উপাস্যদেরকে গালি দিচ্ছেন, আমাদের পূর্ব পুরুষদের বিরোধিতা করছেন। তখন হযরত হামজা (রাঃ) বলেছিলেন, তোমার চেয়ে বড় আহম্মক আর কে হবে? তুমি আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে পাথরের পূজা কর। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্দা এবং রসূল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। একরামা (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আম্মার এবনে ইয়াসির এবং আবু জেহেল সম্পর্কে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৯-১০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৭

এ তিনটি বর্ণনা একত্র করলে দেখা যায় যে مثله فى الظلمت বাক্য দ্বারা আবু জেহেলকে বোঝানো হয়েছে– এ সম্পর্কে সকলেই একমত। তবে এর মোকাবেলায় মুসলমান কে? এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করা হয়েছে।

ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন যে এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম বর্ণনা হল হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ)। তিনি বলেছেন, এ দৃষ্টান্তটি হলো হযরত হামজা (রাঃ) এবং আবু জেহেল সম্পর্কে (এ ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)।

দ্বিতীয় বর্ণনা হলো মোকাতেল (রঃ)-এর। তিনি বলেছেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আবু জেহেল সম্পর্কে। আর এ সম্পর্কে তৃতীয় বর্ণনা হল একরামা এবং কালবীর (রহঃ)। তারা বলেছেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে আম্মার এবনে ইয়াসির এবং আবু জেহেল সম্পর্কে।

চতুর্থ বর্ণনা হল এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত ওমর (রাঃ) এবং আবু জেহেল সম্পর্কে।

এ পর্যায়ে আরও একটি অভিমত হল এ আয়াত সকল মোমেন এবং কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ইমাম রাজী (রহঃ) বলেন, একথাই অধিকতর সঠিক মনে হয়।[১]

আয়াতের মর্মকথা

যারা মোমেন কুফরের অন্ধকার থেকে বের হয়ে হেদায়েতের আলোর দিকে এসেছেন, আর যারা কাফের তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। তারা কি কোন সময় এক সমান হতে পারে? মূর্খতা, অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টতার নিষ্ঠর আক্রমণে যারা জর্জরিত, মৃত তারা কোন অবস্থাতেই সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা ঈমান এবং জ্ঞানের প্রাণ শক্তি লাভ করেছেন, যারা পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেকে আলোকিত করেছেন।

পক্ষান্তরে যে শয়তানী চক্রের শিকার হয়েছে, যে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে, যে গোমরাহীর আবর্তে নিপতিত এবং বন্দী অবস্থায় রয়েছে, এ বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের কোন পথ সে খুঁজে পায়না আর আরেকজন আলোর জগতে বাস করে। একজন মৃত আরেকজন জীবিত। এ দু'জন কোন অবস্থাতেই সমান হতে পারে না। যেমন আলো এবং আঁধার সমান হয় না।

মোমেন জীবিত, কাফের মৃত

বস্তুতঃ মোমেন হল জীবিত আর কাফের হল মৃত।

আমরা যদি বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখবো আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা-নক্ষত্রপুঞ্জ, বৃক্ষ-তরুলতা, নদ-নদী, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষি, মানব-দানব, আগুন-পানি সবই তার নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলছে। যদি এ সমস্ত সৃষ্টি তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় তবে সে আর জীবিত থাকে না। যদি পানি মানুষের পিপাসা নিবারণ করতে না পারে, ময়লা দূরীভূত করতে অক্ষম হয় তবে সে পানি নয়। এমনিভাবে অগ্নি যদি দহনের দায়িত্ব পালন করতে না পারে তবে তা আর অগ্নি নয়। ঠিক

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৭৩

তেমনি মানুষ যদি তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে না পারে তবে তাকে জীবিত মানুষ বলা যায় না।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য

এখন প্রশ্ন হল মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? এ জীবনে তার দায়িত্ব কি? যদি পানাহার আর বিশ্রাম ও আনন্দ উল্লাসই জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে চতুঃস্পদ জন্তুর মধ্যে আর মানুষের মধ্যে কি পার্থক্য থাকে? অথচ মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, সে সৃষ্টির সেরা। সমগ্র সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ পাক তার সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছেন। অবশ্যই তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। সে উদ্দেশ্য হল স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভ। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার সকল এবাদত এবং আমার জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড এমনকি, আমার মরণ পর্যন্ত এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য।

অতএব, প্রতিটি মানুষের সম্মুখে তার জীবনের এ উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং সে উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টাও করতে হবে।

উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা

মানব জীবনের এ উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা হল আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং পূর্ণ আত্মসর্মপণ করা এবং এর পন্থা হল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি স্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে। যে এ আনুগত্য প্রকাশ করে সে-ই প্রকৃত মোমেন। আর যে অবাধ্য নাফরমান হয় সে কাফের ও মৃত এবং তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

মওলানা রুমী (রঃ) তাই বলেছেনঃ

زندگی بہر طاعت وبندگی است = زندگی بے بندگی شرمندگی است

"জীবন হল আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য ও বন্দেগীর জন্যে। বন্দেগী ব্যতীত জিন্দেগী লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়"।

آدمیت لحم وشحم وپوست نیست = آدمیت جز رضائے دوست نیست

"গোশ্‌ত এবং চর্মের নাম মানবতা নয়। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ ব্যতীত মানবতার উৎকর্ষ সাধন অচিন্তনীয়"।

অতএব, সত্যিকার মানুষ হতে হলে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। আর এ বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে। এ সত্যটিকেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ.

অর্থাৎ যে মৃত ছিল তথা আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল ছিল, হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ছিল আমি তাকে জীবিত করলাম তথা হেদায়েত দান করলাম এবং তাকে প্রাণ শক্তি দান করলাম এবং সে হেদায়েত অনুযায়ী মানব সমাজে চলাফেরা করে। আর যে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পাপের সাগরে নিমজ্জিত, পথভ্রষ্টতার আঁধার গুহায় বন্দী অবস্থায় আছে, সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথই যে খুঁজে পায়না, কোন দিন পাবেনা, এ দু'জন কি এক সমান হতে পারে? আলো ও আঁধার যেমন এক হতে পারেনা, ঠিক তেমনি এ দু' ব্যক্তি বা জাতি তথা মোমেন ও কাফের কোন অবস্থাতেই এক হতে পারেনা, হযরত ওমর (রাঃ) ও আবু জেহেল কোন দিনও এক হতে পারেনা। একজনের জন্যে বেহেশত আর একজনের জন্যে দোযখ তৈরী হয়ে আছে।

كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

এভাবেই কাফেরদের কীর্তিকলাপ তাদের চোখে সুন্দর করে দেখানো হয়।

যেভাবে আবু জেহেল তার কুকীর্তিগুলোকে পছন্দনীয় মনে করতো এবং সে নিজেকে মুসলমানগণ থেকে উত্তম মনে করতো, ঠিক এমনিভাবে অন্য কাফেরদের কাছেও তাদের অন্যায় আচরণ সুন্দরই মনে হতো, ফলে তারা আর সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতে পারত না।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ.

এ আয়াতে একদিকে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে, অন্যদিকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে দূরাত্মা কাফেরদের জন্যে, এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) যেভাবে মক্কার দুবৃত্ত পৌত্তলিকরা আপনার বিরুদ্ধে, পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার চক্রান্ত করে চলেছে, ঠিক তেমনি অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও সে যুগের দুষ্ট লোকেরা তাই করেছে। অতএব, মক্কার দূরাত্মা কাফেরদের অন্যায় আচরণে মনক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই কেননা, যখনই এবং যেখানেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন নবী আগমন করেছেন, তখনই সেখানকার বড় বড় দুষ্ট লোকেরা তাদেরকে মন্দ বলেছে, তাঁদের প্রতিরোধ করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নমরুদ যা করেছে, মক্কার আবু জেহেল গংরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাই করেছে অতএব, এটি দুষ্ট লোকদের পুরনো নীতি।

তবে সব যুগেই পাপিষ্ঠ লোকদের সকল চক্রান্ত বিফল হয়েছে, তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তারা সত্যকে প্রতিরোধ করতে পারেনি, ফেরাউন লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, নমরুদের পরিণামও শোচনীয় হয়েছে, হযরত নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য সম্প্রদায় অবশেষে প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সামুদ ও আদ সম্প্রদায় চিরতরে ধ্বংস হয়েছে। আর সত্য সর্বকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে যুগে যুগে। অতএব, (হে রসূল!) বর্তমানেও তার

ব্যতিক্রম হবেনা। ইতিহাস সাক্ষী! অবশেষে তাই হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে নির্যাতীত অবস্থায় হিজরত করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মাত্র ৮ বছর পরই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরে এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে, দশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এবং আল্লাহর ঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলোকে ভেঙে দিয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠে এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য"।

وَمَا يَمْكُرُوْنَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

'আর তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে। অথচ তা তারা বোঝেনা'।

ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেররা যে ষড়যন্ত্র করে তার ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা তা বোঝেনা। মক্কায় পৌত্তলিকরা শহরের সকল প্রবেশ দ্বারে তাদের লোক নিয়োগ করেছিল, যারা শহরে আগমনকারীদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে সতর্ক করে দিত। তারা যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ না করে, তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়।

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ أُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ.

শানে নুযুল

আল্লামা বগবী ইমাম কাতাদার (রহঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবু জেহেল বলেছিল আবদে মোনাফের বংশধররা উচ্চ মর্যাদা অর্জনে আমাদের সঙ্গে লড়াই করছে। অবশেষে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একথা বলেছে যে, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন যাঁর নিকট ওহী আসে। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও তাঁকে মানব না। আর কখনও তাঁর অনুসারী হবনা। তবে যদি আমাদের নিকটও তেমনি ওহী আসে যেমন তার নিকট আসে তাহলে তাকে মানব।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ ওলীদ এবনে মগীরাহ বলেছে, যদি নবুওয়্যত সত্যিই কোন জরুরী বিষয় হয় তবে আমি তোমার চেয়েও নবুওয়্যতের অধিকতর হক্বদার কেননা, আমার বয়স বেশী এবং ধন-সম্পদও বেশী। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আয়াতের মর্মকথা

যারা সত্যের দুশমন, যারা মানুষকে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট করতে অভ্যস্ত, তাদের একটি কৌশল এই ছিল, যখনই পয়গম্বরগণ তাদের সম্মুখে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন বা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১১
তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৭৫

নবুওয়্যতের দলিল হিসেবে কোন মোজেযা পেশ করেছেন তখনই তারা বলেছে আমরা এসব কথায় বিশ্বাস করিনা, উপস্থাপিত দলিল প্রমাণেও আমাদের কোন আস্থা নাই। আমরা শুধু তখনই বিশ্বাস করব যখন সরাসরি আমাদের নিকট সেই বাণী আসে যা আল্লাহর নবীর নিকট এসেছে। শুধু তোমার কাছেই কেন আসবে? আমাদের নিকট কেন ওহী আসবেনা? এর জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ.

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক ভাল ভাবেই জানেন রেসালতের উচ্চ মর্যাদা কাকে প্রদান করা হবে, যাকে তাকে এ মর্যাদা আদৌ দেয়া যায় না।

এ কাফেরদের দাবী কত অযৌক্তিক, কত অসুন্দর যে আল্লাহর রসূলকে তারা মানেনা, আল্লাহ পাকের প্রতিও তারা বিশ্বাস করেনা অথচ নবুওয়্যত লাভের দাবী করে।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবুওয়্যত ও রেসালতের মর্যাদা সাধনা ও পরিশ্রম করে অর্জন করার বস্তু নয়, বরং এটি নিতান্ত আল্লাহ পাকের দান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে এ দানে ধন্য করেন।[১]

اَللّٰهُ اَعْلَمُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই সবচেয়ে বেশি জানেন কে নবুওয়্যতের যোগ্য পাত্র। বয়স বা অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে নবুওয়্যতের যোগ্যতা অর্জন করা যায়না, বরং এটি একমাত্র আল্লাহ পাকের দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে নবুওয়্যত দান করেন।

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا.

অচিরেই এ পাপীষ্ঠরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে চরম লাঞ্ছনা এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। صغار শব্দটির অর্থ হলো অবমাননা, লাঞ্ছনা عند الله আল্লাহর নিকট অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তারা এ অন্যায়ের জন্যে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করবে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো من عند الله (আল্লাহর তরফ থেকে) অর্থাৎ দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে তাদের জন্যে অবমাননা এবং কঠিন শাস্তি অবধারিত রয়েছে। যেমন বদরের যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছিল। بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ আর আখেরাতে রয়েছে দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তি। আর তা এজন্যে যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১০

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ
وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا
يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۭ قَدْ فَصَّلْنَا
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

তরজমা

(১২৫) আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, ইসলাম গ্রহণের জন্যে তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে গোমরাহ করতে চান তার বক্ষকে এভাবে সংকীর্ণ করে দেন যে, ইসলাম গ্রহণ তার নিকট আকাশে আরোহনের ন্যায়ই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা ঈমান আনেনা, তাদের এভাবেই আল্লাহ পাক লাঞ্ছিত করে থাকেন।

(১২৬) আর এটিই আপনার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল সঠিক পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাদের জন্যে নিদর্শন সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

(১২৭) তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে শান্তি ধাম, তাদের কার্যাবলীর জন্যেই তিনি তাদের অভিভাবক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সর্বপ্রথম মোমেন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঈমানকে জীবন ও আলো বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর কাফেরকে মৃত ও অন্ধকার বলা হয়েছে।

হেদায়েত লাভে আল্লাহ পাকের তওফিক পূর্বশর্ত

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহ পাক যদি কোন লোককে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, তবে তার জন্যে ইসলাম গ্রহণের পথ সহজ করে দেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আয়াতে উল্লেখিত "শরহে সদর" বাক্যটির ব্যাখ্যা কি? তখন তিনি এরশাদ করেছেনঃ এর অর্থ হল আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির অন্তরে একটি নূর প্রবেশ করিয়ে দেন যাকে তিনি হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন, ফলে তার মনের কপাট খুলে যায়।

লোকেরা এর আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করেনঃ সে দুনিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী থাকেনা, আখেরাতের সাফল্যের জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন্ মোমেন সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান? তিনি এরশাদ করেছেন, যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে। মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য একখানি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ.

"ইসলামকে বুঝবার জন্যে আল্লাহ পাক যার বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন সে তার প্রতিপালকের নূরের মধ্যে রয়েছে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক দয়া করে তার অন্তরকে নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন, ফলে সে হক্ব ও বাতিল এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের অন্ত রকে আল্লাহ পাক আলোকিত করেছেন।

বস্তুতঃ এ কারণেই দেখা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযাসাল্লামের সংসর্গ লাভের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাঁদের অন্তর সমূহকে নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন, এজন্যেই ইসলামের বিধি-নিষেধ পালনে তাঁরা তৎপর থাকতেন, এ সম্পর্কে তাঁদের অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হতো না এবং কোন অলসতা দেখা যেতো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের কারণে আল্লাহ পাকের আজমত, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম তাঁদের অন্তরে এমনভাবে সৃষ্টি হতো যার ফলে তাঁরা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন অতি সহজে। তাঁদের অন্ত রে ইসলামের সত্যতার প্রতি তথা আল্লাহ পাকের তৌহীদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি একীন এত শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় হত যে, তাঁরা এ সত্যের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে এতটুকু ইতঃস্তত করতেন না। ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নই তাঁদের জীবনের কর্মসূচী হত। আর এটিই হল আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত "শরহে সদরের" প্রকাশ্য রূপ।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৯
তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৬৭

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভীর (রহঃ) মন্তব্য

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত "এজালাতুল খেফা" গ্রন্থে লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কয়েকটি দল ছিলঃ

১. যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেন, নেকী ও কল্যাণ তাঁদের স্বভাবগত ছিল। তাঁদের বিবেক বুদ্ধি এবং পরিণামাদর্শী মনোভাব তাঁদেরকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ স্বভাব তাঁদের ধারে কাছেও ছিল না। সৃষ্টিগত ভাবেই যেন তাঁরা ছিলেন সৎ ও সত্য-সাধক। ফলে ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম সুযোগেই তাঁরা ইসলাম কবুল করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অবশ্য এ দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)। আর তাঁদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ.

(আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, ইসলামকে বুঝবার জন্যে, তার মনের কপাটকে খুলে দেন।)

২. এ দল ছিল তাঁদের, যাঁরা একটা নিদৃষ্ট সময়কাল পর্যন্ত ইসলামের বিরোধিতা করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করেন। আল্লাহ পাক তাঁদের সম্পর্কেই বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ

যারা ছিল মৃত তাদেরকে আমি জীবিত করি। অর্থাৎ যারা আগে কাফের ছিল পরে আল্লাহ পাক তাদেরকে ইসলাম কবুল করার তৌফিক দিয়েছেন এবং তারা প্রকৃত এবং উত্তম মোমেন হয়ে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন, যেমন হযরত হামজা (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং আরো অনেকে। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ.

"এবং আমি তাদের জন্যে আলোর ব্যবস্থা করি। তারা তা নিয়ে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে"।

এ দলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন হযরত ওমর (রাঃ)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! ওমর অথবা আবু জেহেলকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন"। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ দোয়া হযরত ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে কবুল করেন, তিনি ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আর আবু জেহেল পথভ্রষ্টই রয়ে গেল এবং কোপগ্রস্ত হল। আর আলোচ্য আয়াতের বাক্যাংশ

كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا.

দ্বারা আবু জেহেলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত ওমর (রাঃ)-কে প্রকৃত জীবন দান করেছেন। তাঁকে শুধু সঠিক পথই দান করেননি; বরং অন্যদের জন্যে দিশারীও করেছেন। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. সাহাবায়ে কেরামের তৃতীয় দলটি ছিল দারিদ্র প্রপীড়িত, যাঁদেরকে কোরায়শের তথাকথিত নেতারা মন্দ দৃষ্টিতে দেখত এবং তাঁদের সঙ্গে বসতে রাজি হতো না। তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এ আয়াত।[১]

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ.

"আর আল্লাহ পাক যাকে গোমরাহ করতে ইচ্ছা করেন তার বক্ষ এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেন যেন সে দ্রুত বেগে আকাশে চড়ে"।

বস্তুতঃ যে দ্রুত বেগে আকাশে উঠতে চায় অথচ তার পক্ষে তা সম্ভব হয়না, পরিণামে তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। ঠিক এভাবে যারা ঈমান আনেনা, আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করে, ইসলামের সাথে শত্রুতা করে তাদের অবস্থাও ঐ ব্যক্তির মত যে আকাশে উঠতে চায়। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি হামলায় উদ্দত তাদের অবস্থা এই যে, তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের পরিণাম ভয়াবহ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট রাখতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন যে, হেদায়েত কবুল করা তার জন্যে এত কঠিন হয় যেন তাকে আসমানের দিকে উঠতে হচ্ছে। সেভাবে তাদের পক্ষে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনাও সম্ভব হয়না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করলে তাদের মন অপ্রসন্য হয় আর মূর্তি পূজার কথা শুনলে তাদের মন প্রফুল্ল হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করে বনী কানানা গোত্রের একজন গ্রাম্য লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের ভাষায় حَرَجًا শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? গ্রাম্য লোকটি বললো, حَرَجًا ঐ বৃক্ষকে বলা হয় যা বৃক্ষগুলোর এত ভেতরে থাকে যে সেখানে কোন জন্তু বিচরণের জন্যে পৌঁছতে পারে না। এমনকি কোন জংলী চতুঃস্পদ জন্তুও সেখানে যেতে পারেনা। হযরত ওমর (রাঃ) কথাটি শ্রবণ করে বললেন, মুনাফেকের অন্তর এমনই হয় সেখানে কোন কল্যাণ পৌঁছতে পারে না। আসমানে চড়া এমন এক কাজ যা সাধারণতঃ মানুষের শক্তির বাইরে। দৃষ্টান্তটির তাৎপর্য হল এই, যেভাবে আসমানে চড়া সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি মুনাফেকদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানোও সম্ভব নয়।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩০

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী দৃষ্টান্তটির এ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এ মুনাফেকরা ঈমান থেকে এত দূরে পলায়ন করে যেমন কোন ব্যক্তি পলায়ন করে আসমানে উঠে যায় অর্থাৎ ঈমান থেকে তারা এত দূরত্বে থাকে। তাদের অবস্থা এমনই হয় সেখানে কোন কল্যাণ পৌঁছতে পারে না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী দৃষ্টান্তটির এ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এ মুনাফেকরা ঈমান থেকে এত দূরে পলায়ন করে যেমন কোন ব্যক্তি পলায়ন করে আসমানে উঠে যায় অর্থাৎ ঈমান থেকে তারা অনেক দূরত্বে থাকে।

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

যেভাবে বেঈমান ব্যক্তির বক্ষ সংকীর্ণ হয় এবং তার অন্তর ঈমান থেকে দূরে থাকে ঠিক তেমনি যারা ঈমান আনেনা তাদের প্রতি আল্লাহ পাক আযাব নাযিল করেন। رجس শব্দটির অর্থ তফসীরকার আতা (রহঃ) বলেছেন, আযাব। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল দুনিয়াতে লা'নত এবং আখেরাতে আযাব। কালবী (রহঃ) বলেছেন এর অর্থ হল, গুনাহ। মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল এমন জিনিস যাতে কোন কল্যাণ নেই। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল শয়তান অর্থাৎ যারা ঈমান আনেনা শয়তান তাদেরকে কাবু করে বসে।

رجس শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল অপবিত্র। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, শয়তানের চেয়ে অপবিত্র আর কিছুই নেই। আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রহঃ) লিখেছেন, হয়ত এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা.) رجس শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন শয়তান দ্বারা। যাহোক আয়াতের অর্থ হল এই, যারা ঈমান-বিমুখ, যারা ঈমান আনতে রাজি নয় তাদের হৃদয়কে যেমন সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ঠিক তেমনি শয়তানকে তাদের উপর প্রবল করে দেয়া হয়, ফলে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে বসে।[১]

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا.

'(হে রসূল!) আর এটিই আপনার প্রতিপালকের সঠিক পথ'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যে পথে রয়েছেন এবং পবিত্র কোরআন যে পথের সন্ধান দিয়েছে এটিই হল সরল সঠিক পথ। অর্থাৎ যারা আপনার অনুসরণ করবে এবং পবিত্র কোরআন মেনে চলবে তারাই সঠিক পথ লাভ করবে। কেননা, যে পথ মানব জাতির জন্যে আল্লাহ পাক নিদৃষ্ট করেছেন এবং পছন্দ করেছেন তাই আপনাকে দান করা হয়েছে আর এতেই রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

১। তফসীরে ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৩-১৪
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩

আলোচ্য আয়াতে صراط ربك তথা (হে রসূল!) "আপনার প্রতিপালকের পছন্দনীয় পথ" বলা হয়েছে, এতে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যিনি পালনকর্তা, মানব জাতির জন্যে তিনি যে পথ পছন্দ করেছেন তাই তিনি তাঁর রসূলের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব, বিশ্ব প্রতিপালকের পছন্দনীয় হতে হলে তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ.

অর্থাৎ-আমি আয়াত সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি। এতে কোন অস্পষ্টতা নেই; বরং সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। কিন্তু তার দ্বারা উপকৃত শুধু তারাই হয় যারা পবিত্র কোরআন থেকে নসিহত হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাতে চিন্তা-ভাবনা করে। যাদের অন্তরে জেদ রয়েছে বা শত্রুতা রয়েছে তাদের অন্তরে সত্যকে গ্রহণের কোন ইচ্ছাই নাই, তারা তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

অর্থাৎ- যারা সরল সঠিক পথের যাত্রী হবে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশ করবে তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট শান্তি ধাম। "দারুস সালাম" শব্দ দ্বারা জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে। "সালাম" শব্দের অর্থ শান্তি, "দ্বার" হলো ঘর আর শান্তির ঘর শুধু জান্নাতই। কেননা দুনিয়াতে সুখ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করা যায়, শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করা যায় কিন্তু তবুও প্রকৃত অর্থে শান্তি পাওয়া যায় না। কোন না কোন কারণে অশান্তি থাকে বিরাজমান। অথচ বেহেস্তে শুধু শান্তিই শান্তি। অশান্তির কোন সম্ভাবনাই সেখানে নেই।

এজন্যেই মরমী কবি বলেছেন ঃ

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد = کسے را با کسے کارے نباشد

বেহেশত হলো সেই স্থান যেখানে কোন প্রকার কষ্ট থাকবেনা। কারো নিকট কারো কোন ঠেকা থাকবেনা। এতদ্ব্যতীত السلام আল্লাহ পাকের একখানি নাম, এভাবে "দারুস সালাম" অর্থ হলো "আল্লাহর ঘর" আর একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা, যে ঘরটির সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সাথে সে ঘরটি কত বড়, কত মহান এবং কত শান্তির ঘর হবে!

عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ বেহেশতের এই পুরষ্কার রয়েছে আল্লাহ পাকের নিকট বা তাঁর দায়িত্বে, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলবে, যারা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিশেষ পুরষ্কার।

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ তাদের নেক আমলের জন্যেই আল্লাহ্ পাক হবেন তাদের অভিভাবক, তিনিই তাদের সহায় আর তা তাদের ঈমান ও নেক আমলের ফলশ্রুতি।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো তাদের নেক আমলের জন্যে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ভালবাসেন। তিনি তাদের অভিভাবক। দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের তওফিক দিয়েছেন, আত্ম সংশোধন ও আত্মোন্নতি লাভের সুযোগ দিয়েছেন, কবরে মুনকের নকীরের প্রশ্নের জবাবে তওহীদের উপর কায়েম রাখেন এবং আখেরাতে সওয়াব ও নৈকট্য দান করবেন।[১]

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
جَمِيعًا ۚ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ
أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا
أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ
فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَٰلِكَ
نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

তরজমা

(১২৮) আর (সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন, হে জ্বীন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগত করেছিলে। আর তখন তাদের মানুষ বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো শুধু একে অন্য দ্বারা কার্যসিদ্ধি করেছি এবং আমাদের জন্যে তোমার নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি। সেদিন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ দোযখই তোমাদের বাসস্থান। তোমরা তাতে চিরদিন থাকবে। যদি আল্লাহ্ পাক অন্য কিছু ইচ্ছা না করেন নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সু-বিবেচক, মহাজ্ঞানী।

(১২৯) আর এভাবেই আমি জালেমদের কার্যকলাপের কারণে তাদেরকে একে অন্যের বন্ধু করে দেই।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৪-১৫

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সর্বপ্রথম মোমেন ও কাফেরের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এরপর কাফেরদের ভয়াবহ পরিণাম এবং মোমেনদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে শয়তানের বন্ধুদের অবস্থার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক সকলকে যখন একত্রিত করবেন তখন জ্বীনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করবেন, হে জ্বীন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট করেছ। তাদেরকে নিজেদের অনুগত করে গোমরাহ করেছ। এভাবে জ্বিনদেরকে সম্বোধন করার কারণ এই, মানুষ সাধারণতঃ দেব-দেবীর পূজা করে, তা আসলে শয়তানেরই পূজা। শয়তানই তাদেরকে দিশেহারা করে, অন্যায় অসুন্দর পথে পরিচালনা করে। আর এরা মানুষের কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস করেই মানুষ তাদের কথা মেনে চলে। অথচ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন জ্বীন এবং মানুষ সকলকে একত্রিত করা হবে এবং প্রকৃত সত্য যখন সকলের নিকট মূর্ত হয়ে দেখা দেবে, তখন পৌত্তলিকরা তাদের অপকর্মের কৈফিয়ত দিয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরাতো কারো পূজা-অর্চনা করিনি, আমরাতো নিতান্ত সাময়িক ভাবে একে অন্যের দ্বারা নিজেদের কাজ উদ্ধার করেছি, এর দ্বারা কারো এবাদত আমাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। আমাদের মৃত্যুর জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট ছিল তা আসার পূর্বে যে অবকাশ টুকু পেয়েছি তা কাজে লাগিয়ে আমাদের মকসুদ হাসিল করতে প্রয়াসী হয়েছি। এই মকসুদ হাসিলের তাৎপর্য হল মানুষ জ্বীনদের থেকে যাদু বিদ্যা শিখেছে, গনকরা তাদের জ্ঞান অর্জন করেছে। অপরদিকে জ্বীনেরা তাদের আকাঙ্খা পূরণে মানুষ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছে। আরবে তখন এ প্রথা প্রচলিত ছিল কোন পথিক যখন কোন জঙ্গলে বা মরুভূমিতে একা ভ্রমণ করত তখন একথাটি বলতোঃ

اعوذ بسيد هذا الوادى

অর্থাৎ- আমি দুষ্ট জ্বীনদের ক্ষতি থেকে এ স্থানের সর্দারের আশ্রয় কামনা করি। একথার কারণে মানুষ দুষ্ট জ্বীনদের দুষ্টুমি থেকে নিস্কৃতি লাভ করতো এবং রাত্রি শান্তিতে অতিবাহিত করতো। (এ হলো জ্বীন দ্বারা মানুষের উপকৃত হবার কথা) আর মানুষ দ্বারা জ্বীনের উপকৃত হওয়ার পন্থা ছিল এই যে, মানুষ জ্বীনদের পূজা করেছে, পাপাচারে তাদের অনুসারী হয়েছে আর এটিই হল এ বাক্যাংশের অর্থঃ

اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ.

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, اجلنا এর অর্থ হলো কেয়ামতের দিন। কেয়ামতের কঠিন দিনে এভাবে জ্বীন ও মানুষ নিজেদের পাপাচারের কথা স্বীকার করবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৫

قَالَ النَّارُ مَثْوٰكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰهُ

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তোমাদের সকলের ঠিকানা দোযখ, তোমরা তাতে চিরদিন থাকবে তবে যদি আল্লাহ পাকের অন্য কিছু মর্জি হয় তবে স্বতন্ত্র কথা।

কাফেরদের শাস্তি প্রসঙ্গ

اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰهُ.

এ বাক্যটির তাৎপর্য হল–

১. কিন্তু সেই সময়টুকু যা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক দান করবেন, আর সেই সময় হল কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর দোযখে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

২. কিন্তু সেই সময় দোযখ তোমাদের ঠিকানা হবেনা যখন তোমাদেরকে নরকানল থেকে হিমাগারে বদলী করা হবে।

৩. আলোচ্য আয়াতে الا শব্দটি "ব্যতীত" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ তারা চিরদিন দোযখে থাকবে তবে সেই আযাব ব্যতীত যা তাদের জন্যে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করবেন।

৪. এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সে সেব লোককে বোঝানো হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নেই জানেন যে তারা অবশেষে মুসলমান হয়ে যাবে এবং দোযখ থেকে তারা নাজাত লাভ করবে।[১]

বস্তুতঃ দোযখের শাস্তির বিষয়টি আল্লাহ পাকের মর্জির উপরই নির্ভর করে। তিনি যাকে ইচ্ছা যতদিন ইচ্ছা দোযখের শাস্তি দেবেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে নাজাত দান করবেন। এখানে আল্লাহ পাকের মর্জি ব্যতীত কারো কোন কথা বা অভিপ্রায় কার্যকর হবেনা। তবে পবিত্র কোরআনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে ঘোষণা করেছেন তা হল কাফেররা চিরদিন দোযখে থাকবে, তারা সর্বক্ষণ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। প্রতি মুহূর্তে তারা মরণ-জ্বালা ভোগ করবে কিন্তু মৃত্যু তাদের হবেনা। তারা কোন অবস্থাতেই দোযখের আযাব থেকে রেহাই পাবেনা।

এর পাশাপাশি কোন কোন মুসলমানও তাদের পাপাচারের জন্যে দোযখের শাস্তি ভোগ করবে কিন্তু তা চিরস্থায়ী হবেনা, বরং ক্ষণস্থায়ী হবে। একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে এবং তাদের পাপ দূরীভূত হলে আল্লাহ পাক দোযখ থেকে গুনাহ্গার মোমেনদেরকে নাজাত দান করবেন এবং বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করবেন। হাদীস শরীফে একথাও বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআতের বরকতে আল্লাহ পাক এমন লোককেও দোযখ থেকে নাজাত দান করবেন যার অন্তরে কণামাত্র ঈমান থাকবে।

اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৫

অর্থাৎ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক বিজ্ঞানময়, তিনি মহাজ্ঞানী। তিনি যার সাথে যে ব্যবহার করেন তা হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তাঁর কোন কাজ অহেতুক এবং অকেজো হয়না আর তিনি সকলের মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। কার অন্তরে ঈমান কতখানি আছে এবং মুনাফেকী কতখানি আছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাক যাকে শাস্তি দেবেন তা অযৌক্তিক হবেনা এবং কোন অপরাধীর অপরাধ তাঁর জ্ঞানের বাইরেও যাবে না এবং তিনি সব বিষয়ই অবগত আছেন। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অবিচার বলতে কিছু নেই। প্রত্যেক অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তাই তিনি তাঁর জ্ঞান এবং বিবেচনা মোতাবেকই অপরাধী মাত্রকে শাস্তি দেবেন।[১]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হল ঈমানদারদের জন্যে জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে দোযখ স্থায়ী হবে। অর্থাৎ মোমেনগণ সর্বদা জান্নাতে থাকবেন আর কাফেররা চিরদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। কয়েকটি বাতিল ফেরকা যেমন, জোহাইমিয়া ফেরকার মতে, সুদীর্ঘ সময় কাফেরদেরকে দোযখে রাখা হবে। এরপর এ আযাবের পরিসমাপ্তি হবে কিন্তু এ মত সঠিক নয় কেননা, পবিত্র কোরআনের ৫৭টি আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা চিরদিন দোযখে থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. (সূরা বাকারাহ)

"আর যারা কাফের হবে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করবে তারা হবে দোযখবাসী আর তাতে তারা চিরদিন থাকবে"।

(٢) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ.

(٣) وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

(٤) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৬
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১১
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮৬

(٥) وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

(٦) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا.

(٧) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

(٨) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا.

(٩) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا.

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا.

(١١) اَلنَّارُ مَثْوٰكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ.

(١٢) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

(١٣) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا.

(١٤) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

(١٥) كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

(١٦) فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ.

(١٧) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

(١٨) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

(١٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.

(٢٠) وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

(٢١) يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا.

(٢٢) إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.

(٢٣) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

(٢٤) ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ.

(٢٥) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ.

(٢٦) كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ.

(٢٧) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

(٢٨) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا.

(٢٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

(٣٠) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا.

(٣١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا.

(٢٣) فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ.

(٣٣) وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ.

(٣٤) وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.

(٣٥) وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

(٣٦) كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ.

(٣٧) لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

(٣٨) وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

(٣٩) لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ.

(٤٠) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ.

(٤١) مَالَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ.

(٤٢) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ.

(٤٣) اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ.

(٤٤) اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ.

(٤٥) فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا.

(٤٦) كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا.

(٤٨) مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا.

(٤٩) فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ.

(٥٠) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ.

(٥١) وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ.

(٥٢) اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ.

(٥٣) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ.

(٥٤) فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا.

(٥٥) ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى.

(٥٦) نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ.

(٥٧) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْاٰيٰتِ.

এ সমস্ত আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদেরকে চিরদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। শেখ তাকীউদ্দিন সুবকি (রঃ) তাঁর রচিত আল্ এ'তেবার বে বাকায়ে জান্নাতে ওয়ান্নার (الاعتبار ببقاء الجنة والنار) নামক গ্রন্থে এবং আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) তাঁর রচিত তফসীরে মাআরেফুল কোরআনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১]

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

আর এভাবেই আমি পাপিষ্ঠদেরকে তাদের কার্যকলাপের কারণে একে অন্যের সাথী করে দেই। শয়তান জ্বীন আর তাদের মানবরূপী বন্ধুদের ভয়াবহ পরিণতির ন্যায় অন্যান্য জালেম পাপিষ্ঠদের পরিণতিও হবে ভয়াবহ। তাদের পাপ যত বেশী হবে শাস্তিও হবে তত বেশী। আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে দুনিয়াতে যেমন তারা একমত ছিল দোযখেও তাদেরকে এভাবে একত্রিত করা হবে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩৫-৪৩

আলোচ্য আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেনঃ

১. আর যেভাবে আমি কাফের জ্বীন ও মানুষকে দুনিয়াতে একে অন্যের দ্বারা নিজ নিজ মতলব উদ্ধারের সুযোগ দিয়েছি ঠিক তেমনি তাদের কৃতকর্মের কারণে দোযখে তাদেরকে কাছাকাছি রাখব।

২. نولى শব্দটির অর্থ একে অন্যের বন্ধু বানানো অর্থাৎ মোমেনকে মোমেনের বন্ধু এবং কাফেরদেরকে কাফেরদের বন্ধু বানিয়ে দেই। এক মোমেন অন্য মোমেনকে সত্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে, কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে, এক কাফের অন্য কাফেরকে মন্দ ও ঘৃণ্য কাজে উৎসাহিত করে এবং একে অন্যকে সাহায্য করে।

৩. ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল আমি দোযখে কাফেরদের একের পর এককে কাতারবন্দী করে প্রেরণ করব।

نولى শব্দের আরেকটি অর্থ হল একে অন্যের কাছাকাছি থাকা। অর্থাৎ এ কাফেররা দোযখে একে অন্যের কাছাকাছি থাকবে।

৪. আর এ শব্দটির অর্থ কোন কিছু সোপর্দ করাও হয়। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে আমি কোন কোন কাফের মানুষকে কাফের জ্বীনের নিকট এবং কোন কাফের জ্বীনকে কাফের মানুষের সোপর্দ করি।

৫. কালবী (রঃ) আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক যখন কোন সম্প্রদায়ের কল্যাণের মর্জি করেন, নেককার লোকদেরকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ পাক কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ চান তখন মন্দ লোকদেরকে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একথার আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, আমি কোন কোন জালেমকে অন্য জালেমদের উপর প্রবল করে দেই আর এক জালেমের মাধ্যমে অন্য জালেমকে পাকড়াও করি।

কালবীর এ ব্যাখ্যার আলোকে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। যখন ঘাতক এবনে মুলজেমের আঘাতে হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে আসে তখন লোকেরা তাঁর খেদমতে আরজ করল, আমিরুল মোমিনীন! আপনার স্থলে কোন লোককে মনোনীত করুন। তখন হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন, যদি আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করেন তবে নেককার লোকদেরকে তোমাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করবেন। এরপর হযরত আলী (রাঃ) একথাও বলে দিলেনঃ আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করেই হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে আমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, জালেম হল পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের জীবন্ত গজব, জালেমের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মানুষের শাস্তি বিধান করেন, এরপর জালেমকে শাস্তি দেন।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

তরজমা

(১৩০) (আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন জ্বীন ও মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলবেন) হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি? যারা আমার নিদর্শন সমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের (কেয়ামতের দিনের) সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সাবধান করত? তারা বলবে আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করি। মূলতঃ পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকা দিয়েছিল। আর তারা যে কাফের ছিল একথা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষ ও জ্বীনদের শয়তানী কুকর্মের পরিণাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তাদের মৌখিক কৈফিয়ত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সেই মৌখিক কৈফিয়ত তাদের কোন উপকারে আসবেনা; বরং তাদের জন্যে দোযখের কঠোর কঠিন শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন জ্বীন ও মানব জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এভাবে জিজ্ঞাসা করবেন, হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমাদের নিকট কি আমার তরফ থেকে রসূল আসেনি? যারা আমার আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করত এবং আজকের দিন তথা এ কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা বলে তোমাদেরকে সাবধান করত।

এ প্রশ্নের জবাবে কাফেরদের অপরাধ স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকবেনা। তারা এ সত্য স্বীকার করবে যে, আমরা অপরাধী ছিলাম, আমরা রসূলের আহ্বানে সাড়া দেইনি, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রসূল আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তাঁরা আপনার একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁরা কেয়ামতের কঠিন দিনের সম্পর্কেও আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি। আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছি এবং ঈমান আনিনি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ উল্লাস আমাদেরকে প্রতারিত করেছে। আমরা

দুনিয়ার ঐ জীবনকেই স্থায়ী মনে করেছি। কেয়ামতের দিন হাযির হতে হবে একথা কোনদিনই বিশ্বাস করিনি, তাই আজ আমাদের এ বিপদ, কিন্তু অপরাধ স্বীকার করা তাদের জন্যে কোন কাজে আসবেনা কেননা, তাদের শাস্তি অবধারিত।

কেয়ামতের দিন কাফেররা যে তাদের অপরাধ স্বীকার করবে একথার খবর পূর্বাহ্নেই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে দিয়েছে। যাতে করে পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রই এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর এ সত্য উপলব্ধি করে যে, কেয়ামতের দিন অপরাধ স্বীকার করলে তাদের কোন উপকার হবেনা। উপকার হবে শুধু দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নে এবং সৎ কর্ম সম্পাদনে।

দুনিয়ার জীবন প্রতারণা

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেররা কেয়ামতের দিন তাদের অপরাধ স্বীকার করার পর বলবে যে, দুনিয়ার জিন্দেগী আমাদেরকে প্রতারিত করেছে। আমরা সারা জীবন এ ধোকায় পড়েছিলাম যে, দুনিয়ার জিন্দেগীই হবে চিরস্থায়ী। এখানকার আনন্দ উল্লাসই তো আমাদের জীবন, আর সেই আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা হয়ে আমাদের জীবন অতিবাহিত করেছি। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে ঐ জীবনের সকল সত্য মিথ্যায় পরিণত হবে। আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব, সম্পদ-সম্মান, শক্তি-সামর্থ, যাবতীয় আনন্দ সামগ্রী এক কথায় সবই আমাদের থেকে বিদায় নেবে- একথা কোন দিন ভাবিনি।

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا.

(দুনিয়ার জিন্দেগী তাদেরকে প্রতারিত করেছে) পবিত্র কোরআন এ বাক্যটি দ্বারা বিশ্ব মানবকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত থাকলে চলবে না, বরং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহেও ব্যস্ত হতে হবে। এটিই পবিত্র কোরআনের আহ্বান। আর এটিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ।

দুনিয়ার জিন্দেগীর দৃষ্টান্ত

একবার হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ মোবারকে চাটাইয়ের চিহ্ন কেননা, তিনি দুপুরের গরমের সময় শুধু চাটাইয়ের উপর বিশ্রাম করেছিলেন তাই পৃষ্ঠ মোবারকে চাটাইয়ের চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এ অসহনীয় দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলেন এবং আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! রোমক সম্রাট এবং পারস্য সম্রাট কত শান-শওকতে, আরাম-আয়েশে আছে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি দু' জাহানের বাদশাহ হয়েও এত কষ্ট কেন করবেন?

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে ওমর! তুমি কি এখনও এ ভুলেই আছ?

إِنَّمَا أَنَا كَرَاكِبٍ خَيْلٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ.

আমার অবস্থাতো শুধু সেই মুসাফিরের ন্যায় যে বৃক্ষের ছায়াতলে ক্ষণিকের জন্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে। দু'দিনের এ জিন্দেগীর জন্যে তাই সুখ-সামগ্রীর আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

জ্বীনদের মধ্য থেকে কি কোন রসূল হয়েছিলো?

তফসীরকারগণ এ আয়াতের তফসীরে উপরোক্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেহেতু এ আয়াতে আল্লাহ পাক জ্বীন ও মানব জাতিকে একই সঙ্গে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ.

"হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট কি কোন রসূল আসেনি"? এর দ্বারা একথা অনুভূত হয় যে, যেভাবে মানুষের মধ্যে নবী রসূলের আগমন হয়েছে, ঠিক তেমনি জ্বীনদের মধ্য থেকেও নবী মনোনীত করে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) যিনি তাবেয়ী ছিলেন তাঁকে কেউ এ প্রশ্ন করে যে আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে জ্বীনদের মধ্যে কোন নবীর আগমন হয়েছে কি? তখন তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে দলিল হিসেবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম ও তফসীরকারগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নবী রসূলগণ শুধু মানব জাতি থেকেই মনোনীত হয়েছেন। জ্বীনদের মধ্যে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি, শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধিগণ জ্বীনদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ মানব জাতি থেকেই রসূল মনোনীত হয়েছেন, জ্বীনদের নিকট তাঁদের প্রতিনিধিগণ গমন করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ নবী রসূলগণ শুধু মানব জাতি থেকেই মনোনীত হয়েছেন, জ্বীনদের থেকে কোন নবী রসূল গ্রহণ করা হয়নি। জ্বীনদের মধ্যে যারা নেক, তারা অন্য জ্বীনদেরকে সৎ কাজের দিকে আহ্বান জানায়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে।[২]

এ পর্যায়ে আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেনঃ রসূল শুধু মানুষ থেকেই মনোনীত হয়েছেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, রসূল শুধু বনী আদম থেকেই এসেছেন। জ্বীনদের নিকট শুধু উপদেশ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১২
২। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫

দানকারী প্রেরিত হয়েছেন। ইমাম কুরতবী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১]

এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) কালবী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জ্বীন ও মানুষ সকলের নিকট নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন। শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সমগ্র জ্বীন ও মানব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি কোন বিশেষ যুগ বা জাতির জন্যে আগমন করেননি; বরং সর্বকালের সকল মানুষ ও জ্বীনদের হেদায়েতের জন্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এরপর নিজের মন্তব্য পেশ করেছেন যে, এমন মনে হয় জ্বীন হোক কি মানুষ সকলের নিকটই আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকটই আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে নবী প্রেরণ করেছেন যেমন, পবিত্র কোরআনের অন্য একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا.

অর্থাৎ-যদি দুনিয়াতে ফেরেশতাদের বস্তি থাকত তবে তাদের হেদায়েতের জন্যে ফেরেশতাকে রসূল করা হতো।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জ্বীনদের মধ্যে কোন জ্বীনকেই পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়েছে। কেননা, যাকে প্রেরণ করা হয় তার সাথে একাত্মতা থাকতে হয় তাদের যাদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত, জ্বীনদের বিবেক বুদ্ধি আছে, মানব জাতি সৃষ্টির পূর্বে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। যেহেতু তাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে তাই তাদের প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপিত হবে এটিই স্বাভাবিক। আর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

অর্থাৎ- আমি জ্বীন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব। আর যদি জ্বীনদের মধ্য থেকে কাউকে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ না করা হতো তবে তাদেরকে আযাবও দেয়া হতো না। কেননা, আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

অর্থাৎ- যে পর্যন্ত আমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট রসূল প্রেরণ না করি সে পর্যন্ত সে সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যবস্থা করিনা।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে জ্বীনদের মধ্যে কিছু জ্বীনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়।[২]

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৭

এ সম্পর্কে আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেনঃ যদিও আলোচ্য আয়াতে জ্বীন ও মানব জাতি উভয়কে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ "(হে জ্বীন ও মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে কোন রসূল কি আসেনি?)" এতে একথা প্রমাণিত হয়না যে, মানুষের মধ্যে মানুষ এবং জ্বীনদের মধ্যে জ্বীন নবীর আগমন হয়েছে। কেননা, উপরোল্লিখিত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোন রসূলের আবির্ভাব সাব্যস্ত হওয়াই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক শ্রেণীর নিকট নবীর আবির্ভাব হওয়া জরুরী নয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রত্যেক নবীর নবুওয়্যত যেমন সার্বজনীন ছিলনা, ঠিক তেমনি জ্বীনদের মধ্যেও কোন জ্বীনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি।

মূলতঃ আল্লাহ পাক জ্বীনদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে তাদেরকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। একথার সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের সূরা জ্বীনে।

আমরা বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখতে পারি। কোন ফেরেশতাকে যদি মানুষের জন্যে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করা হয় তবে হেদায়েতের কাজ সম্ভব হবেনা কেননা, ফেরেশতাকে যদি তার প্রকৃত রূপে প্রেরণ করা হয় তবে মানুষের পক্ষে তার দর্শন লাভ সম্ভব নয়, তা মানুষের সাধ্যাতীত। যার দর্শন মানুষ লাভ করতে পারেনা, তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

পক্ষান্তরে, যদি ফেরেশতাকে মানবরূপ দিয়ে প্রেরণ করা হয় তবে তার সত্যতা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়া অতি স্বাভাবিক। এজন্যে ফেরেশতাকে পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করা হয়নি আর এই একই কারণে কোন জ্বীনকেও পয়গম্বর হিসেবে মনোনীত করা হয়নি কেননা, দৈত্য-দানব দ্বারা হেদায়েত লাভ করা মানুষের জন্যে অকল্পনীয়।

আর একথা সর্বজন বিদিত যে, মানুষকে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করলে কারোই কোন অসুবিধা হয়না। মানুষের ব্যাপারে তো কোন প্রকার প্রশ্নই ওঠেনা এমনকি, জ্বীনদের ব্যাপারেও কোন অসুবিধে থাকার কথা নয় কেননা, মানুষকে যদি মানুষ রূপে দেখা যায় এবং তার সান্নিধ্য লাভ করা যায় তবে জ্বীনদের কোন ভয়ও থাকেনা, অসুবিধাও থাকেনা। অতএব, তারা মানুষ পয়গম্বরের নিকট থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ পাক মানুষকে এমন মনোবল দান করেছেন যা দ্বারা জ্বীনদের ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়। ফলে কোন নবী রসূলের মনকে জ্বীনদের ভয়-ভীতি স্পর্শ করেনা যা তাদেরকে হেদায়েত করার ব্যাপারে কোন অসুবিধাও নয়।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী রসূল শুধু মানুষের মধ্য থেকেই হয়েছেন, জ্বীনদের মাঝ থেকে নয়।[১]

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ-এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ ও সম্পদ এবং আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকা তাদের গাফলতের মূল কারণ। তারা শুধু এ কারণেই আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন জীবন-যাপন করেছে। অবশেষে একদিন তাদেরকে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের দরবারে জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে– একথা তারা আদৌ স্মরণ করেনি। তাই তাদের পরিণাম হবে শোচনীয়।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮৬

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا
غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ
اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾ ؕ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ
لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ
عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

তরজমা

(১৩১) তা এজন্যে যে, আপনার প্রভূ কোন জনপদকে তার অধিবাসীদের অজ্ঞাত অবস্থায় ধ্বংস করেন না।

(১৩২) প্রত্যেকের জন্যেই তার আমল অনুযায়ী স্থান রয়েছে। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে গাফেল নন।

(১৩৩) আপনার প্রতিপালক অভাব মুক্ত, তিনি করুণাময়, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে অপসারিত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তাকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

(১৩৪) তোমাদের নিকট যে ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্য অবশ্য ঘটবে। তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।

(১৩৫) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করতে থাক, আমিও কাজ করছি, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে কার পরিণাম কল্যাণকর। নিশ্চয় জালেমরা কখনও সাফল্যমন্ডিত হবে না।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণের প্রেরণের অন্যতম কারণ এরশাদ করেছেন যে, আগেই কোন স্থানের অধিবাসীকে সতর্ক না করে তিনি তাদের পাপাচারের শাস্তি দেন না। আল্লাহ পাকের নিয়ম হল তাঁর রসূল প্রেরণ করে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানান।

মানুষকে ভাল-মন্দ বুঝবার সুযোগ দান করেন এবং এ জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে এবং মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত করেন। আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী সম্পর্কে সতর্ক করেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কোন এলাকাবাসী বা কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত না হয় তবে তাদের সম্পর্কে শাস্তির আদেশ জারী হয়, যেন কাল কেয়ামতের দিন একথা কেউ বলতে না পারে যে, "আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না"। এজন্যেই পয়গম্বর প্রেরণের মাধ্যমে মানুষকে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানান হয়। অন্যায় অনাচারের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং তার ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়।

بِظُلْمٍ

এ শব্দটির দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

১. অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাক কোন এলাকাবাসীকে জুলুম করে ধ্বংস করেন না। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (সূরা ক্বাফ)

অর্থাৎ- আমি আমার বন্দাদের প্রতি জালেম নই। আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি জুলুম করেন না এবং আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি কেয়ামতের দিনও কোন জুলুম করবেন না; বরং সেদিন ন্যায় বিচার কায়েম হবে। আল্লাহ্ পাক বন্দাদের প্রতি রহমত করেন। এরশাদ হয়েছেঃ

غَلَبَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ.

"আমার ক্রোধের উপরে আমার রহমত প্রভাব বিস্তার করেছে"।

(২) অথবা এ শব্দটির অর্থ হল কোন সম্প্রদায়ের জুলুমের কারণে তাদেরকে নবী রসূলের মাধ্যমে সতর্ক করার পূর্বে ধ্বংস করেন না।

কোন সম্প্রদায় যত বড় অত্যাচারীই হোক না কেন তাকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করা হয়। আত্ম সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়, এরপরও যদি তারা জুলুম অত্যাচার অব্যাহত রাখে তখন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।[১]

وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ

অর্থাৎ- কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহ্ পাকের বিধান সম্পর্কে বে-খবর থাকে তবে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় না।[২]

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ এই নয় যে ঐ সম্প্রদায় যখন গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তার প্রতিও তারা গাফলত করে; বরং এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাক যে পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৯৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৮
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১২

তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত না করেন এবং নাফরমানীর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক না করেন, তারা তাদের পরিণাম সম্পর্কে অবগত না হয় এমন অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন না।[১] আল্লামা শওকানী (রঃ) ও আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ বাক্যটির অর্থ হল কোন সম্প্রদায়ের নিকট নবী প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান না করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেন না।[২]

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا.

অর্থাৎ- মানুষের আমল অনুযায়ী তার অবস্থান নির্ধারিত হবে। কেউ তার নেক আমলের কারণে অনেক সওয়াব পাবে, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হবে, বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছতে পারবে আর কেউ এমন উচ্চ মর্তবা পাবেনা কিন্তু নেক আমলের কারণে বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবে। এর পাশাপাশি কোন কোন দুবৃত্ত তাদের অবাধ্যতা, নাফরমানী এবং কুকীর্তির কারণে কঠোর শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। দোযখের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হবে। আর কেউ কেউ তার অন্যায় আচরণের কারণে দোযখের পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। অতএব ঈমান, নিয়ত এবং আমলের পার্থক্যের কারণে মানুষের পরিণামেও পার্থক্য হবে।

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ.

আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক মানুষের কার্যাবলী সম্পর্কে গাফেল নন। মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ.

তিনি জানেন যা কিছু মানুষ গোপন করে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।

আল্লাহর সৃষ্টি চার প্রকার

এ পর্যায়ে আল্লামা শওকানী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি চার প্রকার। এক প্রকার এমন যাদের সকলেই জান্নাতে থাকবে আর অন্য প্রকার এমন যাদের সকলেই দোযখে থাকবে। আর দুই প্রকার সৃষ্টি জান্নাত এবং দোযখ উভয় স্থানে থাকবে। যাদের সকলেই জান্নাতে থাকবে তারা হল ফেরেশতা আর যাদের সকলেই দোযখে থাকবে তারা হল শয়তান। আর যারা জান্নাত এবং দোযখ উভয় স্থানে যাবে তারা হল মানুষ এবং জ্বীন। তারা ঈমানের সাথে নেক আমল করলে সওয়াব পাবে এবং জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে ঈমান না আনলে এবং সৎ কাজ না করলে শাস্তি ভোগ করবে।[৩]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৯৭
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৮
তফসীরে ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৩
৩। তফসীরে ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৪

আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ.

আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তার কারণ আদৌ এই নয় যে, বন্দাদের এবাদতের তাঁর কোন প্রয়োজন আছে, প্রকৃত অবস্থা এই যে, বন্দাদের এবাদত বন্দেগীর তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, এরশাদ হয়েছেঃ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ.

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারো প্রতিই নির্ভরশীল নন। কারো কাছেই তাঁর কোন ঠেকা নেই, নেই কোন প্রয়োজন, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর, তিনি সকল ক্ষমতার মূল উৎস, তিনি চির বেপরোয়া, সকলের ঠেকা তাঁর নিকট, কারো কাছেই তাঁর ঠেকা নেই, ত্রিভূবনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, সকলেই তাঁর করুণার ভিকারী।

তিনিই দয়াবান

ذُو الرَّحْمَةِ

আর তিনি হলেন করুণাময়, তাঁর করুণা অনন্ত অসীম, তাঁর অন্তহীন করুণার কারণেই তিনি বারে বারে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

অতএব, রসূল প্রেরণ দয়াময়ের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু যারা এ দয়ার অনাদর করে, সরল সঠিক পথের সন্ধান পেয়েও তা গ্রহণে অবহেলা করে, তাদের জীবন হয় দুর্বিষহ। ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং অন্য কোন জাতিকে তাদের স্থলে আনয়ন করেন। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ.

(হে মক্কাবাসী!) যদি আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের পাপাচারের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে যাকে ইচ্ছা তাকে আনয়ন করবেন।

كَمَآ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ.

যেভাবে তোমাদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর হিসেবে তিনি সৃষ্টি করেছেন আর তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছেন ঠিক তেমনি যে কোন মুহূর্তে তিনি তোমাদেরকেও বিদায় করতে পারেন।

কেয়ামত অবশ্যই আসবে

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ.

আর তোমাদের সাথে যে বিষয়ের অঙ্গীকার করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে। তোমাদের প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর অবশ্যই হিসাব দিতে হবে। যদি ভাল কাজ কর তবে সওয়াব বা শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। যদি মন্দ কাজ কর তবে শাস্তি অবধারিত।

অতএব, তোমাদের অন্যায় আচরণের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হও, যদি তোমাদের অবাধ্যতা অব্যাহত থাকে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ.

আর সে শাস্তি তোমরা প্রতিরোধও করতে পারবেনা। যারা তোমাদেরকে পাকড়াও করতে আসবে তাদেরকে তোমরা কাবু করতে পারবেনা; বরং তারাই তোমাদেরকে কাবু করবে।

বস্তুতঃ সারা বিশ্ব একত্রিত হলেও আল্লাহ্ পাকের কোন মর্জিকে কার্যকর করা থেকে বাধা দিতে পারবেনা। আর আল্লাহ্র দুনিয়া থেকে পলায়ন করারও সাধ্য কারো হবেনা। ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ, আবু জেহেল, আকাবা এবনে আবি মুয়ীত, মুসায়লামাতুল কাজ্জাব তারা কি তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেনি? আর এমনিভাবে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় আল্লাহর আযাবে পতিত হয়ে কি নিশ্চিহ্ন হয়নি?

সুতরাং যারা আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের রেহাই নেই।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ

এ বাক্যটি সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, বাক্যটির বর্ণনা-শৈলী এমন যে এর অর্থ শুধু এতটুকু নয় যে, আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং এর অর্থ হল যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন তিনি শুধুমাত্র এক আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়।

এমনিভাবে যিনি দয়াবান, করুণাময়, রহীম ও রহমান তিনি একমাত্র আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়। অতএব, রহমত পেতে হলে শুধু আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকেই পেতে হয়। আল্লাহ পাকের রহমত বিনা কারো কোন গত্যন্তর নেই। যে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হয় সে চির বঞ্চিত, চির হতভাগা।[১]

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম এরশাদ করেছেনঃ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ. অর্থাৎ- আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। এরপর এরশাদ করেছেনঃ ذُو الرَّحْمَةِ অর্থাৎ- তিনি করুণাময়।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১৯৯-২০০

যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কোন সৃষ্টির নিকটই তাঁর কোন ঠেকা নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি করুণাময়, তাঁর করুণা-ধারা বর্ষিত হচ্ছে অহরহ, সর্বত্র। তাঁর অনন্ত অসীম করুণার মধ্যে অন্যতম করুণা হল রসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানব জাতির হেদায়েতের ব্যবস্থা করা।

আল্লাহ পাকের পর মুখাপেক্ষী না হওয়া সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে এরশাদ হয়েছেঃ যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল হয় তবে তাঁর শানে এতটুকু কিছু বাড়বেনা। পক্ষান্তরে, যদি সারা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর নাফরমান হয় তবুও তাঁর শান এতটুকু কমবেনা। তাঁর শান যা আছে তাই থাকবে। কেননা, তিনি গণী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি চির অমুখাপেক্ষী। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে তোমাদেরকে বিদায় করে দিতে পারেন এবং এ অবস্থায় তাঁর কোন ক্ষতি হবেনা। তাঁর সৃষ্টির কারখানা চলতে থাকবে আপন গতিতে। আর তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করতে পারেন। তাও তাঁর জন্যে কোন কঠিন কাজ নয়। ইতিপূর্বে তোমরাও ছিলেনা, অন্যরা ছিল। তাদেরকে বিদায় করে দিয়ে তিনিই তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে এনেছেন। পুনরায় তোমাদেরকে বিদায় করে দিয়ে অন্যদেরকে আনবেন। তোমরা হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন। এটি অত্যন্ত সহজ কাজ, সৃষ্টি জগতের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা এই, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হও সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কেননা, তিনি সর্ব শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বজ্ঞ, মহা পরাক্রমশালী। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারোই নেই।

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ.

(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য সম্পর্কে সতর্ক করেছি, তোমাদের কল্যাণ অকল্যাণের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা নাফরমানী বর্জন না কর তবে তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাক, আমিও আমার কর্তব্য পালন করলাম। অর্থাৎ-তোমরা তোমাদের নাফরমানী, বেঈমানী ও দৌরাত্ম অব্যাহত রাখ, আমিও ইসলাম এবং সবরের উপর কায়েম থাকি, তোমাদের শত্রুতা এবং ষড়যন্ত্রের আমি পরোয়া করিনা। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কার পরিণাম কি হয়, কে বাতিল পন্থী ছিল? অবশেষে সবই সুস্পষ্ট ভাবে মূর্ত হয়ে দেখা দেবে, তবে মনে রেখো,

إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ.

নিশ্চয় জালেম ও পাপিষ্ঠদের পরিণতি কোন দিনই ভাল হতে পারেনা, কোন অবস্থাতেই তারা সাফল্য মন্ডিত হয়না।

ইতিহাসের অমোঘ বিধান

ইতিহাস সাক্ষী! অবশেষে পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণাই ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মক্কার পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছিল, তারা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অহরহ চরম নির্যাতন এবং উৎপীড়ন করেছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সুদীর্ঘ তেরটি বছর যাবত নির্যাতীত উৎপীড়িত হতে হয়েছিল এমনকি, তাদের চরম নির্যাতনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে প্রিয় মাতৃ-ভূমি মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করতে হয়, নিজেদের ভিটা-মাটি ছেড়ে দিয়ে নিঃস্ব হৃত-সর্বস্ব হয়ে হাযির হতে হয় প্রাণের মদীনায়। তার একবছর পরই বদরের রণাঙ্গণে জালেম এবং মজলুমের সংঘর্ষ হয়, আল্লাহ পাক তাঁর অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেন, নিরস্ত্র-প্রায় ৩১৩ জন মোমেন অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত কাফেরদেরকে পরাজিত করে।

এভাবে সত্যের জয় হয়। অসত্য ভূলুণ্ঠিত হয়, পবিত্র কোরআনের ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়। এর মাত্র সাত বছর পর তথা অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ পাকের খাছ রহমতে মক্কা বিজয় হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পথ দিয়ে বিজয়ীর বেশে দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিয়ে মক্কা শরীফে আগমন করেন, যে পথ দিয়ে তিনি একমাত্র সাথী হযরত আবুবকরকে (রাঃ) নিয়ে রাতের অন্ধকারে মজলুম অবস্থায় মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করেছিলেন।

আল্লাহর ঘরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। আর পবিত্র কোরআনের আয়াত এ সত্য ঘোষণা করছিলঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে। মিথ্যা যে বিদায় নেয়ারই যোগ্য) এরপর মাত্র দু' বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এরই মধ্যে ইসলাম সারা আরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, সত্যের নিজস্ব একটি শক্তি আছে যার মোকাবেলা মিথ্যা কোনদিন করতে পারেনা। তাই সত্য চির অজেয়, আর মিথ্যা চির পরাজিত। ইসলাম চিরন্তন সত্য আর শেরক ও কুফর সর্বকালে বাতিল বলে বিবেচিত। তাই বাতিল শেরক ও কুফর কোনদিন ইসলামের মোকাবেলা করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবেনা। এটিই ইতিহাসের অমোঘ বিধান।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا
لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ
لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ
يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ
زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ
شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

তরজমা

(১৩৬) আল্লাহ পাক যে শস্য ও চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন তারা তন্মধ্য থেকে এক অংশকে আল্লাহ পাকের জন্যে নির্দিষ্ট করে, আর নিজেদের ধারণা মোতাবেক বলে এ অংশ আল্লাহ পাকের জন্যে, আর এ অংশ আমাদের দেবতাদের জন্যে। অথচ যে অংশ তারা তাদের দেবতাদের জন্যে রেখেছে তা আল্লাহ পাকের নিকট পৌছায় না; কিন্তু যা আল্লাহ পাকের অংশ তা দেবতাদের নিকট পৌছায়। কত মন্দ মীমাংসাই না তারা করে।

(১৩৭) আর এভাবে তাদের দেবতারা বহু পৌত্তলিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করে দিয়েছে। তাদের ধ্বংস সাধনের জন্যে এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তারা এ কাজ করতো না। অতএব, তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দাও।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পৌত্তলিকদের আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যে মূর্খতা ছিল তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। যেমন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করত, কেয়ামতকে অস্বীকার করত, সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করত না। পৌত্তলিকদের এসব মূর্খতার বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতে কর্মজীবনে তাদের যে মূর্খতা ছিল এবং তারা যে মন্দ আচরণ করত তার কিছু বিবরণ রয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২০৪

শানে নুযুল

বর্বরতার যুগে আরবদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তারা তাদের বাৎসরিক যে ফসল উৎপন্ন হতো এবং তাদের কাছে যে চতুঃস্পদ জন্তু থাকত তাকে তারা দু'ভাগে বিভক্ত করত। এক ভাগ তারা আল্লাহ পাকের নামে রাখত আর এই ভাগকে তারা মুসাফির, মিসকীন মেহমানদের জন্যে ব্যয় করত। আরেকটি ভাগ তারা তাদের দেবতাদের জন্যে রাখত যা তারা মন্দিরে সংরক্ষিত মূর্তিগুলোর উপর চড়াতো এবং মন্দিরের পন্ডিত ও পুরোহিতদের জন্যে ব্যয় করত। যদি ঘটনাচক্রে উভয় ভাগ একত্রিত হতো তবে সবটাই তারা দেবতাদের নামে ব্যয় করত। যদি তারা লক্ষ্য করত যে, উত্তম সম্পদ আল্লাহর অংশে চলে গেছে তখন তাও দেবতার নামে দিয়ে দিত। তারা বলতো, আল্লাহ পাক তো পর মুখাপেক্ষী নন, তাঁরতো এসবের প্রয়োজন নেই, তাই সবই তারা দেবতাদের জন্যে দিয়ে দিত। এ বিবরণ পেশ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ তাদের এ অভ্যাসও ছিল যে, যদি আল্লাহর নামে মানতের অংশের ফসল অপেক্ষাকৃত উত্তম মনে হতো তবে দেবতার নামে নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে তা পরিবর্তন করে নিত। কিন্তু দেবতার নামে নির্দিষ্ট অংশ যদি উত্তম মনে হত তবে আল্লাহর নামের অংশের সাথে তা বদলে নিত না, শুধু তাই নয় তাদের এ অভ্যাসও ছিল যদি ঘটনাচক্রে তাদের দেবতার ভাগে কিছু ফসল আল্লাহ পাকের অংশের সাথে মিশে যেত তবে তা সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে নিত; অথচ সব কিছুইতো আল্লাহর সৃষ্টি, ফসলও আল্লাহর সৃষ্টি এবং চতুঃস্পদ জন্তুও আল্লাহর সৃষ্টি।

অতএব, তারা আল্লাহ পাকের মধ্যে এবং তাদের দেবতাদের মধ্যে যে ভাগ বন্টন করেছে তা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাদের আরো নির্বুদ্ধিতা হল দেবতাদের প্রাধান্য দেয়া। তারা বুঝত যে, তাদের দেবতাগুলো সম্পূর্ণ অক্ষম, অসহায়, তাদের দীনতা, হীনতা এবং অক্ষমতা পৌত্তলিকরা স্বীকারও করত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলোকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করতে তারা বিন্দুমাত্রও লজ্জাবোধ করত না। যদি দেবতার ভাগের কোন অংশ বিনষ্ট হত তবে আল্লাহর নামে প্রদত্ত অংশ থেকে এনে দিত। কিন্তু আল্লাহর নামের অংশ থেকে কিছু যদি বিনষ্ট হতো তবে দেবতার অংশ থেকে এনে ক্ষতিপূরণ করা হতো না।

কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ যদি তারা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতো তবে আল্লাহর জন্যে যে অংশ রাখা হতো তা থেকে ভোগ করত, কিন্তু দেবতাদের অংশ থেকে তারা ভোগ করত না, এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ.

তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রা.) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪৬

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২০৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৩

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যে ফসল উৎপন্ন করেছেন এবং যে চতুঃস্পদ জন্তু পয়দা করেছেন, সবই মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের দান। এ দানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ভাগ বসানোর মত নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে! তদুপরি তাদের হাতের তৈরী মূর্তিগুলোকে উত্তম বস্তু দান করা তাদের আরো একটি নির্বুদ্ধিতা এবং জুলুম।

فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ.

এ ভাগ বাটোয়ারা তাদের নিজেদের ধারণা মোতাবেকই করত, আল্লাহ পাক তাদেরকে নির্দেশ দেননি। শরীয়তে এর কোন বিধান নেই।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ.

অর্থাৎ যেভাবে তারা ফসল ও চতুঃস্পদ জন্তু ভাগ করত, ঠিক তেমনি তাদের মধ্যে আরও একটি মন্দ প্রথা প্রচলিত ছিল, আর এ প্রথাটি ছিল অত্যন্ত নির্মম এবং অমানুষিক। তাদের কেউ কেউ শ্বশুর হতে লজ্জা বোধ করত তাই কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করত, আর কেউ অর্থ-সম্পদের অভাবের ভয়ে সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করত। আর কখনও তারা এমন মানত করত যে, আমার অমুক উদ্দেশ্য হাসিল হলে বা আমার এত সংখ্যক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি আমার একটি পুত্র অমুক দেবতার নামে উৎসর্গ করব এবং তারা ঐ মানত পুরো করত সন্তান-সন্ততিকে বলি দেয়ার মাধ্যমে। নিষ্ঠুর পৌত্তলিকরা এমন মন্দ, নিন্দনীয় কাজকে পূণ্যময় কাজ করে করত।

আলোচ্য আয়াতে شُرَكَآءُ শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল শয়তান। এমন অবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে এই, সন্তান-সন্ততি হত্যাকে শয়তান তাদের নিকট শোভনীয় করে দেখাত। শয়তানের ফাঁদ অতি সূক্ষ্ম। সে এই পৌত্তলিকদেরকে এ পর্যায়ে যে প্ররোচনা দিত তা হল যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করেছেন এবং এক মহান আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেভাবে তোমরাও তাঁর অনুসরণ কর। এটি বড় পূণ্যময় কাজ। তাই পৌত্তলিকরা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করত।

কালবী (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে شُرَكَآءُ শব্দটির অর্থ হল পূজারী; মন্দিরে যে সব পূজারীরা থাকত তারাই কাফেরদেরকে তাদের সন্তানদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করত। সন্তান হত্যার মত এমন জঘন্য কাজকে তারা ধর্মের নামে করত। শয়তান বা পূজারীরা এ জঘন্যতম প্রথাকে পূণ্যের লেবাছ পরিয়ে তাদের নিকট আকর্ষণীয় করে রেখেছিল।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলাম স্বভাব ধর্ম। ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম, মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন ইসলামের মূল লক্ষ্য। তাই এমন গর্হিত এবং অমানবিক কাজ পরিহার করার আহ্বান রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ

যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এ কাজ করত না। কিন্তু তাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তারা মন্দ কাজে লিপ্ত, আর এমন মন্দ কাজের পরিণাম ভয়াবহ।

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, এ অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণ তারা করতে থাকুক, অবশেষে তাদেরকে তাদের অপকর্মের ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

وَقَالُوا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ
نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ
لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ
بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ
مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ
عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

তরজমা

(১৩৮) আর তারা তাদের ধারণা মতে বলে, এ জীব-জন্তু এবং শষ্য ফসলাদি নিষিদ্ধ। আমরা যাদের সম্পর্কে ইচ্ছা করি তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা আহার করতে পারবে না। আর কোন কোন জন্তুর পিঠে আরোহনও তারা নিষিদ্ধ মনে করতো। আর কোন কোন পশু জবাই করার সময় তারা আল্লাহ পাকের নাম লয়না। এসবই তারা আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যারোপের উদ্দেশ্যে বলে থাকে। অচিরেই আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের মিথ্যাচারের জন্যে শাস্তি দেবেন।

(১৩৯) আর তারা আরও বলে, এ চতুঃষ্পদ জন্তুর গর্ভে যা কিছু আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের আহার্য। আমাদের স্ত্রীদের জন্যে তা অবৈধ। আর তা যদি মৃত হয় তবে নারী পুরুষ উভয়েই তাতে অংশীদার। অচিরেই আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের এ সমস্ত বর্ণনার শাস্তি দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববতী আয়াতে আরবের পৌত্তলিকরা ধর্মের নামে যে অধর্মের কাজ করত এবং পূণ্যের নামে যে ঘৃণ্য কাজ করত তার বিবরণ ছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহেও তাদের

এমনি নিন্দনীয় কাজ এবং মন্দ আচরণের বিবরণ স্থান পেয়েছে। কাফেরদের মধ্যে একটি মন্দ প্রথা প্রচলিত ছিল এই; কোন কোন চতুঃষ্পদ জন্তু সম্পর্কে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এ জন্তুগুলোর গোশ্ত শুধু পুরুষরাই খেতে পারবে। মেয়েদের জন্যে ছিল ঐ গোশ্ত নিষিদ্ধ। অথবা পুরোহিতরাই খাবে সাধারণ মানুষ নয় অর্থাৎ ঐ গোশ্ত শুধু মন্দিরের পূজারীদের ভোগ্য হবে, অন্যদের তাতে কোন অধিকার থাকবে না। এমনিভাবে পৌত্তলিকদের মধ্যে আরও একটি কু-প্রথা ছিল এই যে, বিশেষ বিশেষ জন্তু সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, এ জন্তুগুলোর পৃষ্ঠদেশে কেউ আরোহন করতে পারবে না এবং ঐ জন্তুগুলো কোন প্রকার বোঝাও বহন করবে না।

আর কোন কোন জন্তু সম্পর্কে পৌত্তলিকদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, ঐ জন্তু গুলো জবাই করার সময় বা তাতে আরোহণ করার সময় বা ঐ জন্তুগুলো থেকে দুগ্ধ দোহন করার সময় আল্লাহ পাকের নাম লওয়া যাবে না। ঐ বিভ্রান্ত লোকদের মধ্যে এ বিভ্রান্তিও ছিল যে, যদি আল্লাহ পাকের নাম লওয়া হয় তবে তাদের দেবতারা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এসবই ছিল তাদের মনগড়া প্রথা। তাদের কল্পনা প্রসূত নিয়ম-কানুন, এতে কোন সত্য বা কল্যাণ ছিল না। কিন্তু পৌত্তলিকদের চরম ধৃষ্টতা ছিল এই যে, তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য এ প্রথা সমূহকে তারা আল্লাহর নামেই প্রচলন করত এবং এসব আল্লাহর নির্দেশ বলে প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হতো না। এসব কু-প্রথা তারাই তৈরি করত আর বলে বেড়াত যে, এসব আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক করা হচ্ছে।

سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের এ মিথ্যা আচরণের এবং তাদের দৌরাত্মের কঠোর শাস্তি দেবেন।

এতে রয়েছে মন্দ প্রথা প্রচলনকারী ও তাদের অনুসারীদের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا.

আর কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত কু-প্রথা সমূহের একটি ছিল এই যে, তারা "বহীরা", "সায়িবা" সহ অন্যান্য দেবতার নামে মানত করত এবং তাদের নামেই জীব-জন্তু জবেহ করত। জবাই করা জীব-জন্তুর পেটে যদি জীবিত বাচ্চা পাওয়া যেত তবে তা শুধু পুরুষরাই খেতে পারত, মেয়েদের জন্যে ছিল ঐ বাচ্চা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি মৃত হত তবে নারী পুরুষ সকলেই তা খেতে পারত। তাদের এ সমস্ত কুসংস্কার সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তাই তাঁর বিচার-বিবেচনা মোতাবেক তিনি তাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা শওকানী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোন বকরির বাচ্চা নর হত তবে তারা তা জবেহ করত এবং পুরুষরা তা খেতে পারত। ঐ বাচ্চার গোশ্ত

মেয়েদের জন্যে অবৈধ মনে করা হত। কিন্তু যদি বাচ্চা মাদী হত তবে তা জবেহ করা হত না। আর যদি জবেহ করা জন্তুর পেট থেকে মৃত বাচ্চা বের হত তবে নারী পুরুষ সকলেই খেতে পারত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যদি তুমি আরবদের মূর্খতা প্রসূত কুসংস্কার সম্পর্কে অবগত হতে ইচ্ছুক হও, তবে সূরা আনআমের ১৩০ নং আয়াতের পরবর্তী আয়াত সমূহ পাঠ কর অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত সমূহ পাঠ কর।[১]

বস্তুতঃ আরবের পৌত্তলিকদের এ সমস্ত কু-প্রথা কত অযৌক্তিক কত অসুন্দর এবং কত অমানবিক তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ পাক প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমত পূর্ণ এবং তিনি সুবিবেচক। তাই যার যে অন্যায় এবং যতখানি অন্যায় সে মোতাবেকই হবে তার শাস্তি। দ্বিতীয়তঃ তিনি মহাজ্ঞানী, পৃথিবীর সবকিছু তাঁর নখদর্পণে। তাই কোন অন্যায়কারী তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, এ বাক্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কু-সংস্কারে অভ্যস্ত পৌত্তলিকদের উদ্দেশ্যে।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ ۚ
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِىٓ أَنشَأَ
جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَ
مِنَ الْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ
لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ الشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

১। তফসীরে ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৮

তরজমা

(১৪০) যারা বোকামীর কারণে অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত রিয্ককে আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করেছে, তারা নিশ্চয় সর্বস্বান্ত হয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সু-পথ প্রাপ্ত হয়নি।

(১৪১) আর তিনি সৃষ্টি করেছেন লতা ও বৃক্ষ উদ্যান সমূহ এবং খেজুর বৃক্ষ, রকমারী স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শস্য, জাইতুন এবং আংগুর পরস্পর সদৃশ এবং ভিন্নও, যখন তা ফলে তখন তোমরা আহার করবে। আর ফসল কাটার দিনে তার হক্ব আদায় করবে এবং অপচয় করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

(১৪২) আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন কিছু ভারবাহী চতুঃষ্পদ জন্তু এবং কিছু ক্ষুদ্রাকার পশু। আল্লাহ পাক যা কিছু রিয্ক হিসেবে দান করেছেন তা আহার কর। আর তোমরা শয়তানের অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের সন্তান-সন্ততি হত্যা করার জঘন্য অপরাধের কথা এবং তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল রিয্ককে যে হারাম গণ্য করত তার উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে উভয় বিষয়কে একত্রে বর্ণনা করার পর এর ভয়াবহ পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

নিশ্চয় যারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে আর এ কাজটি তারা তাদের বোকামীর কারণে এবং তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃই করেছে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছেন তাকে নিজের ধারণা অনুযায়ী নিষিদ্ধ মনে করেছে। আর এ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে মিথ্যারোপ করেছে আল্লাহর প্রতি, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথ পায়নি। ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের সম্পর্কে সাতটি কথা ঘোষণা করেছেনঃ

১. যারা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে,

২. তারা বোকামী করেছে, নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে,

৩. তাদের মধ্যে রয়েছে অজ্ঞতা ও মূর্খতা,

৪. তারা আল্লাহ পাকের দেয়া রিয্ককে নিষিদ্ধ মনে করেছে,

৫. তারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে,

৬. তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে,

৭. তারা কোনদিন সুপথ পায়নি।

১. ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এজন্যে যে, সন্তান-সন্ততি বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু যে ব্যক্তি এ নেয়ামতকে বিনষ্ট করে তথা সন্তানকে হত্যা করে তার চেয়ে বড় বদনসীব এবং হতভাগা আর কে হতে পারে! দুনিয়াতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপমানিত হয়। কেননা, লোকেরা বলে অমুক ব্যক্তি তার সন্তানকে খাবার দিতে পারবেনা এ ভয়ে

হত্যা করেছে। এভাবে সে নিষ্ঠুর ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র লাঞ্ছিত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে তার জন্যে কঠোর কঠিন শাস্তি। কেননা, সন্তানকে হত্যা করা মহা পাপ, আর মহা পাপের জন্যে মহা শাস্তি অবধারিত।

২. বোকামী, যারা অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করে তারা চরম বোকামী করে কেননা, অভাবগ্রস্ত হওয়া যদিও ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক কিন্তু সন্তানকে হত্যা করা তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টদায়ক। যে ব্যক্তি কোন ক্ষুদ্র ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে বড় ক্ষতি করে বসে, নিঃসন্দেহে সে বোকা।

(৩) بغير علم অর্থাৎ পৌত্তলিকরা শুধু বোকা ছিলনা, বরং মূর্খও ছিল আর তাদের বোকামী ছিল মূর্খতা প্রসূত। আর মূর্খতার চেয়ে নিন্দনীয় কাজ আর কিছুই নেই।

(৪) যে রিয্ক আল্লাহ পাক হালাল করেছেন তাকে হারাম মনে করার ন্যায় বোকামী আর কিছুই হতে পারেনা কেননা, সে উত্তম ও উপকারী বস্তুর উপকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

(৫) আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত অন্যায় এবং মহাপাপ আর কি হতে পারে!

(৬) পথভ্রষ্ট হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বদনসিবী।

(৭) তারা সৎপথ পায়নি অর্থাৎ কোন কোন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়, দিশেহারা হয়, পরে সৎ পথের সন্ধানও পায় এবং সঠিক পথের অনুসারীও হয়। কিন্তু হতভাগা পৌত্তলিকরা এ সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। বস্তুতঃ যারা নিজেদের সন্তান হত্যা করে, তারা দুনিয়াতে নিষ্ঠুর পাষন্ড বলে কুখ্যাতি অর্জন করে, দুনিয়া আখেরাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আল্লামা বগভী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে রবী এবং মুজের সহ কয়েকটি গোত্রের লোকদের সম্পর্কে যারা অভাবের ভয়ে কন্যা-সন্তানদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করত।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এবনুল মুনজেরের উদ্ধৃতি দিয়েও এ বিবরণ পেশ করেছেন।[২]

وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ.

আল্লাহ পাক যে সব জন্তু তাদের জন্যে হালাল করেছেন পৌত্তলিকরা নিজেরাই তাদের জন্যে তা হারাম করে নিয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বলেছে যে, আল্লাহ পাক এগুলো হারাম করেছেন। এটি ছিল তাদের ধৃষ্টতা। পবিত্র কোরআন একথাটিকে افتراء বলেছে। মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত বড় অন্যায় এবং কবীরা গুনাহ আর সে মিথ্যা যদি স্বয়ং মহান আল্লাহ পাক সম্পর্কে বলা হয় তবে তা কত বড় পাপ তা সহজেই অনুমেয়। দূরাত্মা কাফেররা তাই করত।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২০৯-১০
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৭

قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ.

এ বাক্যাংশে দু'টি কথা এরশাদ হয়েছেঃ

(১) তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়েছে। (২) আর পথভ্রষ্টতায় এত দূরে সরে গেছে যে, কোন দিন সৎ পথের সন্ধান পায়নি। পথভ্রষ্ট হওয়ার পর সৎ পথ পাওয়া বিচিত্র নয়, অনেকের ভাগ্যেই তা জোটে। কিন্তু এরা এত হতভাগা যে, কোনদিন হেদায়েত তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ.

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পবিত্র কোরআনের মূল্য বক্তব্য হলো তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত, আখেরাত প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ঈমানের আহ্বান।

পূর্ববর্তী আয়াতে সমূহে আরবের মুশরেকদের মূর্খতা প্রসূত অন্যায় আচরণের বিবরণ ছিল এবং এ অন্যায়ের পরিণাম কত ভয়াবহ সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মূল উদ্দেশ্যের দিকে পূনঃ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে এবং তৌহিদের বয়ান শুরু হয়েছে।[১]

আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব মহিমা

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ.

তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগান সমূহ তন্মধ্যে যা মাচায় চড়ানো হয় লতানো গাছ যেমন আঙ্গুর, আর যা মাচায় চড়ানো হয়না, যেমন তরমুজ, খরবুজা প্রভৃতি রকমারী ফল-ফলারী। এসব ফল দেখতে হয়তো একই প্রকার কিন্তু স্বাদে এবং গন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিঃসন্দেহে এসবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব মহিমা। তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন এবং মানব জাতির প্রতি অনন্ত অসীম করুণা। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বের সব কিছু, পৃথিবীতে যত জীব-জন্তু রয়েছে, যত বাগ-বাগিচা রয়েছে, যত সবুজের মেলা প্রত্যক্ষ করছি সবইতো আল্লাহর সৃষ্টি। কেউ এতে তাঁর শরীক নেই। তিনি এসব কিছু মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২১০

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا.

(তিনিই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের উপকারার্থে) খেজুর, আঙ্গুর জয়তুন, আনার প্রভৃতি ফল মানুষেরই সুস্বাদ ভোগ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! এরপরও কেন তোমরা মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সাথে শরীক কর। তিনি এক, অদ্বিতীয় আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি, সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে কিন্তু তাঁর লয় নেই, তিনিই ছিলেন, আছেন, সর্বদা থাকবেন। অতএব, পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত কর্তব্য হল মহান স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হওয়া। তাঁর অনন্ত অসীম দানের জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে যত্নবান হওয়া।

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ.

গাছে যখন ফল ধরে তখন তোমরা তা খাও এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় কর। এবং ফসলে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে দায়িত্ব রয়েছে তা আদায় করার পূর্বেও বাগানের মালিক তা ভোগ করতে পারে তবে আদেশ হলো শুধু নিজে একা ভোগ করোনা, বরং গরীব মিসকীনদেরকেও তাদের হক্ব দিও।

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

আর ফসল কাটার বা ফল তোলার সময় তোমরা তার হক্ব আদায় কর তথা গরীব মিসকীনকে দান কর। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"হক্ব" শব্দের ব্যাখ্যা

(তোমাদের অর্থ সম্পদে হক্ব রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের।)

আয়াতাংশে ব্যবহৃত "হক্ব" শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), তাউস (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাবের এবনে যায়েদ (রহঃ) এবং সাঈদ এবনে মোসাইয়্যাব (রহঃ)-এর মতে এ হক্ব হল যাকাত, যা আদায় করা ফরজ। আর এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, অর্থ সম্পদের ব্যাপারে যাকাত ব্যতীত অন্য কিছু ফরজ নয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত তালহা এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হল এবং ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমজান মাসের রোজা এবং যাকাতের উল্লেখ করেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করল এছাড়াও কি আমার কর্তব্য আছে? তিনি এরশাদ করেনঃ না, তবে তুমি যদি খুশি হয়ে কোন নফল এবাদত কর তবে ভিন্ন কথা।

এর দ্বারা হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর কথার দলিল পাওয়া যায়। তিনি আনারের ন্যায় ফলের উপর যাকাত অবশ্য কর্তব্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), আতা (রহঃ), মুজাহেদ (রহঃ)-এর মতে আলোচ্য আয়াতে যে "হক্বের" কথা বলা হয়েছে তা হল যাকাত ব্যতীত অন্য হক্ব, যা আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যাকাত ফরজ হয়েছে মদীনা শরীফে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতে ব্যবহৃত "হক্ব" শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ফসল কাটার সময় বা ফল তোলার সময় যা পড়ে থাকে।

মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, খেজুর কাটার সময় যা পড়ে থাকত তখন যে উপস্থিত থাকত সে খেয়ে ফেলত।

এজিদ এবনে আছম বর্ণনা করেন যে, মদীনাবাসীগণ যখন খেজুর কাটতেন তখন তাঁরা কিছু অংশ খেজুর মসজিদে নববীতে ঝুলন্ত অবস্থায় এনে রেখে দিতেন। দারিদ্র-প্রপীড়িত লোকেরা তা খেয়ে নিত। একথার সমর্থন পাওয়া যায় হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) থেকে। তিনি বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অর্থ সম্পদে যাকাত ব্যতীত গরিব মিছকিনের কিছু হক্ব রয়েছে, এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

(তিরমিজি, এবনে মাজা, দারমী)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের "হক্ব" শব্দটির অর্থ অবশ্য কর্তব্যের হক্বও হতে পারে আর নফল হক্বও হতে পারে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রহঃ) বলেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে এ "হক্ব" আদায়ের তাগিদ ছিল। কিন্তু যখন যাকাত ওয়াজিব হল তখন এ হুকুম বাতিল হয়েছে।[১]

وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

অর্থাৎ- তোমরা অপচয় করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ কর এবং এ ফলের হক্ব আদায় কর। তবে কোন অবস্থাতেই অপচয় করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। "এছরাফ" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল যে কোন কাজে সীমালঙ্ঘন করা। অতএব, অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করাকেও এছরাফ বলা হয়। মধ্যম পন্থার বিপরীত অর্থেও এছরাফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "এছরাফ" শব্দটি সমস্ত ধন-সম্পদ বিতরণ করে দেয়ার অর্থে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৪-২৫

ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম বয়যাবী (রহঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতটির অর্থ তাই, যা অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ.

"হাতকে সম্পূর্ণ খুলে দিওনা"।

তথা তোমার যথা সর্বস্ব আল্লাহর রাহে বিতরণ করে অবশেষে আক্ষেপ করোনা। আলোচ্য আয়াতে "অপচয় করোনা" কথাটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতের শানে নুযুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও কথাটি প্রমাণিত হয়। কালবী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত সাবেত এবনে কায়েস এবনে সাম্মাছ (রাঃ) পাঁচশত গাছের খেজুর তুলে একই দিনে সমস্ত খেজুর গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং তার পরিবারবর্গের জন্য তিনি কিছুই রাখেননি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এবনে জরীরও এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগবী (রহঃ) সুদ্দি (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, (وَلَا تُسْرِفُوْا) এ বাক্যটির অর্থ হল নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে ফকির হয়ে বসে থেকোনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, সমস্ত ধন-সম্পদ দান করা তখন অবৈধ এবাং এছরাফ বলে গণ্য হবে যখন পরিবারবর্গ তথা আপনজনদের হক্ব বিনষ্ট হয় এবং হক্বদারদের হক্ব না দেয়া হয়। যদি পরিবারবর্গ ও আপনজনদের হক্ব দেয়া হয় এবং কোন হক্বদারের হক্ব বাকি না থাকে এমন অবস্থায় অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করা হয় তবে তা এছরাফ হবে না; বরং তা হবে উত্তম কাজ। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি আমার নিকট ওহোদ (পাহাড়)-এর সমান স্বর্ণ থাকে তবে এতে আমি সন্তুষ্ট থাকব যে, তিন রাতের বেশী আমার নিকট সেই স্বর্ণের কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা, শুধু এ পরিমাণ যা ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে রেখে দেই।

একবার হযরত আবুজর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) বললেন, আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) কিছু অর্থ সম্পদ রেখে গেছে। হে কা'ব! তুমি বল এ সম্পর্কে তোমার কি মত? হযরত কা'ব (রাঃ) বললেন, যদি এতে আল্লাহ পাকের হক্ব থাকে তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই (অর্থাৎ তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করা হবে)। একথা শ্রবণ মাত্রই হযরত আবুজর (রাঃ) কা'বকে (রাঃ) তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন এবং বলেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, "যদি আমার নিকট এ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ হয় আর তা আমি আল্লাহর রাহে ব্যয় করি আর আল্লাহ পাক তা কবুল করেন তবে আমার নিকট একথা পছন্দনীয় নয় যে, আমি সামান্য স্বর্ণও রেখে যাই। ওসমান আমি তোমাকে আল্লাহ শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করি তুমি এই হাদীস হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছ? হযরত আবুজর (রাঃ) এ প্রশ্ন তিনবার করেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন, হ্যাঁ, অর্থাৎ এই হাদীস আমি শুনেছি। (আহমদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে দেখেন খেজুরের স্তূপ পড়ে আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, বেলালঃ এগুলো কি? বেলাল (রাঃ) আরজ করলেন, আমি আগামী দিনের জন্যে রেখে দিয়েছি। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমার ভয় হয়না এ মওজুদ বস্তুর ভাঁপ দোযখের মধ্যে তোমাকে অনুভব করতে হবে বেলাল! ব্যয় কর আরশের মালিকের তরফ থেকে কম হবে এমন আশঙ্কা করোনা। (বায়হাকী)

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ সদকা সবচেয়ে উত্তম? তিনি এরশাদ করলেনঃ অভাবগ্রস্ত মানুষের মেহনতের কামাই থেকে সাধ্যমত খয়রাত করা হল সর্বোত্তম সদকা। আর দান করা শুরু কর নিজের পরিবারবর্গ থেকে। (আবু দাউদ)

হযরত সাঈদ এবনে মোসাইয়্যাব (রহঃ)-এর মতে এছরাফের (وَلَا تُسْرِفُوْا) অর্থ হল সদকা থেকে বিরত হয়োনা অর্থাৎ সদকা না দেয়ার ব্যাপারে এতটা বাড়াবাড়ি করোনা যে, ওয়াজিব সদকা থেকেও বিরত হও।

মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, এছরাফের (وَلَا تُسْرِفُوْا) অর্থ হল ফসল এবং চতুঃষ্পদ জন্তুর মধ্যে মূর্তিগুলোকে শরীক করোনা।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল পাপ কার্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করোনা।

মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে এছরাফ এর অর্থ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত হক্ব আদায়ে অবহেলা না করা। যদি কারো নিকট মক্কা শরীফে অবস্থিত আবু কোবায়েস নামক পাহাড়ের সমান স্বর্ণ থাকে আর সে আল্লাহ পাকের আনুগত্যে তা ব্যয় করে দেয় তবু এছরাফ হবে না। কিন্তু আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজে এক দেরহাম বা এক সেরও ব্যয় করে তবে তা এছরাফ হবে।

ইয়াছ এবনে মাআবিয়া বলেছেন, আল্লাহ পাকের হুকুমে সীমালঙ্ঘন করাই হল এছরাফ।

এবনে ওয়াহাব আবু যায়েদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটি (وَلَا تُسْرِفُوْا) দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদেরকে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক কর্মকর্তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা নিজেদের হক্বের চেয়ে বেশী গ্রহণ করোনা। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্ম তাই হবে যা একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ

اِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ.

এর অর্থ হল মানুষের উত্তম মাল যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে সর্বপ্রথম তৌহিদের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্যে পৃথিবীর সব কিছু। শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ জমীন, ফল-ফুলের বাগান, রকমারী ফল আকারে আকৃতিতে এক প্রকার কিন্তু স্বাদে সুগন্ধে ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও মাচায় চড়ানো হয় লতানো গাছ যেমন আঙ্গুর, কোথাও আল্লাহ পাকের অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ জমীনের উপরেই উৎপন্ন হয় নানা সুস্বাদু ফল যথা তরমুজ এবং খরবুজা। এছাড়া রয়েছে আম, আনারস, খেজুর, জয়তুন, আনার আরও কত কিছু, এসব মানুষেরই জন্যে। অতএব মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর শোকর গুজার হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের কর্তব্য হল ফসল কাটার সময় বা ফল তোলার সময় ফকীর মিছকিন, দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষকে দান করা।

তৃতীয়তঃ দানের অপচয় না করা। দানের সদ্ব্যবহার করা। আর তা মহান দাতার বিধি-নিষেধ মোতাবেক দানের ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ.

আর আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তু, এর মধ্যে কোনটি মানুষের যানবাহনের কাজে লাগে আর কোন কোন জীব-জন্তু মাটি ছুঁয়ে চলে। উট, গাধা এগুলো ভারবাহী তথা মানুষের বোঝা বহন করে। ছাগল, গরু থেকে মানুষ দুধ পায় এবং খাবার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ.

এসব জন্তু আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রিয্ক হিসেবে দান করেছেন। এগুলো তোমরা খাও এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় কর।

পৌত্তলিকরা কোন কোন জন্তুর পূজা করত, কোন কোন জন্তুকে দেব-দেবীর পূজার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করত। শয়তান তাদেরকে এভাবে প্রতারিত করেছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ এ জীব-জন্তু তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের নেয়ামত, তোমাদের ভোগ্য বস্তু, এগুলো পূজনীয় হতে পারে না। অতএব

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। শয়তানই হালালকে হারাম করার প্ররোচনা দেয়। একথা মনে রেখ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু, সে তোমাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সর্বস্বান্ত করতে চায়। যে শয়তানের অনুসরণ করবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ
قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۴۳﴾
وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

তরজমা

(১৪৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী, ভেড়ার দুটি আর ছাগলের দুটি। (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন নর দুটি কি তিনি হারাম করেছেন অথবা মাদী দুটি? কিংবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে দলিল প্রমাণ সহ আমাকে অবহিত কর।

(১৪৪) তিনি আরও সৃষ্টি করেছেন উটের দুটি ও গরুর দুটি। (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন নর দুটি কি তিনি হারাম করেছেন কিংবা মাদী দুটি? অথবা মাদী দুটির গর্ভে যা আছে তা? আল্লাহ পাক যখন তোমাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে যে অজ্ঞানতা বশতঃ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক জালেমদেরকে হেদায়েত করেন না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আরবের পৌত্তলিকরা নিজেদের তরফ থেকেই বলতো এ জন্তুগুলো হারাম বা অবৈধ। আর তারা কোন কোন জন্তু সম্পর্কে বলতো, এ জন্তুগুলোর পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে বৈধ কিন্তু মেয়েদের জন্যে অবৈধ। আর কোন কোন চতুঃষ্পদ

জন্তু সম্পর্কে তারা বলতো যে, এগুলো নারী পুরুষ সকলের জন্যেই অবৈধ। যখন এসব বিষয়ে ইসলামী বিধান জারি হয় তখন আবু আহওয়াছ মালেক এবনে আওফ জাসমী নামক এক ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হল এবং আরজ করলঃ আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনি আমাদের পূর্ব পুরুষদের কোন কোন কাজকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা কোন কোন চতুঃস্পদ জন্তুকে কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ব্যতীত হারাম বলে বেড়াচ্ছে। অথচ আল্লাহ পাক আট প্রকার জন্তু মানুষের খাবার হিসেবে এবং অন্যান্য উপকার লাভের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যে এগুলোকে হারাম বলছো এ হারামের ব্যাপারটি নর জন্তু থেকে এসেছে না মাদী জন্তু থেকে এসেছে? মালেক এবনে আওফ একথা শ্রবণ করে বিস্মিত হল এবং এর কোন জবাব দিতে পারল না। সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর হল। যদি সে বলতো নর জন্তু থেকে এ হারামের কথা উত্থিত হয়েছে তবে সকল নর জন্তুকেই হারাম বলতে হয়।

আর যদি বলে মাদী জন্তু থেকেই হারামের সূচনা হয়েছে তবে সকল মাদী জন্তুকেই হারাম বলতে হয়। আর যদি পেটের বাচ্চা পয়দা হওয়ার কারণে হারাম হয় তবে নর এবং মাদী সকল জন্তুকেই হারাম বলতে হয়। আর একথা বলার কোন কারণ নেই যে, অমুক জন্তু পুরুষের জন্যে হালাল আর মেয়েদের জন্যে হারাম। একথা বলার কোন যুক্তিও নাই। এসব কথা শ্রবণ করে মালেক এবনে আওফ সম্পূর্ণ লা-জবাব হয়ে যায়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালেককে বললেন, তুমি কথা বলছনা কেন? সে তখন বললো আপনি বলতে থাকুন, আমি আপনার কথা শ্রবণ করছি।[১]

মূলতঃ মুশরেকদের মধ্যে এ পর্যায়ে যে কু-প্রথা এবং কু-সংস্কার প্রচলিত ছিল তার প্রতিবাদেই নাযিল হয়েছে আলোচ্য আয়াত। চতুঃস্পদ জন্তু নর হোক কিংবা মাদী এবং তার গর্ভে যে বাচ্চা থাকে সবইতো আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। অতএব, এর কোন্‌টি হালাল কোন্‌টি হারাম একথা বলার অধিকারও একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কোন জন্তুকে হালাল বল বা কোন জন্তুকে হারাম এবং কোন জন্তু পুরুষের জন্যে হালাল নারীদের জন্যে হারাম– এসব কথার দলিল প্রমাণ তোমাদের নিকট আছে কি? যদি থাকে তবে আমাদের নিকট পেশ কর। আর যদি না থাকে আর অবশ্যই নেই তবে নিজের তরফ থেকে কোন বিধান দেয়ার অধিকারই তোমাদের নেই। আর এসব বিধান নিজেদের তরফ থেকে রচনা করা আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বলে প্রচার করা মিথ্যা অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, এর ভয়াবহ পরিণামের জন্যে তোমরা প্রস্তুত থাক। ইমাম কুরতবী (রহঃ) লিখেছেন যে, এতদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম বাতিল পন্থীদের সঙ্গে কোন এল্‌মী বিষয়ে মুনাজেরা করার তথা বিতর্ক করার বৈধতা প্রমাণ করেছেন। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পৌত্তলিকদের সাথে বিতর্ক করার এবং তাদের বক্তব্যের বাতুলতা প্রমাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বীয় বক্তব্যের দলিল প্রমাণ পেশ করার আহ্বান জানাবার আদেশ দিয়েছেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৮

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের অবস্থা এই ছিল যে, চতুঃষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে তারা নিজেরাই ভাগ করে নিয়েছিল। কোনটিকে তারা হালাল বলতো কোনটিকে হারাম। এসব কুসংস্কার পরিহার করার আহ্বান রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোন কিছুর হালাল বা হারাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই। এ সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ব্যাপার। মানুষ তাঁর মর্জি সম্পর্কে অবগত হতে পারে হয় সরাসরি অথবা নবীর মাধ্যমে। কিন্তু যে সব জিনিসকে পৌত্তলিকরা হারাম বলে মনে করত সেগুলোর সম্পর্কে তারা কোন নবীর মাধ্যমেও সিদ্ধান্ত পায়নি এবং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সরাসরি কোন কিছু জানার প্রশ্নই ওঠেনা। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا.

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাক যখন তোমাদেরকে এ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে?

একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের উপস্থিত থাকার প্রশ্নই আসেনা। বস্তুতঃ তারা তাদের এসব কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا.

অর্থাৎ- সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যেন মানুষকে সে পথভ্রষ্ট করে। আর তা এজন্যে করে যে তারা কিছুই জানেনা। অজ্ঞতা এবং মূর্খতাবশতঃ তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়। বস্তুতঃ তারা হল পাপিষ্ঠ, তারা সবচেয়ে বড় জালেম। আল্লাহ্ পাক জালেমদেরকে হেদায়েত করেন না।

জালেম হেদায়েতের পথ থেকে চির বঞ্চিত

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে كُنْتُمْ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসীকে। আর هٰذَا দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে হালাল বস্তুকে হারাম মনে করার দিকে। আর مَنِ افْتَرٰى দ্বারা উদ্দেশ্যে করা হয়েছে আমর এবনে লুহাই ও তার অনুসারীদেরকে।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হল, হে মক্কাবাসী! যখন আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে উপরোল্লিখিত বস্তু সমূহের হারাম হওয়ার কথা বলেছিলেন তখন কি তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপস্থিত ছিলে? তোমরাতো আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস কর না, তাঁর নবীর প্রতিও তোমাদের ঈমান নেই, আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থের প্রতিও তোমাদের ঈমান নেই। এমন অবস্থায় এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ স্বচক্ষে দেখা বা শ্রবণ করা, এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এজন্যে প্রয়োজন সে মুহূর্তে

দরবারে এলাহীতে উপস্থিত থাকা অথচ তোমরা উপস্থিত ছিলেনা। তাহলে কিভাবে তোমরা এ সম্পর্কে এলম হাসিল করলে? যখন তোমাদের এলম হাসিল করা সম্ভব হয়নি তখন একথা প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের কথা মূর্খতা প্রসূত। এজন্যে তোমাদের শাস্তি অবধারিত।[১]

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ পাক জালেমদেরকে সত্য পথের দিকে হেদায়েত করেন না বা সওয়াবের পথ প্রদর্শন করেন না। কেননা, তারা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। অন্যায় আচরণের কারণে যাদের শাস্তি অবধারিত তাদের হেদায়েতের আশা করা যায় না।[২]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অজ্ঞানতা বশতঃ যারা হালালকে হারাম বলেছে তথা মিথ্যা রটনা করেছে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে শ্রেষ্ঠ জালেম বলা হয়েছে। তাহলে যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহ পাকের বিধানকে বুঝে শুনে পরিবর্তনের অপচেষ্টা করে এবং হালালকে হারাম বলে তাদের শাস্তি কত কঠিন এবং কঠোর হবে তা সহজেই অনুমেয়।[৩]

قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ إِلَّآ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهٗ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا
إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ أَوِ الْحَوَايَآ أَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪২
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৩
৩। তাফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৬

তরজমা

(১৪৫) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে তাতে মানুষ যা আহার করে আমি তার মধ্যে কিছুই নিষিদ্ধ পাইনা। শুধু যা নিজে মরে গেছে, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস কেননা, তা অপবিত্র অথবা অবৈধ ভাবে জবাই করা জন্তু, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে। তবে যে ক্ষুধা কাতর হয় আর অবাধ্য না হয় এবং সীমালঙ্ঘন না করে নিরুপায় অবস্থায় তা গ্রহণ করে এক্ষেত্রে আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১৪৬) আর আমি ইহুদীদের জন্যে হারাম করেছিলাম প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী। আর গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে তাদের পিঠের উপরে অথবা অন্ত্রে জড়িত কিংবা তাদের হাড় সংলগ্ন চর্বি হারাম নয়। তাদের অবাধ্যতার কারণেই তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম আর নিশ্চয় আমি সত্যবাদী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব হালাল বস্তুর উল্লেখ রয়েছে যেগুলো জাহেলী যুগে পৌত্তলিকরা হারাম মনে করতো। আর এ আয়াতে সেই হারাম বস্তু সমূহের উল্লেখ রয়েছে যেগুলোকে পৌত্তলিকরা হালাল মনে করতো।[১]

ইমাম রাজী (রহ.) এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ যেহেতু ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হালাল-হারামের সিদ্ধান্ত শুধু ওহীর মাধ্যমেই হয়, আল্লাহ পাকই ঘোষণা করেন কোন্ বস্তু হালাল আর কোন্ বস্তু হারাম। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে, মানুষের আহার্যের মধ্যে আমি চারটি বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নিষিদ্ধ পাইনা।

আর এ চারটি বস্তু হল–

১. যে জন্তু নিজে মরে গেছে,

২. প্রবাহিত রক্ত,

৩. শুকরের মাংস,

৪. অবৈধ ভাবে জবাই করা জন্তু যার উপর আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর নাম উচ্চারিত হয়েছে।

অতএব, এ চারটি বস্তু ব্যতীত আর কিছু ওহীর মাধমে হারাম ঘোষিত হয়নি আর ওহী আসে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট।[২]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৫৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২১৯

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ যেহেতু আল্লাহ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আপনি এ কাফেরদের জানিয়ে দিন যে, ওহী আমার নিকট এসেছে তাতে চারটি জিনিসকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে)। আমর এবনে দীনার হযরত যাবেরের (রাঃ) নিকট প্রশ্ন করেছিলেন, লোকে বলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিনে গৃহপালিত গাধার গোশ্তকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বললেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে হাকাম এবনে ওমর এ বর্ণনাই করেছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথা অস্বীকার করেন এবং আলোচ্য আয়াত قُلْ لَّآ أَجِدُ পাঠ করেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, বর্বরতার যুগে লোকেরা কোন বস্তু আহার করতো আর কোন বস্তু পরিহার করতো। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন, আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং হালাল-হারামের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। যা আল্লাহর তরফ থেকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে তা হালাল, আর যা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হারাম, আর যে ব্যাপারে নীরবতা পালন করা হয়েছে তা মাফ, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত قُلْ لَّآ أَجِدُ তেলাওয়াত করেন।

একজন সাহাবীর বকরী মারা গেল। বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আলোচিত হল, তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি তার চামড়াটা বের করলে না কেন? ঐ সাহাবী আরজ করলেন, মৃত বকরীর চামড়া নেয়া কি বৈধ? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, মৃত বকরীর গোশ্ত খাওয়া হারাম কিন্তু তার চামড়া দ্বারা তুমি উপকৃত হতে পার। তাই তিনি লোক পাঠিয়ে ঐ মৃত বকরীর চামড়া বের করলেন এবং তা দ্বারা পানির মশক তৈরি করলেন যা অনেক দিন তাঁর কাজে লাগে।[১]

قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ.

অর্থাৎ-আমার নিকট ওহী এসেছে তাতে চারটি বিষয়কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত জন্তু, বহমান রক্ত, শুকরের মাংস আর সে সব জন্তু যা হালাল কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করার কারণে তা হারাম হয়েছে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ, এতে সকল হারাম বস্তুর ফিরিস্তি সন্নিবেশিত হয়নি; বরং তখন পর্যন্ত যা হারাম বলে ঘোষণা করা হয় সেগুলোর উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে। আর অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ যেমন মদ্যপান প্রভৃতির কথা সূরা মায়েদায় স্থান পেয়েছে যা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন যে, এর মূল উদ্দেশ্য হল একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া যে, হালাল হারাম সম্পর্কে ঘোষণা দেয়ার একমাত্র অধিকার শুধু আল্লাহ পাকের, আর কারো নয়। আর আল্লাহ পাক এ পর্যন্ত চারটি জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।

১। তাফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৩

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً.

এই مَيْتَةً অর্থ সেই মৃত জন্তু যার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا.

অর্থাৎ বহমান রক্ত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সেই রক্তকে বোঝানো হয়েছে যা কোন জন্তুকে জবেহ করার সময় তার ঘাড়ের রগ থেকে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে সেই রক্ত অন্তর্ভুক্ত নয় যা ঐ জন্তুর গোশ্তের সাথে মিশে থাকে। কেননা তা প্রবাহিত হয় না।

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

অর্থাৎ- শুকরের মাংস, নিশ্চয় তা অপবিত্র, নাপাক। এতে একথা প্রমাণিত হয় শুকর সম্পূর্ণ নাপাক তাই তার কোন কোন অংশ বিক্রি করা অথবা তার দ্বারা কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করা বৈধ নয়।

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

অর্থাৎ সেই জানোয়ার যা গুনাহর কারণ হয়েছে কেননা, জবেহকারী তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর উদ্দেশ্যে জবেহ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে পৌত্তলিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তোমরা যে সব পশুকে হারাম বা নিষিদ্ধ খাদ্য মনে কর সেগুলো আসলে হারাম নয়, বরং হালাল। আর যা হারাম তা হল এগুলো যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ.

তবে যে কেউ জঠর-জ্বালায় কাতর হয়ে যায়, প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় না থাকে এবং সে আল্লাহর অবাধ্য না হয় ও সীমালঙ্ঘন না করে প্রাণ রক্ষায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ না করে, এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে যদি হারাম বস্তু আহার করে তবে তাকে পাকড়াও করা হবে না। কেননা এমন ব্যক্তি ছিল অসহায়, নিরুপায়।

فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।[১]

আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ুতী (রহঃ) তাঁর রচিত 'এতকানে' লিখেছেন, ইমাম শা'বী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ কাফেররা যখন আল্লাহ পাকের হারাম ঘোষিত বস্তুকে হালাল বলেছে এবং আল্লাহ পাক যে বস্তুকে হালাল বলেছেন তারা সেই বস্তুকে হারাম মনে করেছে তার বিরুদ্ধে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণ

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তফসীরে নূরুল কোরআনের দ্বিতীয় খন্ডে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-১১১-১৫

বলেছেন, যদি কোন লোককে বলা হয় আজকে তুমি মিষ্টি খেওনা আর সে ব্যক্তি প্রতি উত্তরে বলে, আজকে মিষ্টি ব্যতীত আর কিছুই খাব না। এতে ঐ ব্যক্তির জেদ, হঠকারিতা এবং বিদ্রোহ প্রকাশ পায় ঠিক এমনিভাবে কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে যে হঠকারিতা এবং জেদের পথ ধরেছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে এ আয়াতে।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ.

"আমি ইহুদীদের জন্যে হারাম করেছিলাম প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী। আর গরু-ছাগল থেকে তাদের চর্বি"।

পূর্ববর্তী আয়াতে হারাম বস্তু সমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু এছাড়াও বিভিন্ন কারণে কখনও সাময়িকভাবে কোন বস্তু হারাম ঘোষণা করা হয়েছে যেমন, অভিশপ্ত ইহুদী জাতির অন্যায় অনাচারের শাস্তি স্বরূপ নখরযুক্ত প্রাণী মাত্রকে তাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। যার আঙ্গুলে ফাক নাই এমন জন্তু যেমন, উষ্ট্র, পক্ষী, হাঁস প্রভৃতি এবং গরু-ছাগলের পৃষ্ঠ দেশে একটি অন্ত্রে এবং হাড়ে চর্বি জড়ানো থাকে তা এবং অস্থি মজ্জার ভেতরে যে চর্বি থাকে তাও তাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

ইহুদীরা একথা বলে বেড়াত যে, এসব বস্তু হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জমানা থেকেই হারাম হয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

আমি ইহুদীদেরকে তাদের বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছি, এ বস্তু সমূহ হারাম ঘোষণা করার মাধ্যমে। কেননা, ইহুদীরা নবীগণকে হত্যা করেছে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে। সুদ গ্রহণ করেছে, মানুষের অর্থ-সম্পদ হজম করেছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে তাদের কিতাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, চির অভিশপ্ত ইহুদী জাতি এত বড় অপরাধী ছিল, তাদের ব্যাপারে কোন বস্তুকে হারাম করলে তাদের কি কিছু যায় আসে? তারা যে জন্ম-অপরাধী।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এর জবাবে লিখেছেনঃ হয়ত আখেরাতের শাস্তি বৃদ্ধি করার নিমিত্তে এসব বস্তু হারাম ঘোষিত হয়েছে।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছরে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ছিলেন, তিনি বলেছিলেনঃ ইহুদীদের উপর আল্লাহর লা'নত, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি মৃত জন্তুর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন, কিন্তু তারা এ চর্বিকে রান্না করে বিক্রয় করেছে। আর তার মূল্য ভোগ করেছে। (বোখারী)

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। এর তাৎপর্য হলো পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, আর নেককারদের জন্যে যে সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে অবশেষে সবই সত্য প্রমাণিত হবে, আর পবিত্র কোরআনে অতীতের যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ
بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ
كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ
قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۗ إِنْ تَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

তরজমা

(১৪৭) (হে রসূল!) যদি তারা আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করে তবে আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত উদার-করুণাময় এবং পাপীষ্ঠদের থেকে তাঁর আযাব রদ হবার নয়।

(১৪৮) অচিরেই মুশরেকরা বলবে, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে আমরা শেরক করতাম না ও আমাদের পূর্ব পুরুষরাও মুশরেক হতো না। আমরা কোন কিছুকে হারামও মনে করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অবশেষে তারা আমার আযাব ভোগ করেছে। (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের নিকট এমন কোন যুক্তি আছে কি? যদি থাকে তবে তা আমার নিকট পেশ কর। তোমরাতো নিছক কল্পনারই অনুসরণ কর। আর শুধু মিথ্যা কথাই বল।

(১৪৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকের প্রমাণই সম্পূর্ণ সাব্যস্ত। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হেদায়েত করতেন।

তফসীরুল কোরআন

(হে রসূল!) এতসব কথা বোঝাবার পরও যদি এই ইহুদীরা বা মুশরেক বে-দ্বীনরা আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করে, আপনার নবুওয়্যত এবং রেসালতে অবিশ্বাস করে এবং বলে

আপনি সত্য নবী হলে আমাদের উপর আযাব কেন আসেনা? এভাবে তাদের অন্যায় আচরণ অব্যাহত রাখে, তাহলে আপনি তাদের জবাবে বলুনঃ আমার প্রতিপালক অত্যন্ত করুণাময়। তাঁর রহমত অনন্ত অসীম, তাঁর উদারতা মহানুভবতা, দয়া মায়া সীমাহীন। তাই তোমরা বেঁচে আছ। তোমাদের প্রতি এখনও আযাব নাযিল হয়নি। তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি; বরং তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু অবকাশের অর্থ এই নয় যে, তোমরা পাপীষ্ঠ নও বা তোমাদের শাস্তি হবে না; বরং তোমাদের শাস্তি অবধারিত। সেই শাস্তি কোনদিন রদ হবে না, শাস্তি আসতে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু তা টলবে না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, (হে রসূল!) যদি এই ইহুদী ও পৌত্তলিকরা আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং আপনাকে অবিশ্বাস করে তবুও তাদেরকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করবেন না, বরং তাদেরকে আমার অনন্ত অসীম রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিন, যাতে করে তাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ উন্মুক্ত থাকে এবং আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার দিকে তাদের মন আকৃষ্ট হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ.

"(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান আর আমার আযাবও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক"।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ.

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণের মধ্যে এ প্রশ্নটি উত্থিত হয়েছে–

এ বাক্যটি দ্বারা কাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? পূর্ববর্তী আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে বলতে হয় যে, এতে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ অবস্থায় অর্থ হবে এই, (হে রসূল!) ইহুদীরা যদি আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং তারা যে অন্যায় আচরণ করতো তা অব্যাহত রাখে তবে তাদেরকে একথা বলুন যে, আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান। এ কারণেই তোমরা জঘন্য অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের শাস্তি বিধান করেন না। এ আয়াতাংশের দ্বারা ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ মত প্রকাশ করেন তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ)। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, উত্তম ব্যাখ্যা হল এই যে, এর দ্বারা ইসলামের সকল দুশমনকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা। তখন অর্থ হবে, (হে রসূল!) যদি এই কাফের মুশরেক ইহুদীরা আপনার বিরোধিতা করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ পাকের রহমত অসীম।[১]

আর এ অসীম রহমতের কারণেই তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হচ্ছে। তফসীরকারগণ লিখেছেন, যেহেতু ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রশ্ন করতো যে, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আমাদের উপর আযাব কেন আসেনা? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যেহেতু আল্লাহ পাকের রহমত অনন্ত অসীম, তাই এখনও তোমাদের প্রতি আযাব আপতিত হয়নি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তোমাদের প্রতি আযাব হবে না; বরং নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৯

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

পাপীষ্ঠ লোকদের উপর থেকে আল্লাহর আযাব টলবে না, তারা কোন দিনও কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর আরো একটি অর্থ হতে পারে এই যে, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত মোমেনদের জন্যে, আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে, কঠিন কঠোর শাস্তি। কাফেরদের এ শাস্তি রদ করা হবে না।

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا.

বাতিল পন্থীদের একটা পন্থা হলো এই যে, যখন তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অন্যায় অপকর্মের পক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয় তখন তারা জেদের বশবর্তী হয়ে বলে আমরা কি করবো, যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হতো যে, আমরা হেদায়েত লাভ করি, তাহলে আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম।

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাদের এ অন্যায় উক্তির জবাব এরশাদ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ পৌত্তলিকরা তখনো একথা বলেনি পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে মুশরেকরা এমন অন্যায় কথা বলবে। এর দ্বারা শুধু পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপিত হচ্ছে তাই নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে ভবিষ্যতে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তার জবাবও আল্লাহ পাক বাতলে দিচ্ছেন। এরশাদ হয়েছেঃ অদূর ভবিষ্যতে আরবের পৌত্তলিকরা বলবে যে, যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হতো তবে আমরাও শেরক করতাম না। আমাদের পূর্ব পুরুষরাও শেরক করতো না এবং আমরা কোন জিনিষকে নিজের তরফ থেকে হারাম করতাম না। কাফেরদের একথার তাৎপর্য হলো এই, যদি আমাদের কার্যক্রম আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় হতো তবে আল্লাহ আমাদেরকে এসব কাজ করতে দিতেন না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক যখন আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বাধা দেননি, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের কার্যক্রম আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়। এর জবাবে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগের কাফেররাও আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং এ ধরণের অযৌক্তিক কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ পাকের শাস্তি তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে। তারা কোপগ্রস্ত হয়েছে। আদ জাতি, সামুদ জাতি, লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়, তার পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাদের নিকট প্রেরিত নবীগণের বিরোধিতা করেছে, অবশেষে আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, তোমরা যে সব বস্তুকে নিজেরাই হারাম মনে কর এবং তোমাদের নিজেদের এ সিদ্ধান্তকে আল্লাহর নির্দেশ বলে প্রচার কর, এর কোন দলিল প্রমাণ তোমাদের কাছে আছে কি? যদি থাকে তবে তা পেশ কর।

আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্ভাব্য জবাব উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হলো, তারা অদূর ভবিষ্যতে একথা বলবে– আল্লাহ পাকের মর্জি হলে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরা কোন দিনও শেরক করতাম না, আর যে সব বস্তুকে আমরা হারাম বলি সেগুলোকে হারামও বলতাম না। আমরা তো আল্লাহর রাজত্বেই বাস করি, আমরা তো সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। আমাদের যাবতীয় আচরণ তাঁর নখদর্পণে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোন দিন আমাদেরকে আমাদের কাজে বাধা দেননি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের যাবতীয় কাজই তাঁর পছন্দনীয়, যদি তা না হতো তবে তিনি অনতিবিলম্বে আমাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারতেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, দুনিয়ার কোন সরকার রাষ্ট্রের কোন দুশমনকে তার অন্যায় কাজের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেয় না, ফাসির কাষ্ঠে ঝোলায় না; বরং তাকে অবকাশ দেয়া হয়। একদিকে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় অন্যদিকে তার আত্মসংশোধনের সুযোগও দেয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে তাকে অন্যায় অনাচারের জন্যে বিপুল সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। যেন তার অপরাধ জন সম্মুখে প্রমাণিত হয়। এতে একথা কোন দিনও প্রতীয়মান হয়না যে, রাষ্ট্রদ্রোহীতা সরকারের অভিপ্রেত এবং পছন্দনীয় কাজ; বরং তাকে অন্যায় করার সুযোগ দিয়ে তার অপরাধের ফিরিস্তি আরো সুদীর্ঘ করা হয়। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর অবাধ্য নাফরমানদেরকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না; বরং প্রথমত আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করা হয়। নবী রসূলগণ মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানান। কোন্ কাজ আল্লাহর পছন্দনীয় আর কোন্ কাজ অপছন্দনীয় সে সম্পর্কেও নবী রসূলগণ মানুষকে অবহিত করেন। এরপর আল্লাহর হুকুম পালন করলে যা সওয়াব পাওয়া যাবে, আর আল্লাহর অবাধ্য ও নাফরমান হলে কি শাস্তি হবে তাও সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়। এমন অবস্থায় যারা নাফরমান তারা নাফরমানী অব্যাহত রাখে আর একথা বলে যে, আমাদের এসব কাজ যদি আল্লাহর অপছন্দনীয় হতো তবে কি তিনি আমাদেরকে এভাবে স্বাধীনতা দিয়ে রাখতেন? বরং আমাদের কাজ তাঁর পছন্দনীয় বলেই আমাদেরকে তিনি এত সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছেন।

বলা-বাহুল্য এমন কথা যে সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এমন কথা বলতে পারে না। তাই মুশরেকদের কথা–

"যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে আমরা শেরক করতাম না" একথা সম্পূর্ণ 'অযৌক্তিক, অসুন্দর, উদ্ভট এবং হাস্যাস্পদ।[১]

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا.

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের নিকট এমন কোন বিদ্যা আছে কি যা আমাদের সম্মুখে পেশ করতে পার"?

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৯০

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত "এলম" শব্দটির অর্থ সেই জ্ঞান যা আল্লাহ পাকের কোন কিতাব থেকে অর্জন করা হয়েছে। অথবা এমন কোন দলিল প্রমাণ যার দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায় যে, আল্লাহ পাক শেরককে পছন্দ করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

এবং যে সব বস্তুকে পৌত্তলিকরা হারাম মনে করে রেখেছিল তা আল্লাহর তরফ থেকে হারাম বলে যদি কোন প্রমাণ তোমাদের নিকট থাকে তবে তা আমাদের নিকট প্রকাশ কর। মূলতঃ তোমরা শুধু কল্পনা এবং অনুমানের অনুসরণ কর। বস্তুতঃ মুশরেকদের এসব আচরণ তাদের উর্বর মস্তিকেরই উৎপাদন। এখানে কোন বাস্তবতা নেই, নেই কোন সত্যতা, আছে নিতান্ত কল্পনা এবং অনুমান মাত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে ظن শব্দটির অর্থ হলো যার কোন দলিল প্রমাণ নেই, কোন ভিত্তিও নেই, আছে শুধু বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণ। অতএব, তোমাদের কথা ভিত্তিহীন, অলীক, অমূলক, অসত্য, অবাস্তব।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন আল্লাহ পাকের দলিলই জোরালো এবং বলিষ্ঠ। তাঁর দলিলের সম্মুখে তোমাদের কোন কথাই ধোপে টেকেনা। যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমাদের সকলকে হেদায়েত করতেন। কিন্তু একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মানুষের স্বভাব, আকৃতি-প্রকৃতি এমনভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন যে, তারা একই পথ ও মতে চলতে পারে না। তাদের মধ্যে বিভিন্নতা বা পার্থক্য অনিবার্য। আর এ কারণেই কেউ সৎ কাজ করে কেউ মন্দ কাজ করে। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত থাকে, আর কেউ আল্লাহর নাফরমানীতে থাকে লিপ্ত। মানুষের মধ্যে কে ভাল এবং কে মন্দ, কে উত্তম আদর্শের অনুসারী আর কে অন্যায় অসুন্দরের পূজারী এ পরীক্ষা করাই মূল লক্ষ্য। তাই সূরা মূলকে এরশাদ হয়েছে–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

(তিনিই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে) যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধ মোতাবেক জীবন-যাপন করে, আর যারা আল্লাহর নাফরমানী করে তারা কি কোন দিন এক সমান হতে পারে? আলো ও আঁধার যেমন এক হতে পারে না। অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান যেমন এক সমান হতে পারে না ঠিক তেমনি ঈমানদার ও কাফেরও এক সমান হতে পারে না।

আল্লাহ পাক মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন, তদুপরি যুগে যুগে আল্লাহ পাক মানুষকে হেদায়েত করার জন্যেই নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। যেমন তাঁর নেককার বন্দাদের জন্যে পুরস্কার রেখেছেন আর যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। অতএব, হে মুশরেকরা! তোমাদের শেরকের শাস্তি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসেনি, এজন্যে তোমরা শেরককে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ মনে করোনি তবে আল্লাহ পাক কেন নবী প্রেরণ করেছেন? কেন অবাধ্য কাফেরদের ব্যাপারে শাস্তির কথা ঘোষণা

করেছেন? আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে হেদায়েত করতে পারতেন। কিন্তু তোমাদের অযোগ্যতা এবং নাফরমানীর কারণেই তিনি এ ইচ্ছা করেননি।

لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا.

আয়াতাংশের অন্য একটি ব্যাখ্যা

"যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হত তবে আমরা শেরক করতাম না"– একথার যে অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা হল এই, কাফেররা একথা বলে তাদের শেরক এবং অন্যান্য অন্যায় আচরণকে আল্লাহর পছন্দনীয় বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। মোফাচ্ছেরীনদের এক বিরাট দল আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। এ আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। "যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হত তবে আমরা শেরক করতাম না"– একথা বলার তাৎপর্য এই যে, মুশরেকরা এর দ্বারা নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করেছে তথা আমরা অত্যন্ত অসহায় এবং নিরুপায় ছিলাম। আল্লাহ পাকের মর্জির বাইরে কিছুই করার কোন ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা তাইতো হয়। তিনি আমাদের দ্বারা যা করিয়েছেন তাই করেছি। আমরা ভাল-মন্দ যা কিছু করেছি তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই করেছি। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা আদৌ শেরক করতাম না।

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাফেরদের এ প্রতারণা মূলক কথার জবাব দিয়েছেনঃ

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا.

অর্থাৎ-কাফেরদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের পূর্ববর্তী যুগের কাফেররাও এমন সব কথা বলতো, অবশেষে যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে শেরক ও কুফরের জন্যে পাকড়াও করলেন এবং তারা কোপগ্রস্ত হল তখন তারা মর্মে মর্মে অনুভব করল যে, তাদের এ দাবী "আমরা বড়ই অসহায়, নিরুপায়, যদি আল্লাহর মর্জি হতো তবে আমরা শেরক করতামনা"- সম্পূর্ণ মিথ্যা, কেননা আল্লাহ পাক এমন সম্প্রদায়কে শাস্তি দেননা যারা জালেম নয়। আল্লাহ পাকের শাস্তি তাদের জন্যেই, যারা পাপীষ্ঠ। আল্লাহ পাক পবিত্র, তিনি এমন নন যে কোন বন্দাকে কোন কাজের জন্যে বাধ্য করবেন। অতঃপর ঐ কাজের জন্যে সেই বন্দাকে শাস্তি দেবেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি তারা নিতান্ত বাধ্য হয়েই শেরক করত তবে আল্লাহর আযাব দেখার পর কেন তওবা করতো? আর এ অঙ্গীকার কেন করতো যে, যদি এবার আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন এবং আযাব থেকে নাজাত দেন তবে ভবিষ্যতে আমরা শেরক করব না। বিগত দিনের কৃতকর্মের জন্যে এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ পরিহার করার জন্যে অঙ্গীকার এমন কাজের ব্যাপারেই হয়ে থাকে যা মানুষের ইচ্ছাধীন হয়। যে কাজের জন্য মানুষ বাধ্য থাকে, সে কাজের ব্যাপারে অঙ্গীকার করার কোন অর্থই হয় না। একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ পাক বন্দাকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। সে এই ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে ভাল বা মন্দ কাজ করতে পারে। আল্লাহ পাক নবী রসূলগণের মাধ্যমে ভাল-

মন্দ, হক্ব ও বাতিল, সত্য-অসত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ পাক বন্দাকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন যদ্বারা সে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং ভালকে গ্রহণ করা আর মন্দকে বর্জন করা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত নিজেকে বাড়ির ছাদ থেকে নিক্ষেপ করে এবং আত্মহত্যা করে তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে অপরাধী। পক্ষান্তরে, যদি কেউ হোঁচট খেয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে ছাদ থেকে পড়ে যায় তবে সে অপরাধী হবে না। কেননা এতে তার ইচ্ছা কার্যকর হয়নি। এ দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা বুদ্ধিমান মাত্রের নিকটই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষের তকদীর অনেক আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন কিন্তু সে সম্পর্কে কারো কোন জ্ঞান নেই। তার এলম একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষকে কাজ করার শক্তি-সামর্থ দান করেছেন এবং ভালো ও মন্দ বুঝবার জন্যে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলকে প্রেরণ করেছেন। তারা মানুষকে কল্যাণের পথ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। ঈমান এবং কুফরের পার্থক্য বুঝিয়েছেন, ঈমানের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং কুফরের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরপরও যদি কোন বন্দা আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনে এবং তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে আর বলে কি করবো আমিতো অসহায়, যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হত তবে আমি অন্যায়কারী হতাম না– তাহলে কোন বুদ্ধিমান লোকই এমনি খোঁড়া যুক্তি গ্রহণ করবে না। কোন কান্ড-জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এমন অন্যায় কথা বলতেও পারেনা এবং গ্রহণও করেনা।

অতএব, "আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমরা শেরক করতাম না"– উক্তি দ্বারা নিজেদের অন্যায় আচরণের বৈধতা প্রমাণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এ বাক্য দ্বারা নিজেদের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করাও অযৌক্তিক, অসুন্দর। মানুষ ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য সবই উপলব্ধি করতে পারে এবং ভাল বা মন্দ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। তার ইচ্ছা শক্তি রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর বন্দেগী করতে পারে, ইচ্ছা করলে তাঁর নাফরমানীও করতে পারে। এ ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ কিভাবে করছে এর উপরই নির্ভর করে মানুষের পরকালীন জীবনের সাফল্য। যদি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর প্রদত্ত বিধান মোতাবেক জীবন-যাপন করে তবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, যদি কোন মানুষ আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করলো না এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধান সমূহ অমান্য করলো তবে তার শাস্তি অবধারিত, আর এটিই ন্যায়বিচার।[১]

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬০-৬২

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ
الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا
فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا
تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ
حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

তরজমা

(১৫০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাক এ সমস্ত বস্তু হারাম করেছেন বলে যারা সাক্ষ্য দান করবে এমন সাক্ষীদেরকে উপস্থিত কর, যদি তারা এ সাক্ষ্য দেয় তবুও (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বিশ্বাস করবেন না। যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা এবং যারা অন্যান্যদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে (হে রসূল!) আপনি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না।

(১৫১) (হে রসূল!) বলুন আস, তোমাদের প্রতিপালক যা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে বলে দেই, তোমরা কোন কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না; পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমাদেরকে এবং তাদেরকে আমি রিয্ক দান করে থাকি। গোপন হোক বা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না, আল্লাহ্ পাক যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করোনা। তোমরা যেন বুঝতে পার, এজন্যেই আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এ নির্দেশ দান করলেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে শেরকের পক্ষে কাফেররা যে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করতো, তার জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং শেরকের পক্ষে যে কোন যুক্তি নেই তা প্রমাণিত হয়েছে। এ

আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি শেরকের পক্ষে তোমাদের নিকট কোন পয়গম্বরের শিক্ষা বা কোন আসমানী কিতাবের কোন দলিল প্রমাণ থাকে তবে তা উপস্থাপন কর। আর তোমাদের নিকট এমন কোন সাক্ষী আছে কি? যে একথা বলতে পারে যে, তার সম্মুখেই আল্লাহ পাক সে সব বস্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন যেগুলোকে তোমরা নিজেদের তরফ থেকে হারাম বলেছ। একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, এমন সাক্ষী পেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কোন দূরাত্মা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও প্রস্তুত হয় তবে (হে রসূল!) আপনি তাদের মিথ্যা কথার প্রতি কর্ণপাত করবেন না। তারাতো তাদের খেয়াল খুশি মতে কাজ করে, পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন সতর্কতা নেই। (হে রসূল!) আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, আপনি তা গ্রহণ করবেন না; বরং তাদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দিন।

ইমাম বয়যাবী (রহঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

فلا تصدقهم فيه وبين لهم فساده.

অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের ফেৎনা-ফাসাদের কথা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, যদি পৌত্তলিকরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হাযির হয় তবে (হে রসূল!) আপনি তাদের কথায় সায় দেবেন না। যে কাফেররা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা এবং যারা অন্যদেরকে সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সমকক্ষ মনে করে (হে রসূল!) আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না। তারা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়, ভ্রান্ত ধারণায় এবং কল্পনার ইন্দ্রজালে আবদ্ধ, পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, দিশেহারা, তাই সর্বহারা। অতএব, তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ.

শানে নুযুল

মুশরেকরা নিজেদের তরফ থেকে যে সব বস্তুকে হারাম বলে সিদ্ধান্ত করে তাদের এ সিদ্ধান্তের বাতুলতা যখন প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হল তখন লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করল, আল্লাহ পাক কি কি বস্তু হারাম করেছেন? এ সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১] দশটি বস্তু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হলঃ

১. আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা।

২. পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, তাদের সাথে কোন অবস্থাতেই মন্দ ব্যবহার করোনা।

৩. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করোনা।

৪. প্রকাশ্যে হোক বা গোপন কোন প্রকার অশ্লীল কাজের কাছেও যেয়োনা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৬

৫. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করোনা।

৬. এতিমদের সম্পদে তাছাররূফ করোনা।

৭. ওজনে কম দিওনা।

৮. অবিচারের কথা বলোনা।

৯. আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। অঙ্গীকার ভঙ্গ হয় এমন কাজ করোনা।

১০. সীরাতে মুসতাকীম বা সরল সঠিক পথের অনুসরণ কর, বিপথগামী হয়োনা।

اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا.

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আরবের মুশরেকদের পথভ্রষ্টতার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করতো এবং যে সব বস্তুকে আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্যে হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম বলে জানত। বর্বরতার যুগে এমনিভাবে তারা অনেক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। আলোচ্য আয়াত থেকে আল্লাহ্ পাক সে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে আল্লাহ্ পাক নিজে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আয়াতের বৈশিষ্ট্য

কা'বে আহবার যিনি তৌরাতের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি পূর্বে ইহুদী ছিলেন পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, কোরআনে করীমের এ আয়াত সমূহ তৌরাতের শুরুতেই স্থান পেয়েছে। এ আয়াত সমূহ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিও নাযিল হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত সমূহ হল মোহকাম, যার আলোচনা সূরা আলে এমরানে এসেছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত সকল শরীয়তে অপরিবর্তনীয় হিসেবে রয়েছে। এ আদেশ সমূহ কোন শরীয়তে বাতিল হয়নি।[১]

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর ওসিয়তনামা

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এমন ওসিয়ত দেখতে চায় যাতে তাঁর সিলমোহর রয়েছে, সে যেন এ আয়াত সমূহ পাঠ করে। এতে রয়েছে সেই ওসিয়ত যা তিনি আল্লাহ্ পাকের আদেশ ক্রমে স্বীয় উম্মতের উদ্দেশ্যে রেখে গেছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, কে আছ যে আমার নিকট এ তিন আয়াতের ব্যাপারে বয়আত করবে? এরপর তিনি এ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন। এরপর এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ বয়আতকে পূর্ণ করবে তাকে সওয়াব দান করা আল্লাহ্ পাকের দায়িত্ব হবে। আর যে এর কোন কথার উপর আমল করবেনা তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি দুনিয়াতে

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭২২

শাস্তি দেয়া না হয় তবে তার বিষয়টি কেয়ামতের দিন উত্থাপিত হবে। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।[১] (হাকেম)

اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا.

অর্থাৎ- কোন কিছুকেই আল্লাহর সাথে শরীক করোনা।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মুশরেকদের মধ্যে কয়েকটি দল ছিল। তাদের মধ্যে কেউ মূর্তি পূজা করতো। তাদের মধ্যে অন্য দল ছিল যারা নক্ষত্রের পূজা করতো। পৌত্তলিকদের আরেকটি দল আল্লাহ পাকের জন্যে সন্তান-সন্ততির দাবীদার ছিল। এ সমস্ত বিশ্বাস এবং আকিদার বাতুলতা ঘোষণা করে এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا.

"কোন কিছুকেই আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করোনা"।

সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহ হল শেরক

আল্লাহ পাক যেসব কাজকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন তন্মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন শেরকের কথা। কেননা শেরক হল সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহ। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক শেরকের গুনাহ মাফ করবেন না। এছাড়া অন্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করতেও পারেন"।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় শেরক হল অমার্জনীয় অপরাধ। আর শেরক আরবের পৌত্তলিকদের ন্যায় মূর্তি পূজা হোক অথবা ইহুদি নাসারাদের মত নবীগণকে খোদা বা তার পুত্র বলে দাবী করা হোক অথবা অন্যদের মত ফেরেশতাদেরকে খোদার কন্যা বলা হোক–এসবই শেরক এবাং অমার্জনীয় অপরাধ।

দ্বিতীয়তঃ শেরক প্রকাশ্য হোক অথবা গোপন, প্রকাশ্য শেরক হল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সম্মুখে মাথা নত করা বা অন্য কোন কিছুর উপাসনা করা বা অন্য কোন কিছুকে আল্লাহ পাকের সমকক্ষ মনে করা বা অন্য কোন কিছুকে নিজের ভাল-মন্দের নিয়ামক মনে করা আর শেরকে খফি বা গোপন শেরক হল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন ভাল কাজ করা। যাকে রিয়াকারী বলা হয়। অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের ভাল-মন্দের মালিক মনে করা। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রকার শেরক থেকে আত্মরক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৫

পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা, যদিও তোমাদেরকে খন্ড খন্ড করে কর্তন করা হয় অথবা তোমাদেরকে শুলে চড়ানো হয় অথবা তোমাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

এই হাদীসের তাৎপর্য হলো জীবনের বিনিময়ে হলেও ঈমানের হেফাজত করতে হবে। যদি জীবন দিয়েও শেরক থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় তবুও তা কর।[১]

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, তাদের সেবা-যত্ন কর, তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিওনা। তাদের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়োনা। অন্য আয়াতেও এ দুটি বিষয়ের তাগিদ এক সঙ্গে করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

আপনার পরওয়ারদেগার এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা। আর তোমাদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর। পবিত্র কোরআনে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ তোমরা যেন আমার শোকর আদায় কর এবং তোমাদের পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞ থাক। আর অবশেষে আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যদি যথাযথ ভাবে আমার বিধি-নিষেধ পালন না কর তবে শাস্তি ভোগ করবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেছেনঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি?

তিনি এরশাদ করেছেনঃ সঠিক সময়ে নামায আদায় করা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলামঃ এরপর কোন্ আমল উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার। পুনরায় আরজ করলেনঃ এরপর কোন্ আমল উত্তম? তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর রাহে জেহাদ।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেনঃ

رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ.

অপমানিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! কে অপমানিত হয়েছে?

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬

তিনি এরশাদ করলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে পায় অথচ জান্নাতে প্রবেশাধিকার না পায় অর্থাৎ পিতা-মাতার বৃদ্ধ কালে তাদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে সে অপমানিত হয়।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ.

"আর তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা"।

পূর্ববর্তী বাক্যে সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালনের তাগিদ করা হয়েছে, আর এ আয়াতে সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মাতার যে কর্তব্য তার নির্দেশনা রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথম কথা হলোঃ "অভাবের ভয়ে সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করোনা"। বর্বরতার যুগে আরবদের মধ্যে এ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতো তবে এ ভয়ে যে, এ কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবে এবং তাকে শ্বশুর হতে হবে, এটি বড় লজ্জাকর অবস্থা, তাই এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার নিমিত্তে তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করতো।

বর্বরতার যুগে এ কুপ্রথাও প্রচলিত ছিল যে, ভবিষ্যতে অভাব হতে পারে এ ভয়ে পৌত্তলিক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে নিজ হাতে হত্যা করতো। যেমন এ যুগেও দারিদ্র্যের আশঙ্কায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। ঠিক তেমনি বর্বরতার যুগে আরবের পৌত্তলিকরা তাদের সন্তান-সন্ত তিকে অভাব-অনটনের ভয়ে হত্যা করতো।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ.

(আর অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা) যেহেতু মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণা-পোষণ করে যে, সন্তানের জীবিকা নির্বাহ পিতা-মাতাকে করতে হয়, তাই তারা চিন্তা করে যে, জীবিকা নির্বাহ কিভাবে হবে? অন্ন বস্ত্রের সমস্যার সমাধান কিভাবে করবো? এ দুশ্চিন্তা দূরীভূত করার লক্ষ্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ.

অর্থাৎ "আমিই তোমাদের এবং তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করি"।

অতএব, পবিত্র কোরআন সর্বপ্রথম মানুষের মন থেকে এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করতে চায় যে, মানুষ নিজেই তার রিয্‌কের ব্যবস্থা করেনা; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, এক আল্লাহ পাকই মানুষের রিয্‌কের ব্যবস্থা করেন। অতএব, আদেশ হয়েছে এমন অবস্থায় অভাব-অনটনের দুশ্চিন্তায়, দারিদ্র্যের আশঙ্কায় সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করার ন্যায় অপরাধ করোনা। আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ মানুষের রিয্‌কের দায়িত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের হাতে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا.

পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণী মাত্রেরই রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহ পাকের। (সূরা হুদ)

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

(সূরা বাকারা)

(আর তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও ভোগ সম্পদ রয়েছে) তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করোনা। কেননা, খাদ্য সমস্যার সমাধান আমার হাতেই রয়েছে।

আর পবিত্র কোরআনে একথাও এরশাদ হয়েছেঃ দারিদ্র ও স্বচ্ছলতা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিরই ব্যাপার। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ.

(আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক কমিয়ে দেন) অতএব, দারিদ্র সমস্যার সমাধান জন্ম নিয়ন্ত্রণে বা সন্তান হত্যায় নয়; বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই রয়েছে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে বিষয়টির প্রতি এভাবে তাগিদ করা হয়েছেঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ.

(তোমরা অভাবের ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা) আর আলোচ্য আয়াতে من املاق বলা হয়েছে, উভয় বাক্য একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে দারিদ্র আসবে এ ভয়ে তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা।

যারা অভাবের ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী মনে করে, আল্লাহ পাকের এসব ঘোষণায় তাদের অবিশ্বাস এবং অনাস্থা প্রকাশ পায় যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

বর্তমান যুগে যে ধ্যান-ধারণার কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনার কথা বলা হয়, ঠিক এই একই কারণে আরবের পৌত্তলিকরা তাদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতো। শুধু পার্থক্য এতটুকু, এ যুগে সন্তান হত্যার কথা বলা হয়না, সন্তান জন্ম রোধের কথা বলা হয় কিন্তু উভয় কর্মের উৎস এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

যদি নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন চিত্তে কেউ বিচার করে তবে সে এ সত্য অবশ্যই উপলব্ধি করবে যে, সন্তান হত্যা করার মাধ্যমে বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমধান আদৌ করা যায় না; বরং এর দ্বারা অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কেউ একথা বলতে পারেন জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সন্তান হত্যা করা হয় না কিন্তু একথা সত্য যে, তা দ্বারা সন্তান রোধ করার চেষ্টা করা হয় অথচ সন্তানের জন্ম রোধের মাধ্যমে দারিদ্র রোধ করা সম্ভব হয় না। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যাদের

সন্তান সংখ্যা বেশী তারা আল্লাহর রহমতে সুখে শান্তিতেই আছেন। আর এ দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয় যে, সন্তান কম কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত।

মূলতঃ যারা আল্লাহ পাককে রিয্ক দাতা হিসেবে বিশ্বাস করে, যারা একথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই সিদ্ধান্ত হয় মানুষের হায়াত, মওত, রিয্ক দৌলত সম্পর্কে, মানুষের সুখ-শান্তি রয়েছে এক আল্লাহ পাকের হাতেই, তারা এসব অসুন্দর অযৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করে না।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, উনিশ শতকে মালথাস নামক বৃটেনের একজন অর্থনীতিবিদ জন্ম নিয়ন্ত্রণের এ পরিকল্পনা সর্বপ্রথম পেশ করে যা বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর লোক সমর্থন করে। তার এ মতবাদের পেছনে যে দর্শন কাজ করে তা হলো অভাবের ভয়।[১] অথচ একথা সর্বজন-বিদিত যে, সম্পদ বাড়ানোর ইচ্ছা করলে এবং এজন্যে কঠোর পরিশ্রম করলে আল্লাহ পাক সম্পদ বাড়িয়ে দেন, আজকের জাপানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য উপলব্ধি করা যায়, তাই অভাবের ভয়ে সন্তানের জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন যুক্তি থাকেনা।

বস্তুতঃ চক চক করলেই সোনা হয় না, পৃথিবীর যে সব রাষ্ট্র জন্ম নিয়ন্ত্রণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অনেক দেশ তার কুফল দেখতে পেয়ে এ নীতি বর্জনে বাধ্য হচ্ছে। এ পর্যায়ে আমরা একটি পরিসাংখ্যান তুলে ধরছি, এর দ্বারা শুধু যে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার সত্যতা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়; বরং যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তা তাদেরও চোখ খুলে দিয়েছে।

সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকরণ সাধারণ ভাবে বিতরণের মাধ্যমে ব্যাভিচারকে অত্যন্ত সহজ করে দেয়া হয় যার কারণে মানব সভ্যতা আজ টল টলায়মান।

বেশ কয়েকটি দেশে অনিয়ন্ত্রিত জন্মনিন্ত্রয়ণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতের ফলে জনসংখ্যার অবনতি ঘটায় সচেতন হয়ে আর্জেন্টিনা সরকার এর সপক্ষে সব ধরণের প্রোপাগাণ্ডা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র মুখ দিয়ে গ্রহণ করা যায় এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনুমোদিত আছে, তাও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র না থাকলে পাওয়া যাবে না। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে, ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ এই আইন পাশ করে যে, গর্ভনিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা দেয়া হবে। ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের গর্ভনিরোধক পাওয়ার জন্য পিতা-মাতার সম্মতি লাগবে না এবং এতে যা খরচ হবে তা সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ বহন করবে। ফ্রান্স সম্ভবত শীঘ্রই এ ধরণের স্বাধীনতা দানের কুফল টের পাবে।

ফ্রান্সের উচিত হাঙ্গেরির উদাহরণ সামনে রাখা। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমূহ অত্যধিক গ্রহণের ফলে হাঙ্গেরির জন্মহার ইউরোপে সর্বনিম্নে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে তা ছিল ১.২০ শতাংশ। এ পরিস্থিতি হবার আগে একজন হাঙ্গেরিয়ান মহিলা ইচ্ছামত গর্ভপাত ঘটাতে পারতেন। এখন এ স্বাধীনতা তুলে নেয়া হয়েছে এবং কঠোর মেডিক্যাল পরীক্ষার পর গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া হয়।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৯

অত্যধিক জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রুত জনসংখ্যা হ্রাস নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। মহিলাদের অল্পবয়সে বিয়ে করার উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। শ্রমশক্তির অংশ গ্রহণের হার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি জরীপে দেখা গেছে যে, ১৯৫৫ সালে শ্রীলঙ্কান নারীদের গড়ে ২২.৯ বছর বয়সে বিয়ে হত এবং ১৯৬৫-তে এটা দাঁড়ায় ২৪.৭-এ। রিপোর্ট বলছে, 'বর্তমানে এটা হয়ত আরো বেশী। দ্বীপ রাষ্ট্রটির জনসংখ্যা হ্রাস পাবার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তার'। ১৯৭১ সালের শুমারীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নয়া উপাদান দেখা গেছে–nuptiality gap বা ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের গ্রুপে কুমারদের তুলনায় কুমারীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

১৯৫৮ সালে জনসংখ্যা ঘাটতি জনিত কারণে রুমানিয়া তার জাতীয় নীতি পুনঃ নিরীক্ষা করতে বাধ্য হয় এবং সন্তানহীনতার জন্যে একটি বিশেষ কর ধার্য করা হয়। ১৯৭১ সালে রুমানিয়াতে জন্মহার ২১.৭-এ বৃদ্ধি পায়।[১]

বিস্ময়কর বিষয় এই যে, সুদীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর পরও পবিত্র কোরআনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। সেকালে তথা বর্বরতার যুগে অভাব-অনটনের ভয়ে পৌত্তলিকরা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করতো, আর চৌদ্দশ' বছর পরও এই একই কারণে সন্তানের জন্ম রোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন বিষয়টির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একথা ঘোষণা করেছে যে, যে কারণে তোমরা
সন্তানের হত্যা বা সন্তানের জন্ম রোধ কর তা সঠিক নয়; বরং তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের রিয্‌কের ব্যবস্থা আল্লাহ পাকই করেন একথার প্রতি বিশ্বাস করা মোমেন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

আধুনিক কালে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার নামে যে সব উপকরণ সরবরাহ করা হয় তা দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কি-না অথবা হলে তার পরিসংখ্যান কত তা সাধারণতঃ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে যা জানা যায় তা হলো এসব উপকরণের কারণে ব্যাভিচার প্রসার লাভ করে এবং নৈতিক অবক্ষয় প্রলয়ংকরী বন্যার চেয়েও ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। অথচ যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তা তারা ব্যাভিচার নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই করেন না। ফলে সমাজ জীবন হয় কলুষিত, হয়ত এ কারণেই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক অশ্লীল কাজ বর্জন করার তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

"আর তোমরা অশ্লীল কাজের কাছেও যেয়োনা, তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে"।

الفواحش শব্দটি শুধু ব্যাভিচার অর্থে ব্যবহৃত হয় না; বরং ব্যাভিচার সহ এ পর্যায়ে যত মন্দ এবং নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজ হতে পারে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বেপর্দা হওয়া, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সিনেমা, থিয়েটার এবং আর্ট গ্যালারীর নগ্নছবি সমূহ দেখা, চরিত্র হননকারী যাবতীয় কর্মকান্ড এ শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। আর এসব অপকর্ম প্রকাশ্যে হোক কি গোপনে সবই আলোচ্য আয়াতের আলোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ, অসুন্দর এবং

১। অপরাধবিদ্যাঃ কৃত-গাজী শামছুর রহমান, পৃষ্ঠা-৭৬০-৬১

বর্জনীয়। চরিত্র মাধুর্য অর্জন করা, নৈতিক মান উন্নত করা বা চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ.

এ পর্যায়ের আরো একটি নির্দেশ হলো এই, শরীয়ত সম্মত কোন কারণ ব্যতীত কাউকে তোমরা হত্যা করোনা। যে প্রাণকে আল্লাহ পাক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে হত্যা করা মহাপাপ। তবে যদি ইসলামী জেহাদের কারণে বা কেসাসের কারণে তথা হত্যার বদলে যদি হত্যা করতে হয় অথবা ব্যাভিচারের শাস্তি স্বরূপ যদি হত্যা করতে হয় তবে তার অনুমতি রয়েছে।

ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এসব নির্দেশ তোমাদেরকে এজন্যে দিয়েছেন যেন তোমরা এর সত্যতা উপলব্ধি কর এবং বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে মন্দ কাজ পরিহার কর। সত্যকে গ্রহণ কর, অসত্যকে বর্জন কর।

আধুনিক কাল ও আলোচ্য আয়াত

আধুনিক কালে যে গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা এবং অভিশাপ মানব জীবনের শান্তিকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং এই বিশাল পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলেছে তা বর্জন করার তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যেমন–

১. শেরক না করার নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে, অথচ আধুনিক কালে নব নব পন্থায় শেরক করা হয়। তৌহিদের প্রতি বিশ্বাসের দাবীদাররাও অনেক প্রকাশ্য এবং গোপন শেরকে জড়িয়ে পড়ে। যেমন কাফেরদের দেব দেবীর পূজা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা হয়।

২. পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে, অথচ আধুনিক সভ্যতা এ বিষয়ে শুধু নীরবতাই পালন করেনা; বরং বাস্তবে তার বিরোধিতা করে। বর্তমানে পশ্চিমা দেশ সমূহে পিতা-মাতার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার প্রথা সর্বত্র প্রচলিত।

৩. আলোচ্য আয়াতে সন্তান হত্যা না করার তাগিদ রয়েছে অথচ আধুনিক সভ্যতার অন্যতম শিক্ষা হলো জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা যা মানব সভ্যতার উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

৪. অশ্লীল কাজের ধারে কাছে না যাওয়ার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। অথচ ব্যাভিচার ও অন্যায়-অনাচার প্রতিনিয়ত প্রসার লাভ করছে।

৫. মানব জীবনের সংরক্ষণ ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে যে হারে হত্যাকান্ড হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। এ যুগকে সভ্যতার যুগ বলার কোন সুযোগই থাকে না, কেননা বর্বরতার যুগের ইতিহাসেও এত

হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআন শুধু আরবদের জন্যে নয় বা শুধু ষষ্ঠ শতাব্দীর জন্যে নয়; বরং সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগের মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক বা হেদায়েত নামা। এতে রয়েছে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের মহান শিক্ষা, যদি এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করতে হয়, যদি এ পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী রাখতে হয়, যদি বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশকে অব্যাহত রাখতে হয়, তবে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। কেননা তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবের নামে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ পয়গাম।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى
يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ
وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝١٥٢
وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝١٥٣
ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝١٥٤

তরজমা

(১৫২) আর এতীম বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ভাবে ব্যতীত তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়োনা। আর মাপ এবং ওজন ন্যায্য ভাবে পুরোপুরি দিও। আমি কারো উপর তার সাধ্যের অতীত দায়িত্ব অর্পণ করিনা। আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে হলেও ন্যায্য বলবে। আর আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, এভাবে আল্লাহ পাক তোমদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(১৫৩) এবং এ পথই আমার সরল সঠিক পথ অতএব, তোমরা এরই অনুসরণ করবে। অন্য পথে চলবেনা, নতুবা তারা তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে।

(১৫৪) অতঃপর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব যা নেককার লোকদের জন্যে সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিষদ বিবরণ এবং হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ এবং যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নিষিদ্ধ কার্যের বিবরণ ছিল। তবে সে কার্যগুলো ছিল সুস্পষ্ট পাপ, আর আলোচ্য আয়াতে এমন পাপ কার্যের বিবরণ রয়েছে যা সূক্ষ্ম। এ পর্যায়ে সর্বপথম এতীমের ধন-সম্পদ হেফাজতের নির্দেশ রয়েছে এবং এতীমের ধন-সম্পদ অপচয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এতীমের ধন-সম্পদ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ রয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

আর তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়োনা। শুধু উত্তম পন্থায় সঠিক ভাবে এতীমের সম্পদ রক্ষার্থে এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যাদের হেফাজতে এবং দায়িত্বে এতীম লালিত-পালিত হয় তাদেরকে বিশেষভাবে এ ব্যাপারে তাগিদ করা হয়েছে। এমনকি, অন্য একখানি আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا الاية.

অর্থাৎ- যারা অন্যায়ভাবে এতীমের সম্পদ ভোগ করে তারা তাদের উদরকে অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করে। কেননা, যারা এতীমের সম্পদ আত্মসাত করে তাদের জন্যে দোযখের শাস্তি অবধারিত। তবে এতীমের সম্পদের হেফাজত করা এবং তা বৃদ্ধি করার সদুদ্দেশ্যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটানো অন্যায় নয়।

এখানে মূল বিষয় হল নিয়্যত বা উদ্দেশ্য। যদি এতীমের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদকে কাজে লাগানো হয় তবে ইসলামী শরীয়ত তার অনুমতি দেয়। পক্ষান্তরে, এতীমের সম্পদ ভোগ করার লক্ষ্যে কোন প্রকার ছল চাতুরী করা হয় তবে তা মহাপাপ বলে পরিগণিত হয়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ যখন আলোচ্য আয়াত এবং. اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا الاية নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম ভীত-সন্ত্রস্ত হন এবং এতীমদের পানাহার এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ভিন্ন করে দেন। এর দ্বারা এতীমদেরও কিছু ক্ষতি হয়ে থাকে তা হল অনেক ক্ষেত্রে এতীমের আহার্য দ্রব্য যা বেচে যেত তা বিনষ্ট হত অথবা এতীমদেরকে বাসি খাবার গ্রহণ করতে হত। যখন এ অবস্থা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হল তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ.

এ আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এতীমদের কল্যাণ সাধন কর এবং তাদের আহার্য দ্রব্য তোমাদের সাথে একত্রিত করার ব্যাপারে কোন ক্ষতি নেই। তারা তোমাদেরই ভাই। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম পুনরায় এতীমদের সঙ্গে মিলে মিশে পানাহার শুরু করেন।[১]

অভিভাবকদের জন্যে সময়সীমা

কতদিন পর্যন্ত এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের অভিভাবকদের নিকট থাকবে তার একটা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ.

অর্থাৎ-এতীম যখন যৌবন লাভ করবে এবং নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তার ধন-সম্পদ সে নিজে বুঝে নিতে পারবে এবং রক্ষণা-বেক্ষণে সক্ষম হবে তখন তার সম্পদ তাকে সোপর্দ করতে হবে।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হল যখন এতীম তার পূর্ণ শক্তি লাভ করে, একটি শক্তি হল শারীরিক আরেকটি হল মানসিক, যখন জ্ঞান বুদ্ধি, ধী-শক্তি এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে সে পূর্ণ হবে তখন তাকে তার সম্পদ ফেরত দিতে হবে।

ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, মানুষের এ দু'টি শক্তি কত বয়সে পূর্ণ হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ পচিশ বছর। আর সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, ত্রিশ বছর। আর কোন কোন ফেকাহবিদ বলেছেন, আঠার বছর।[২]

এতীমের হক্ব রক্ষা করার বিশেষ তাগিদ

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক এতীমদের হক্ব আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করেছেন। কেননা, প্রাক-ইসলামী যুগে এতীমদের প্রতি জুলুম করা হত অত্যন্ত বেশী। সে যুগে বর্বরতার শিকার হত অসহায় নারী, অনাথ এতীম-মিসকীন এবং কন্যা সন্তান। নারীদের কোন অধিকার ছিলনা সমাজে। এতীমদের ধন-সম্পদ তাদের অভিভাবকরা আত্মসাত করে ফেলত এবং কন্যা সন্তানদেরকে বর্বর পৌত্তলিকরা জীবন্ত কবরস্থ করত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সমাজের এই দুঃস্থ, বিপদগ্রস্ত মানুষদের বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার নির্দেশ দিলেন, মরণাপন্ন মানবতা পুনঃজীবন লাভ করল। সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুরু হল। মানুষ জুলুম-অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেল। নারী পেল তার অধিকার, এতীম ফেরত পেল তার ধন-সম্পদ এবং কন্যা সন্তানদের প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হত তা বন্ধ করা হল।

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৮
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৯

পবিত্র কোরআনে মজলুম এতীমদের অধিকার সংরক্ষণে যে বিশেষ তাগিদ রয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে সব আয়াত নাযিল হয়েছে আলোচ্য আয়াত তন্মধ্যে একটি। আমরা এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার মাহাত্ম এবং যথার্থতার সঠিক উপলব্ধির জন্যে অন্যান্য আয়াতের প্রতিও দৃষ্টিপাত করতে পারি।

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

(সুতরাং এতীমদেরকে ধমক দিওনা)। (সূরা দোহা)

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ.

(না কখনই নয়, বস্তুতঃ তোমরা এতীমদেরকে সম্মান কর না)। (সূরা ওয়াল ফাজর)

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ.

(আর লোকেরা আপনাকে এতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন তাদের কল্যাণ সাধনই উত্তম।) (সূরা বাকারাহ)

'আর এতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। তাদের উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে তোমাদের নিকৃষ্ট দ্রব্যেকে পরিবর্তন করোনা।'

এভাবে পবিত্র কোরআনের ২২খানি আয়াতে এতীমদের অধিকার সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, ইসলাম মানবতার ধর্ম। দুর্গত ও জরাজীর্ণ মানবতার পরিত্রাণের জন্যেই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ইসলামী জীবন বিধানের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আরো একটি লক্ষ্য অর্জিত হয় আর তা হল পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা। আর এটিই হল মানুষের পরম চাওয়া এবং পাওয়া।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ.

"আর তোমরা মাপ এবং ওজন পূর্ণ কর"।

পূর্ববর্তী বাক্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে তা'লিম দেয়া হয়েছে। আর এ বাক্যে সামাজিক জীবনের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ রয়েছে। বিশেষতঃ এতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিক গুণ অর্জনের শিক্ষা রয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম কথা হল ওজনে ফাঁকি না দেয়া, ন্যায্য ভাবে ওজন করা, প্রতারণা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ না করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তাদের জন্যে ধ্বংস, যারা কোন কিছু গ্রহণ করার সময় পূর্ণ ওজন করে আর দেয়ার সময় কম দেয়। আল্লাহ পাক সে সব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন যাদের মধ্যে এই চারিত্রিক দোষ ছিল।

তিরমিযী শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা এমন এক বিষয়ের অভিভাবক হয়েছ যা সঠিকভাবে হেফাজত না করার কারণে ইতিপূর্বে বহু সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে। কোরআনে করীমের অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

"ধ্বংস তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়, যারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় আর যখন মানুষের জন্যে মাপে অথবা ওজন করে তখন কম দেয়" (সূরা মুতাফফিফিন)।

আলোচ্য বাক্যে بالقسط শব্দটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী, শব্দটির অর্থ হলো ইনসাফ, সুবিচার, কোন কিছুতে কম বা বেশী না করা।

অতএব, কোন অবস্থাতেই যেন ওজনের ক্ষেত্রে প্রতারণা না করা হয় এবং যা ন্যায্য প্রাপ্য তা দেয়া হয় এর তাগিদ করা হয়েছে।

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

কোন লোককে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ আল্লাহ পাকের নীতি বিরুদ্ধ কাজ। একথাটির তাৎপর্য হল, ইতিপূর্বে যত দায়িত্ব পালনের আদেশ রয়েছে তা তোমরা যথাযথভাবে পালন কর। কেননা, কোন লোককেই এমন নির্দেশ দেয়া হয়না যা পালন করা তার সাধ্যাতীত। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ ন্যায্য ভাবে পূর্ণ ওজন দেয়ার নির্দেশের পর এ বাক্যটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যার ওপর কারো হক্ব আছে সে যেন ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়েও বেশী দেয় আর বেশী পরিমাণ যা দেবে তা তার তরফ থেকে হবে।

"কারো সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট কোন লোককে দেয়া হয়না"-এর তাৎপর্য হল এই, যদি ভুলক্রমে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কম বেশী হয়ে যায় তবে তার জন্যে পাকড়াও করা হবেনা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তার ঋণের ব্যাপারে তাগাদা করার জন্যে হাযির হয়। সে কথাবার্তায় বে-আদবী পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে। তখন সাহাবায়ে কেরাম তাকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যে হক্বদার তার এমন কথা বলার হক্ব রয়েছে, ঐ ব্যক্তির উট যে বয়সের ছিল সে বয়সের উট তাকে দিয়ে দাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি ঐ বয়সের উট না পাওয়া যায়? তিনি এরশাদ করলেন, তবে তার চেয়ে উত্তম যা হয় তা দিয়ে দাও। কেননা, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে উত্তম হয়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু রাফে বর্ণিত এ মর্মের আরো একখানি হাদীস রয়েছে।

অতএব, হক্বদারের হক্ব অধিক পরিমাণে দেয়া আর যে পাওনাদার তার পক্ষে কম নেয়া অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর হয় এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাক কোন মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।[১]

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ.

"আর যখন তোমরা কথা বল তখন ইনসাফের সঙ্গে কথা বল", তথা কোন বিষয়ে ফয়সালা করার সময় অথবা সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে কথা বলার সময় সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কারো আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব, কারো ভালবাসা ও ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক সত্য ভাষণে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা যখন কথা বলবে তখন সত্য বলবে, যা সঠিক এবং ন্যায্য তার যেন কোন প্রকার ব্যতিক্রম না হয়। এজন্যে এ মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার একথাটি এরশাদ করেছেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শেরকের সমান।

হযরত বোরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার জান্নাতে যাবে। আর দু' প্রকার দোযখে, জান্নাতে সেই বিচারক যাবে যে সত্যকে উপলব্ধি করেছে এবং সত্য ও সঠিক মীমাংসা করেছে। আর যে ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধি করেছে অথচ বিচারের ক্ষেত্রে জুলুম করেছে সে দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি সত্য উপলব্ধি না করেই মীমাংসা করেছে সেও দোযখে যাবে। (আবু দাউদ শরীফ)

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا.

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ তথা শরীয়তের যাবতীয় বিধান সঠিকভাবে পালন কর।

২. আল্লাহ পাকের নামে যদি কোন মানত করা হয় অথবা শপথ কর আর তা শরীয়ত বিরোধী না হয় তবে সে মানত ও শপথ অবশ্যই পূর্ণ করবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

এ পর্যন্ত যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ পাক যে সব বিষয়ে তাগিদ করেছেন তা তোমরা যথাযথভাবে পালন কর। হয়তো তোমরা নসিহত হাসিল করবে।

অর্থাৎ আমি নিদর্শন সমূহকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি তথা এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, তার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা বা অস্পষ্টতা নেই।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৯-৪০

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

এর দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট, কিন্তু এর দ্বারা সে সব লোকই উপকৃত হতে পারবে যারা উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন পাঠ করে ও পবিত্র কোরআনে চিন্তা ও গবেষণা করে। নসিহত হাসিল করার তথা উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যই যাদের না থাকে তারা স্বাভাবিক ভাবেই পবিত্র কোরআনের নসিহত থেকে উপকৃত হতে পারেনা। যারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে মেনে চলে এবাং ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে জেদ ধরে অথবা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা এই মহান গ্রন্থ দ্বারা হেদায়েত লাভ করতে পারে না।

অতএব, যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, যারা সত্য-সন্ধানী, যাদের মধ্যে সঠিক পথ লাভের অন্বেষণ রয়েছে তারাই লাভ করে সরল সঠিক পথ। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ.

"আর নিশ্চয় এটিই হলো সরল সঠিক পথ, অতএব, তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর"।

সীরাতুল মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা

সূরা ফাতেহায় আল্লাহ পাক সীরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের জন্যে দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন এভাবেঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

(হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও।)

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মানুষের যা একান্ত করণীয় তার বিবরণ দেয়ার পর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ.

অর্থাৎ এটিই সরল সঠিক পথ। অতএব, তোমরা এরই অনুসরণ কর। এমনিভাবে সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

এবং তোমরা শুধু আমার বন্দেগী কর (আর কারো নয়) তথা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা। এটিই সরল সঠিক পথ। অতএব, আল্লাহর সাথে শেরক না করা এবং তাঁর একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ।

সূরা ইয়াসীনের শুরুতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

يٰسٓ . وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ . اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

ইয়াসীন! শপথ হেকমতপূর্ণ কোরআনের, নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, সরল সঠিক পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সূরা ইয়াসীনের এ দু'খানি আয়াতকে একত্রিত করলে তার যে মর্ম উপলব্ধি করা যায় তা হলো সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ হলো তওহীদ ও রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করা তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

অতএব, সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও চির শান্তি, চির মুক্তি। পক্ষান্তরে, এই সরল সঠিক পথ ব্যতীত যত পথ আছে সবই বাতিল এবং বর্জনীয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ .

"আর তোমরা অন্য পথে চলবেনা, নতুবা তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে"।

এবনে আতিয়্যা বলেছেনঃ অন্য পথ হলো ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক সহ সকল শেরক ও বেদআতপন্থীদের পথ, আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ অন্য পথ হলো বেদআতের সকল পথ। কেউ কেউ এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ স্থানে সত্য, ইসলামও তন্মধ্যে একটি ধর্ম। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, একথা সম্পূর্ণ অসত্য, উদ্ভট। কেননা, সত্যধর্ম একটিই, আর তা হলো ইসলাম। যেমন অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ .

(নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম।)

লক্ষ্যণীয় السُّبُل শব্দটি বহুবচন হলো سبيل এর কেননা, ইসলাম ব্যতীত সকল পথই বাতিল। পক্ষান্তরে ইসলামের জন্যে একবচনের শব্দ صراط ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা সত্য ধর্ম একটিই, আর তা হলো ইসলাম।

ইসলামের সকল শিক্ষার মূল কথা হল মানুষ তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে। সকল নৈতিক গুণে গুণান্বিত হবে। আল্লাহর সৈনিক রূপে জীবন-যাপন করবে। সমগ্র মানব জাতির জন্যে আদর্শ এবং নমুনা হবে। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক মানুষকে দান করেছেন এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই এ জীবন বিধানের বাস্তবায়ন হয়।

আর এটিই সিরাতুল মুস্তাকীম।[১]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২০

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত এবং এমনি ধরনের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য হল, আল্লাহ পাক মোমেনগণকে ঐক্যবদ্ধ, অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য থাকার আদেশ প্রদান করেন, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা ফেরকাবন্দী হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছে। মসনদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলিত হয়েছে, তিনি একটি সরলরেখা টেনেছেন, এরপর ডানে বামে আরও অনেকগুলো রেখা টেনে বলেছেন, এসব পথে শয়তান রয়েছে, সে মানুষকে নিজের দিকে ডাকে, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াতের প্রথম অংশ তেলাওয়াত করেন, আর এমনি হাদীস হযরত যাবের (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' কি? তিনি বলেনঃ যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

এ পথের ডানে বামে অনেক পথ রয়েছে। তাতে লোকেরা চলে আর অন্যদেরকেও নিজেদের দিকে ডাকে। যারা এসব পথ অবলম্বন করে তারা দোযখে পৌঁছে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) আরও একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক সীরাতুল মুস্তাকীমের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমনি একটি পথ, যার দু' ধারে দুটি দেয়াল রয়েছে এবং তাতে অনেক দুয়ার রয়েছে, দুয়ারের কপাটগুলো খোলা রয়েছে আর দুয়ার গুলোতে ঝুলন্ত পর্দা রয়েছে। এই সরল পথের মাথায় একজন ঘোষক বলছে, হে লোক সকল! তোমরা সবাই সীরাতুল মুস্তাকীমে আস এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়োনা। আর ঐ পথের মাঝখানে এক ব্যক্তি রয়েছে, যদি কেউ ঐ দুয়ার গুলোর মধ্যে কোন একটি খুলতে চায় তখন সে বলে হায় আক্ষেপ! এ দুয়ার খোলোনা যদি খোল তবে তুমি সরল সঠিক পথ থেকে ছিটকে দূরে সরে যাবে। অতএব, সরল সঠিক পথ হল ইসলাম। আর দু'দিকের দেয়াল হলো আল্লাহ পাকের নিদৃষ্ট সীমা। উম্মুক্ত দুয়ার হলো আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ। সরল পথের মাথায় যে ব্যক্তি রয়েছে তা হলো আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআন, সরল পথের দিকে আহ্বানকারী হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মোতায়েন উপদেশদাতা, যা মোমেন মাত্রেরই অন্তরে রয়েছে।[১] (তিরমিযী)

ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নসিহত করছেন, যেন তোমরা পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা কর, পরহেযগারী অবলম্বন কর, গোমরাহীর পথ থেকে দূরে থাক।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৯

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ.

(পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নিষিদ্ধ কার্যাবলীর বিবরণের পর আমি তোমাদেরকে এই খবর দিচ্ছি যে) আমি মূসাকে তৌরাত গ্রন্থ দিয়েছিলাম। যারা নেককার, যারা পূণ্যবান তাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে তৌরাত দিয়েছিলাম, তাতে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, রয়েছে তাতে হেদায়েত এবং রহমত। হয়ত লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দরবারে হাযিরীর ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে। যারা বুদ্ধিমান যারা পূণ্যবান তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, অবশেষে একদিন এই সুন্দর বসুন্ধরা ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অবশ্যই হাযির হতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই তথা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যেই তৌরাত নাযিল করেছি।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বনী ইসরাঈল জাতি তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের আযাবে পতিত হয়েছে, কোপগ্রস্ত হয়েছে। তাদের এ পতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আখেরাতের প্রতি তাদের ইয়াকীন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও জীবনকেই তারা সবকিছু মনে করেছিল। পরিণামে তারা সর্বপ্রকার অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন আজকের পৃথিবীতেও এই একই অবস্থা বিরাজমান। এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের আরাম আয়েশ এবং আনন্দ-সামগ্রী সংগ্রহে সকলেই ব্যস্ত, মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা, এমনকি আত্মহারা। এ পৃথিবীতে ভালভাবে থাকার প্রস্তুতিতে এত ব্যস্ত যে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের কোন অবসরই নেই। অথচ এই জীবন যেমন সত্য পরজীবনও তেমনি সত্য। মৃত্যুর অলংঙ্ঘীয় বিধানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের জীবনের অবসান ঘটবে, তাকে পাড়ি জমাতে হবে পরপারে। এ অমোঘ বিধান সকলের জন্যে এবং সর্বত্র কার্যকর। এতে কারো ব্যাপারেই কোন পার্থক্য বা তারতম্য নেই। তাই আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটিতে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান রয়েছে। তার পূর্বে তৌরাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

অর্থাৎ তৌরাতে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু কিছু আইন-কানুনই বর্ণিত হয়নি, বরং দ্বীন ইসলামের বিধান সমূহের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

وَّهُدًى

অর্থাৎ তৌরাত পথ প্রদর্শক তাদের জন্যে যারা এই আসমানী গ্রন্থ থেকে সঠিক পথের সন্ধান চেয়েছে।

وَّرَحْمَةً.

অর্থাৎ তৌরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে এই আসমানী গ্রন্থটি আল্লাহ্ পাকের রহমত লাভের কারণ হয়েছে।

لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.

আর এই কিতাব এজন্যে অবতীর্ণ হয়েছে যেন লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দরবারে হাযিরীর ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রতি ঈমান এনে তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু ইহুদীরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের স্থলে তৌরাতের প্রতিই অবিশ্বাস করেছে এমনকি, তাদের খেয়াল খুশি মোতাবেক তৌরাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। অবশেষে যখন পৃথিবীর মানুষ গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। নাযিল হয় তাঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, যাতে রয়েছে সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে হেদায়েত। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُوْلُوْٓا إِنَّمَآ أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ
مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُوْلُوْا
لَوْ أَنَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ
جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ
يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

তরজমা

(১৫৫) আর এই কিতাব আমি নাযিল করেছি যা অতীব বরকতময়। অতএব, তোমরা তার অনুসরণ কর আর পরহেযগারী অবলম্বন কর হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

(১৫৬) তোমরা যেন কখনও বলতে না পার যে কিতাবতো শুধু আমাদের পূর্বে দুটি সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল। আমরা তার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না।

(১৫৭) অথবা তোমরা একথা না বল যে যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল হত, তবে আমরা তাদের চেয়ে অধিকতর হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম। এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত এবং রহমত এসেছে, এরপর যে কেউ আল্লাহ পাকের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা থেকে বিমুখ হবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? যারা আমার নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি সত্য বিমুখতার জন্যে তাদেরকে জঘন্য আযাবে পতিত করবো।

তফসীরুল কোরআন

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ.

আর এই কিতাব (পবিত্র কোরআন) আমি নাযিল করেছি যা অত্যন্ত বরকতময়, এই কিতাবেই রয়েছে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ।

فَاتَّبِعُوْهُ.

যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে আর এতে রয়েছে অনন্ত অসীম বরকত তথা মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। অতএব তোমরা এই কিতাব মেনে চল, তার পরিপূর্ণ অনুসরণ কর, পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আদেশ নিষেধ মেনে চল। কেননা, এর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের নাজাত এবং চির শান্তি।

وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অতএব, তোমরা পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা এবং তাকে মিথ্যা জ্ঞান করা থেকে সাবধান থাক। যদি তোমরা তা কর তবে আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হবে। অথবা এর অর্থ হল তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, পরহেযগারী অবলম্বন কর এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করবেন। অথবা এর অর্থ হল তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, এর শুভ-পরিণতি স্বরূপ তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বরণে অনুপ্রাণিত করেছেন। পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধের উপর আমল করার আহ্বান জানিয়েছেন। পবিত্র কোরআন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং পবিত্র কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর আদেশ দিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত, এ গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থ হল অত্যন্ত বরকতময়, যে কেউ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করবে, পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেকে আলোকিত করবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের বরকত হাসিল করবে। কেননা, পবিত্র কোরআন হল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সুদৃঢ় একটি রশ্মি।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬০

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ আর এই কিতাব পবিত্র কোরআন– যাকে আমি নাযিল করেছি, এটি অত্যন্ত বরকতময় গ্রন্থ। অতএব, তোমরা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মেনে চল এবং পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা কর। হয়ত তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত নাযিল করার পর আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, যা বরকত ও কল্যাণের দিক থেকে তৌরাতের চেয়ে অনেক বড় এবং মহান। অতএব, তৌরাতের স্থলে পবিত্র কোরআনের অনুসরণ কর। পবিত্র কোরআনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় কর।

ইসলাম গ্রহণ না করার কোন ওজর রইল না

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا.

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে তৌরাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, এতে ছিল হেদায়েত, রহমত এবং শরীয়তের বিধানের বিস্তারিত বিবরণ।

এ পর্যায়ে আরবের পৌত্তলিকরা একথা বলতে পারত যে, তৌরাত ও ইঞ্জিল যত বড় মহান আসমানী গ্রন্থই হোক না কেন এবং তাতে হেদায়েত ও রহমত লাভের যত উপকরণই থাকুক না কেন, তৌরাত নাযিল হয়েছে ইহুদীদের জন্যে আর ইঞ্জিল নাসারাদের জন্যে। এ দুটি গ্রন্থ দুটি জাতির উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা এসব গ্রন্থের কোন খবর রাখিনা। যদি আরবী ভাষায় আমাদের নিকট কোন কিতাব নাযিল হত, তাহলে আমাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা হত। কিন্তু ইহুদী নাসারাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ গ্রন্থ যত উত্তমই হোক না কেন তার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? আমাদের নিকট কোন নবীর আগমন হয়নি এবং কোন আসমানী গ্রন্থও অবতীর্ণ হয়নি।

কিন্তু মক্কার বুকে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হল এবং তাঁর প্রতি নাযিল হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। আর তা নাযিল হল আরবী ভাষায়, তখন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে আরবদের তথা বিশ্ববাসীর কোন ওজর-আপত্তি রইলনা। তাদের এসব ওজর-আপত্তি বা টাল-বাহানার সকল পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের আলো বিচ্ছুরিত হল চতুর্দিকে।

প্রাচ্য-প্রতীচ্য, সাদা-কালো, ভাল-মন্দ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির নিকট পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা এবং বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ পৌঁছল, গত চৌদ্দশ' বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং পরিবেশে প্রায় ৪০০শ' ভাষায় পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীর হয়েছে, আরো হতে থাকবে।

সুতরাং এ খোঁড়া যুক্তি খাড়া করার কোন সুযোগ রইলনা যে, পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, আমরা তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি এবং তার ওপর আমল করতেও পারিনি।

এ পর্যায়ে পৃথিবীর যে সব ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হয়েছে তার একটি তালিকা পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদের তালিকা

ভাষা	সংখ্যা	ভাষা	সংখ্যা
উর্দু	৯২	মালিয়াসম	৩
ফার্সী	৫২	পশতু	১৪
হিন্দী	১৮	ফরাসী	২২
গুজরাটি	৯	ইংরেজী	২৬
ইরানী	৫	ল্যাটিন	১৫
তুর্কী	৫	জার্মানী	১৬
জাভা	১	ইটালী	৯
ইন্দোচীন	১	স্পেনীয়	৬
বার্মা	২	ডাচ	৫
জাপানী	৩	গ্রীক	৬
চীনা	৫	মুকাসেরিন	২
মাওযাহেনী	৪	উরুগলিন	১
ফিলিপাইনী	১	রুশ	৬
হোসী	১	ডেনিশ	৪
হাবশী	১	বুলগেরী	১
মাল্টা	১	সুইডিশ	৩
তেলেগু	৩	গোলিশ	৩
সংস্কৃত	২	পর্তুগাল	৪
গুরমুখী	২	মার্কিন	২
বাংলা	১০	হাংগেরী	২
কান্টারী	১	আলবেনী	১
সিন্ধী	২	আরমেনী	৪
পাঞ্জাবী	৬	রোমান	১
মারাঠী	১	অষ্ট্রীয়ান	২
তামিল	১	বহিমিয়া	২
			মোট তরজমা- ৩৭৯

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে এবং পবিত্র কোরআন থেকে

হেদায়েত লাভে সচেষ্ট হয়েছে। আর এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

অতএব, আরবদের যেমন একথা বলার সুযোগ রয়নি যে, ইহুদী নাসারাদের নিকট আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে, আমরা তার শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। এমনিভাবে সমগ্র বিশ্ববাসীর কারো পক্ষেও একথা বলা সম্ভব নয় যে পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, আমরা তার মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারিনি। ফলে কেয়ামতের দিন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কেউ এমন ওজর-আপত্তি পেশ করতে পারবেনা। কেননা, পবিত্র কোরআনের আবেদন বিশ্বজনীন, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে পবিত্র কোরআনের অপূর্ব সুরলহরী মানব মনকে নাড়া দিয়েছে। এজন্যে দেখা যায় অনেক অমুসলিম পন্ডিত ব্যক্তি কোরআনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে এমন দু' একটি অভিমত পেশ করতে চাই।

মিঃ এমানুয়েল ডি এনশ বলেনঃ সমগ্র ইউরোপ যখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন সেখানে কোরআনের আলোকরশ্মি প্রবেশ করে এবং তা গ্রীসের মৃত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে।

অধ্যাপক এডওয়ার্ড জি, ব্রাউন বলেনঃ আমি যতই কোরআন সম্পর্কে গবেষণা করি, এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করি ততই আমার মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বর্ধিত হয়।

অধ্যাপক আর এ নিকলসন বলেনঃ কোরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা সমগ্র মুসলিম জাহানের মহিমান্বিত ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কোরআনই কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করার মত জঘন্য রীতির চির অবসান ঘটিয়েছে।

মিঃ এইচ, এম লিভার বলেনঃ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা থেকেই দর্শন ও বিজ্ঞান উৎসারিত হচ্ছে এবং এতে উন্নতির এমন স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে যে, সমসাময়িক ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যের জ্ঞান বিজ্ঞানকেও ম্লান করে দিয়েছে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যুগে যুগে গুণী-জ্ঞানীগণ পবিত্র কোরআন থেকে জ্ঞানের অন্বেষণ করেছে এবং পবিত্র কোরআন তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। এমনকি, আমাদের বাংলা ভাষায়ও পবিত্র কোরআনের প্রথম অনুবাদ যিনি করেছেন তিনি একজন অমুসলিম বাবু গিরিশ চন্দ্র। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا.

তোমরা যেন কখনো বলতে না পার যে, আসমানী কিতাবতো শুধু আমাদের পূর্বে দু'টি সম্প্রদায়ের প্রতি নাযিল হয়েছিলো, আমরা সেই কিতাবের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না।

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আল্লামা বগবীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে তিনি লিখেছেনঃ কাফেরদের একটি দল বলেছিলো, যদি ইহুদী নাসারাদের ন্যায় আমাদের প্রতিও কিতাব নাযিল হত তবে আমরা তাদের চেয়ে অধিকতর হেদায়েত

লাভ করতাম। ইহুদী নাসারাদের চেয়েও উত্তম আদর্শ পেশ করতাম। আমরা তাদের মত নই, যদি আমাদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল হত তবে কিভাবে তার উপর আমল করতে হয় তা আমরা দেখিয়ে দিতাম।

فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ.

এখন আর এমন অভিযোগ করার কোন সুযোগ রইল না। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের মহান উজ্জ্বল গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সমুপস্থিত। যা এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট দলিল হিসেবে এবং হেদায়েত ও রহমত হিসেবে। এখন দেখা যাবে তোমরা তার উপর কত উত্তমভাবে আমল কর, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে আর তাঁর প্রতিই নাযিল হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে পবিত্র কোরআনের প্রতি আমল কর।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ.

কিন্তু মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পরও যদি কেউ আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ জ্বলন্ত নিদর্শনকে এড়িয়ে চলে আর শুধু যে নিজে আল্লাহ পাকের বিধানকে উপেক্ষা করে তাই নয়; বরং অন্যদেরকেও হেদায়েত গ্রহণে বাধা দেয়, এমন লোকদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে কেননা, তারা মানবতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তথা ইসলামের প্রচার প্রসারে বাধা দেয়। তারা যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা করে এবং পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করে সেজন্যে তাদের শাস্তি ছিল অবধারিত। উপরন্তু, যেহেতু তারা ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাধা দেয় এবং মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় তাই তাদের শাস্তি হবে কঠোরতর এবং অধিকতর।[১]

আলোচ্য আয়াতে صدف শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ হলো বাধা প্রদান করা বা এড়িয়ে চলা।

মক্কার পৌত্তলিকরা শুধু যে ইসলাম গ্রহণে বিরত থাকে তাই নয়; বরং ইসলামের শত্রুতায় তারা তৎপর থাকে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয় সর্বশক্তি দিয়ে তাই তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

১। তফীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২১

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ
بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ
انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا
لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

তরজমা

(১৫৮) তারা কি তাদের নিকট ফেরেশতা কিংবা আপনার প্রতিপালক অথবা আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন উপস্থিতির অপেক্ষা করছে? যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন কারো ঈমান আনয়ন তার কাজে আসবেনা। যদি পূর্ব থেকে সে ঈমান না আনে অথবা যে ঈমানের মাধ্যমে কোন সৎ কাজ করে নাই। (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও অপেক্ষা করছি।

(১৫৯) নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, (হে রসূল!) তাদের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব নেই, তাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে, তিনিই অবশেষে তাদেরকে তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(১৬০) যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে সে তার দশ গুণ লাভ করবে আর যে একটি মন্দ কাজ করবে সে শুধু ঐ কাজেরই শাস্তি ভোগ করবে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব সমূহ এমনকি, অবশেষে আবির্ভূত হয়েছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আম্বিয়ায়ে কেরামের দলপতি, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে পবিত্র কোরআনে তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসী সুপথ গ্রহণ করেনি, আল্লাহ্ পাকের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত গ্রহণ করেনি, ঠিক এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ.

অর্থাৎ হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা সত্ত্বেও যখন তাদের চোখ খোলেনা, তারা সৎ পথে আসেনা, তবে কি তারা এরই অপেক্ষা করছে যে তাদের নিকট কোন ফেরেশতা আসবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তাদের নিকট আগমন করবেন অথবা আল্লাহ্ পাকের কোন বিশেষ নিদর্শন তাদের নিকট আসবে, যদি তারা এমন কিছু ধারণা করে থাকে তবে (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন যে, যদি আল্লাহ্ পাকের কোন নিদর্শন সত্যিই আসে তবে মনে রেখো, এমন অবস্থায় কোন কাফেরের ঈমান আনয়ন ও কোন গুনাহগারের তওবা তার কাজে আসবে না।

اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ.

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে ফেরেশতাদের আগমনের অর্থ হল মৃত্যুর ফেরেশতা অথবা আযাবের ফেরেশতা। অথবা সেই ফেরেশতা যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এসে তাঁর রেসালতের সত্যতা এবং পবিত্র কোরআনের হক্ব হওয়ার কথা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, ফেরেশতা মৃত্যুর হোক অথবা আযাবের হোক অথবা সাক্ষ্য দেয়ার জন্যেই আসুক ফেরেশতার আগমনের পর কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বয়যাভী (রঃ) লিখেছেনঃ মূলতঃ কাফেররা ফেরেশতার আগমনের অপেক্ষা করছিল না; বরং তাদের অবস্থা এমন ছিল যেন তারা ফেরেশতার আগমনের অপেক্ষা করছিল। কেননা, সর্বশেষ নবীর আগমনের পরও যখন তারা হেদায়েত গ্রহণ করছে না তখন তাদের অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই এমন ছিল যেন তারা মৃত্যুর অথবা আযাবের ফেরেশতার অপেক্ষা করছিল। অথবা ফেরেশতাদের আগমনের অর্থ হল কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানের ফেরেশতাদের আগমন।

اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ.

(অথবা আপনার প্রতিপালক আগমন করবেন) এর অর্থ হল কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ পাকের শুভাগমন। সূরা বাকারায় অনুরূপ একখানি আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে।[১]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ.

১। এর ব্যাখ্যার জন্যে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআনের ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩-৬৫

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের যে নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে তা হলো পশ্চিম গগনে সূর্যোদয়, কেয়ামতের প্রাক্কালে পূর্বাকাশের স্থলে একদিন পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আয়াত বা নিদর্শনের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ ব্যাখ্যাই রয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, পশ্চিমাকাশে সূর্য ওঠার পর আর কারো তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেয়ামতের আলামত সমূহ

তফসীরকারগণ এ আয়াতের তফসীরে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কেও বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত হোজায়ফা (রাঃ) এবনে ওসাঈদ গেফারী বর্ণনা করেনঃ আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেন এবং এরশাদ করেনঃ তোমরা যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন না দেখবে সে পর্যন্ত কেয়ামত আসবে না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উল্লেখ করেনঃ

১. ধূম্রজাল,
২. দাজ্জাল,
৩. দাব্বাতুল আরদ নামক জন্তু বিশেষের আবির্ভাব,
৪. পশ্চিম গগনে সূর্য ওঠা,
৫. ঈসা এবনে মরয়মের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন,
৬. ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া,
৭. তিনবার জমিন ধ্বসে যাওয়া,
একবার প্রাচ্যে
৮. আরেক বার প্রতীচ্যে,
৯. আরেকবার আরব ভূমিতে,
১০. ইয়ামন থেকে অগ্নির প্রকাশ যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে ধাবিত করবে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে এডেন থেকে অগ্নি বের হবে যা মানুষকে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে তুফান হবে যা মানুষকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।

(মুসলিম শরীফ)

এই হাদীসখানি বিখ্যাত সাহাবী হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠ-৮৭
তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩২

ঈমান কখন উপকারে আসবে না

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছেন যে, পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত হওয়ার আলামত কি?

তিনি এরশাদ করেছেনঃ সে রাত অনেক সুদীর্ঘ হবে। তা দু' রাতের সমান হবে। মানুষ স্বাভাবিক ভাবে নিজের কাজ কর্মে মশগুল থাকবে। আর তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় করবে। আকাশের তারাগুলো আকাশে স্থবির হয়ে থাকবে। মানুষ ঘুমিয়ে পড়বে। এরপর পুনরায় জাগ্রত হয়ে কাজে মশগুল হবে, এরপর পুনরায় ঘুমিয়ে পড়বে কিন্তু জাগ্রত হয়ে দেখবে যে নক্ষত্র পুঞ্জ স্ব-স্থানেই রয়েছে, সূর্য এখনও ওঠেনি। মানুষের পাঁজরে ব্যথা হবে কিন্তু সূর্য উদিত হবে না। তখন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে সূর্য ওঠার জন্যে। পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে কিন্তু সূর্য হঠাৎ করে পশ্চিমাকাশে উদিত হবে। সে সময় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে কিন্তু তখনকার ঈমান কারোই উপকারে আসবে না। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا.

একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যটি তেলাওয়াত করে এর ব্যাখ্যায় এরশাদ করেছেনঃ এতে পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত হওয়ার কথা রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সর্বপ্রথম কেয়ামতের এ আলামতই দেখা যাবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক পশ্চিমাকাশে একটি বড় দুয়ার খুলে রেখেছেন। যার প্রস্থ হল সত্তর বছরের পথ। এটি তওবার দ্বার। যতক্ষণ পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত না হবে ততক্ষণ এই দ্বার বন্ধ হবে না।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, মানুষের জীবনে এমনি একটি রাত আসবে যা তিন রাতের সমান হবে। এই রাতকে তাহাজ্জুদ গুজার লোকেরা চিনে ফেলবে। তারা দন্ডায়মান হবে এবং নিয়ম মোতাবেক তাহাজ্জুদ আদায় করে শুয়ে পড়বে। এরপর তারা জাগ্রত হবে এবং নিয়ম মোতাবেক আমল করে পুনরায় শুয়ে পড়বে। লোকেরা রাত্রি দীর্ঘ হওয়ার কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করবে এবং দ্রুতবেগে মসজিদের দিকে যাবে। এমন সময় হঠাৎ দেখবে সূর্য উঠেছে পশ্চিমাকাশে। তখন সূর্য মধ্যাকাশ পর্যন্ত এসে ফিরে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবে যেখান থেকে ওঠে সেখান থেকে উঠবে। এটি সেই সময় যখন ঈমান আনলে তা উপকারী হবে না।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ সর্বপ্রথম আলামত হবে পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর "দাব্বাতুল আরদ" নামক বিশেষ জন্তু বের হবে, এর মধ্যে যে আলামতই প্রথমে আসবে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টি আসবে। (মুসলিম)

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩২

দাজ্জালের ফেতনা

হযরত নওয়াস এবনে সামআন (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করেন এবং বলেন, যদি আমার বর্তমানে সে বের হয় তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তার কাজ সমাধা করবো। আর যদি সে সময় আমি না থাকি আর সে বের হয়ে আসে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার নিজের হেফাজতের ব্যবস্থা করে। স্বয়ং আল্লাহ পাকই প্রত্যেক মুসলমানের নেগেহবান।

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাকে পায় তবে সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম আয়াত সমূহ পাঠ করে। দাজ্জালের ফেতনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এ আয়াত সমূহ কার্যকর হবে। দাজ্জাল সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যস্থল থেকে বের হবে। সে ডানে এবং বামে ধ্বংস করে আসবে। হে আল্লাহর বন্দাগণ! তোমরা ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকবে। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! পৃথিবীতে দজ্জালের অবস্থান কাল কত হবে? তিনি এরশাদ করেন, চল্লিশ দিন, তাতে একদিন এক বছরের সমান হবে, একদিন এক মাসের সমান হবে, একদিন এক সপ্তাহের সমান হবে। বাকি দিনগুলো অন্যান্য দিনের মতই হবে। আমি আরজ করলাম যে দিনটি এক বছরের সমান, তাতে কি একদিনের নামাযই হবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ না, তোমরা নামাযের সময়ের আন্দাজ করে নেবে।

আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! দজ্জাল পৃথিবীতে কত দ্রুত চলবে? তিনি এরশাদ করলেন, যেভাবে বাতাস এবং তারপরে বৃষ্টি আসে সেভাবে যখন সে বের হবে তখন কিছু লোক তার প্রতি বিশ্বাস করে ফেলবে, তার হুকুমে আসমান থেকে বৃষ্টিপাত হবে। ফলে জমীনে ফসলাদি উৎপন্ন হবে। তার প্রতি যারা বিশ্বাস করবে তাদের চতুঃষ্পদ জন্তুগুলো মোটা তাজা হবে।

আর কিছু লোককে দাজ্জাল তার প্রতি বিশ্বাস করার জন্যে আহ্বান করবে। কিন্তু তারা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে। যখন সে তাদের এলাকা অতিক্রম করবে তখন তারা অভাবগ্রস্ত হবে। তাদের ধন-সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। তাদের কাছে কিছুই থাকবে না। দাজ্জাল অনাবাদী জায়গায় যাবে এবং জমীনের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত ধন-সম্পদ বের হয়ে তার সঙ্গী হবে। যেমন মধুমক্ষিকা মৌচাকের দিকে যায়। এরপর দাজ্জাল একজন যুবককে ডাকবে এবং তরবারির আঘাতে তাকে দ্বিখন্ডিত করবে এবং তীর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় ততদূরে দুটি ভাগকেই ফেলে দেবে। এরপর সেই যুবককে ফিরিয়ে আনবে। দাজ্জাল এ অবস্থায়ই থাকবে। তখন আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন।

হযরত ঈসা (আঃ) দামেস্কের মসজিদের পূর্ব দিকের সাদা মিনারার পাশে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন তখন তাঁর ঘর্ম বিন্দুগুলো মুক্তার ন্যায় ঝরে পড়বে। আর যখন মাথা তুলবেন তখনও মুক্তার ন্যায় ঘর্ম বিন্দু ঝরবে (চেহারা থেকে)। যে কাফের পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস পৌছবে সে কাফের সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। আর তাঁর নিঃশ্বাস ততদূর পৌছবে যতদূর তাঁর দৃষ্টি শক্তি পৌছবে। তিনি দাজ্জালের অনুসন্ধান করবেন এবং লুদ নামক স্থানের নিকট তাকে পাকড়াও করে হত্যা করবেন। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট এমন কিছু লোক আসবেন

যাদেরকে আল্লাহ পাক দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের ধূলি মলিন চেহারা পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

এরপর আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করবেন যে, আমি এমন কিছু বন্দা সৃষ্টি করেছি, তাদের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা কারোই নেই, তুমি আমার বন্দাদেরকে একত্রিত করে তূর পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাও। এরপর আল্লাহ পাক ইয়াজুজ মাজুজকে প্রেরণ করবেন, যারা প্রত্যেকে উপত্যকার পেছন থেকে বের হয়ে এসে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তাদের সংখ্যা এত বেশী হবে যে তাদের অগ্রভাগের লোকেরা সমুদ্রতীরে পৌঁছে সমস্ত পানি পান করে ফেলবে, তাদের শেষ ভাগের লোকেরা সেখানে পৌঁছে বলবে, এখানে কি পানি ছিল? তারা পৃথিবীতে অশান্তি ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বায়তুল মোকদ্দাসের নিকট পৌঁছে বলবে, আমরা বিশ্ববাসীকে হত্যা করে ফেলেছি, এখন আসমানের অধিবাসীদেরকে হত্যা করতে চাই।

এরপর তারা তাদের ছোট ছোট তীর আসমানের দিকে নিক্ষেপ করবে, আর আল্লাহ পাক তাদের তীরগুলোকে রক্তে রঞ্জিত করে পাঠাবেন (তখন তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে)। (ইয়াজুজ মাজুজের এ হত্যাযজ্ঞের সময়) হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গীগণকে নিয়ে তূর পাহাড়েই অবস্থান করবেন। তখন তাদের নিকট একটি গরুর মাথা এত মূল্যবান হবে যত মূল্যবান বর্তমানে তোমাদের নিকট একশ' স্বর্ণমুদ্রা। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করবেন, তখন আল্লাহ পাক ইয়াজুজ মাজুজদের ঘাড়ের মধ্যে ফোঁড়ার ন্যায় এক প্রকার রোগ সৃষ্টি করবেন, যার কারণে সমস্ত ইয়াজুজ মাজুজ একজন মানুষের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ তূর পাহাড়ের নিম্ন দেশে অবতরণ করবেন। কিন্তু পৃথিবীতে এক বিঘত স্থানও থাকবে না যেখানে মরা পঁচা দুর্গন্ধময় লাশ পড়ে থাকবে না। তখন হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন, ফলে আল্লাহ পাক এক বিশেষ প্রকার পাখী প্রেরণ করবেন, যারা এই গলিত লাশগুলোকে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে নিক্ষেপ করবে। আর মুসলমানগণ ইয়াজুজ মাজুজের ব্যবহৃত তীর, কামান এবং তীরের খাপগুলোকে সাত বছর যাবত ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করবেন। আল্লাহ পাক এমন বৃষ্টি নাযিল করবেন যা সমগ্র পৃথিবীকে ধুয়ে বাগানের মত সুন্দর করে দেবে, মুষলধারে বৃষ্টির কারণে কোন কাঁচা বাড়ীর ছাদ সংরক্ষিত থাকবে না। এরপর জমীনকে আদেশ দেয়া হবে যেন তার অভ্যন্তরের খাদ্য দ্রব্য বের করে দেয়। সে যুগে একটি আনার ফল (এত বড় হবে) তা একটি দলের জন্যে যথেষ্ট হবে। আর আনারের খোসা দ্বারা মানুষ চাঁদোয়া বানাবে। একটি উষ্ট্রির দুধ এক বিরাট দল লোকের জন্যে যথেষ্ট হবে আর একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্যে এবং একটি বকরীর দুধ একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে। এরপর আল্লাহ পাক একটি আনন্দদায়ক বাতাস প্রেরণ করবেন, যা মানুষের বগলের নিম্নদেশকে স্পর্শ করবে। ফলে মোমেন মাত্রেরই রূহ কবজ করা হবে। শুধু দুষ্ট লোকেরাই জীবিত থাকবে যারা পৃথিবীতে অশান্তি দৃষ্টি করবে, যেমন গর্ধভেরা পরস্পর করে থাকে। (মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ)

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দাজ্জাল বের হবে তার সাথে পানিও থাকবে অগ্নিও থাকবে। মানুষ যে বস্তুকে পানি মনে করবে তা হবে জ্বলন্ত অগ্নি, আর যাকে অগ্নি মনে করবে তা হবে সুশীতল পানি। তোমাদের মধ্যে যে তাকে পাবে সে যেন যে বস্তুকে অগ্নি মনে করে তাতে প্রবেশ করবে, কেননা প্রকৃতপক্ষে তা হবে সুমিষ্ট পানি।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, দাজ্জালের সাথে জান্নাত এবং জাহান্নামের নমুনা (অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখের বস্তু সমূহ) থাকবে। দাজ্জাল যাকে জান্নাত বলবে আসলে তা হবে দোযখ।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। মোমেন যখন দাজ্জালকে দেখবে তখন বলবে, হে লোক সকল! এ হল সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেছেন। দাজ্জালের আদেশে তখন ঐ মোমেন ব্যক্তিকে মাথা থেকে করাত দিয়ে চিরে দু'ভাগ করে দেয়া হবে। এরপর দাজ্জাল তার দু'অংশকে একত্র করে বলবে, ওঠ, তখন মোমেন ব্যক্তি জীবিত হয়ে দন্ডায়মান হবেন। দাজ্জাল তখন তাকে বলবে, আমার প্রতি তোমার কি বিশ্বাস হয়েছে? মোমেন বলবেন, তোমার এ কর্মের কারণে আমার দিব্য দৃষ্টি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, নিশ্চয় তুমি দাজ্জাল।

ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ দাজ্জালের সবচেয়ে মারাত্মক ফেতনাগুলোর মধ্যে একটি হবে এই যে, দাজ্জাল আরব দেশের একজন গ্রাম্য লোককে বলবে আমি যদি তোমার মৃত উষ্ট্রিকে জীবিত করে দেই তবুও তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মানবেনা? গ্রাম্য লোকটি বলবে, মানবো। তখন শয়তান উষ্ট্রীর বেশ ধরে তার সম্মুখে আসবে। এক ব্যক্তির ভাই এবং পিতার মৃত্যু হবে। দাজ্জাল তার নিকট এসে বলবে, যদি আমি তোমার পিতা এবং ভাইকে জীবিত করি তবুও কি তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেবে না? সে বলবে অবশ্যই মানবো, সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার পিতা এবং ভ্রাতার আকৃতি ধরে হাযির হবে। (আল হাদীস)

ইমাম মাহদী (আঃ) প্রসঙ্গে

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উপরোল্লিখিত আলামত সমূহের পূর্বে হযরত মাহদীর (আঃ) আবির্ভাব হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি দুনিয়ার বয়স একদিনও থাকে তবুও আল্লাহ পাক সেদিনকে এত সুদীর্ঘ করবেন যে, এক ব্যক্তিকে তিনি প্রেরণ করবেন যে আমার তরফ থেকে হবে। অথবা তিনি এরশাদ করেছেন, সে আমার বংশধরদের মধ্য থেকে হবে। তার নাম আমার নাম এবং তার পিতার নামও আমার পিতার নাম হবে।

(অর্থাৎ সেও হবে মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ)

সে যুগে যেভাবে দুনিয়া অন্যায় অনাচারে পরিপূর্ণ হবে, সেভাবেই সে পৃথিবীকে সুবিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করবে।

ইমাম তিরমিযীর (রঃ) বর্ণনা এরূপঃ দুনিয়া সে পর্যন্ত শেষ হবে না যে পর্যন্ত আরবের মালিক এক ব্যক্তি না হবে যে আমার বংশধরদের মধ্য থেকে হবে আর তার নামও আমার নামে হবে।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একজন খলিফার মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে মতভেদ হবে। তখন এক ব্যক্তি মদীনা শরীফ থেকে পলায়ন করে মক্কা শরীফ চলে যাবে। মক্কার লোকেরা তাকে ঘর থেকে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। আর তার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও লোকেরা রোকন এবং মকামে ইব্রাহীমের মধ্যস্থলে তার হাতে বয়আত করবে। তার নিকট সিরিয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরিত হবে। কিন্তু মক্কা এবং মদীনার মধ্যে "বয়দা" নামক স্থানে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জমীনে ধ্বসিয়ে দেবেন।

লোকেরা যখন এ অবস্থা দেখবে তখন সিরিয়া থেকে আবদালগণ এবং ইরাক থেকে দলে দলে লোক তাঁর হাতে বয়আত করবে। এ ব্যক্তি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্তবায়ন করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলামকে কায়েম করবেন। সাত বছর যাবত তিনি থাকবেন, এরপর তাঁর মৃত্যু হবে। মুসলমানগণ তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করবেন। (আবু দাউদ শরীফ)

আবু দাউদ শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ)-এর দিকে দেখে বলেছেনঃ আমার এই পুত্র সৈয়্যেদ, যেমন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৈয়্যেদ শব্দসহ তাঁর নামকরণ করেছেন। তাঁর বংশে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, যার নাম তোমাদের নবীর নাম হবে। চরিত্র মাধুর্যে সে তোমাদের নবীর ন্যায় হবে। দৈহিক অবয়বে সে তাঁর ন্যায় হবে না। সে যমীনকে ন্যায় বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মাহদীর ঘটনার বিবরণে একথা রয়েছে যে, এক ব্যক্তি ইমাম মাহদীর নিকট এসে বলবে, আমাকে কিছু দান করুন। তখন তিনি তাকে দু'হাতে এতখানি দান করবেন যা সে বহন করতে পারে। (তিরমিযী)

হাকেম মোসতাদরাকে লিখেছেন, আসমান এবং জমীনের অধিবাসীগণ ইমাম মাহদীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হবে। জমীনের ভেতর যা কিছু আছে জমীন তা বের করে দেবে (ফল ও ফসল)। এমনকি তখন জীবিত লোকেরা তাদের মৃত লোকেদের জন্যে আকাঙ্খা করবে (অর্থাৎ একথা বলে আক্ষেপ করবে, আফসোস! যদি তারা এখন পর্যন্ত জীবিত থাকত এবং আমাদের এই সচ্ছলতা দেখত)। এ অবস্থায় ইমাম মাহদী সাত অথবা আট অথবা নয় বছর থাকবেন (এরপর তাঁর মৃত্যু হবে)।

يَوْمَ يَأْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

অর্থাৎ- যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন এসে পড়বে তখন কারো ঈমান তার জন্যে উপকারী হবে না। যদি সে পূর্বে ঈমান না এনে থাকে অথবা ঈমান অনুযায়ী সৎ কাজ না করে থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ যদি কোন লোক মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, নিশ্চিতভাবে দেখতে পায় যে, মৃত্যু এসে গেছে তখন যদি ঈমান আনে তবে সেই ঈমান তার জন্যে উপকারী হবে না। কেননা "ঈমান বিল গায়ব" তথা অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন একান্ত কর্তব্য এবং নাজাত লাভের জন্যে পূর্বশর্ত। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার শুরুতেই এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ.

(অর্থাৎ যারা অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।)

অতএব, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পর অথবা মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পর অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান প্রমাণিত হয় না।

অতএব, যে পূর্বে ঈমান আনেনি, মৃত্যুর সময় ঈমান আনয়ন তার জন্যে উপকারী হবে না। এমনিভাবে যে ঈমান মোতাবেক আমল করেনি সে মুহূর্তের ঈমানও তার জন্যে উপকারী হবে না।

আল্লামা বগবী লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো এমন সময় কাফের ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়না এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তির তওবাও কবুল হয় না।[১]

মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বন্দাগণের তওবা কবুল করার জন্যে হস্ত প্রসারিত করেন যেন দিনে যারা পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছে তারা রাতে যেন তওবা করে ফেলে। আর তিনি রাত্রে হস্ত প্রসারিত করেন যেন দিনে যারা গুনাহ করেছে রাত্রে তারা তওবা করে ফেলে। পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পশ্চিম গগনে সূর্য ওঠার পূর্বে যে তওবা করবে আল্লাহ পাক তার তওবা গ্রহণ করবেন।

আহমদ, দারেমী এবং আবু দাউদ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হিজরত বন্ধ হবেনা যে পর্যন্ত না তওবা বন্ধ হয়। আর তওবা বন্ধ হবেনা যে পর্যন্ত পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত না হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এই হাদীস সমূহের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا. আয়াতাংশে ঈমানের অর্থ তওবা। হযরত আবু

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড ৪, পৃষ্ঠা-২৫০-২৫১

হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামত সে পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত না হয়। যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হবে এবং সকলে তা দেখে নেবে এবং সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু যে ইতিপূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা ঈমানের অবস্থায় কোন নেক কাজ করেনি তার জন্যে ঈমান উপকারী হবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিনটি বিষয় এমন তা যখন প্রকাশিত হবে তার পূর্বে যে ঈমান না আনবে অথবা ঈমানের অবস্থায় কোন নেক আমল না করবে তখন তার ঈমান কোন উপকারে আসবেনা।

আর সেই তিনটি জিনিষ হলঃ

(১) দাজ্জাল

(২) দাব্বাতুল আরদ নামক বিশেষ জন্তু এবং

(৩) পশ্চিম গগনে সূর্য উদিত হওয়া

এই হাদীস দ্বারা জানা যায় আলোচ্য আয়াতাংশে ঈমানের তাৎপর্য হল যে ব্যক্তি সে সময়ের পূর্বে ঈমান না আনবে সে ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কেয়ামতের নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যারা ঈমান আনবেনা তারা যদি পরে ঈমান আনে তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে যার জন্মই হয়েছে কেয়ামতের আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সে স্বাভাবিকভাবেই এরপর প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে তার ব্যাপারে এই হুকুম নয়।

قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ.

অর্থাৎ "(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে মক্কাবাসী! তোমরা অপেক্ষা কর নিশ্চয় আমিও অপেক্ষা করছি"।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এ আয়াতে মক্কাবাসীর জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। অর্থাৎ যখন কেয়ামত কায়েম হবে, সকলের আমলের হিসাব নিকাশ হবে, সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে তখন আমাদের সাফল্য হবে সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত। আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ.

পূর্ববর্তী আয়াতে দ্বীনে হক্ব থেকে যারা বিমুখ হয়, তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এরপর সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসরণের আহ্বান রয়েছে। আর এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা দ্বীন ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে, ফেরকাবন্দী এবং দলাদলি সৃষ্টি করেছে, এভাবে সরল সঠিক পথ পরিহার করে ভ্রান্ত মত ও পথ অবলম্বন করেছে। এ আয়াতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এ মর্মে যে, যারা সত্য দ্বীনে মতভেদ

করে বিভিন্ন বাতিল দলে বিভক্ত হয়েছে, কেউ হয়েছে ইহুদী, কেউ হয়েছে নাসারা, কেউ হয়েছে মূর্তি পূজক, কেউ হয়েছে নক্ষত্র পূজক, (হে রসূল!) আপনাকে এজন্যে চিন্তিত হতে হবেনা, তাদের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, (হে রসূল!) আপনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাদের ব্যাপার একমাত্র আল্লাহ পাকেরই হাতে।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ.

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে তারা হল পৌত্তলিক, তাদের একদল ফেরেশতাদের পূজা করে এবং মনে করে যে ফেরেশতারা হল আল্লাহর কন্যা সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের অন্য দল দেব-দেবীর পূজা করে এবং বলে এরা হল আল্লাহর নিকট আমাদের জন্যে সুপারিশকারী। আর এ অর্থেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكَانُوْا شِيَعًا.

অর্থাৎ (পথভ্রষ্টতায়) তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।

তফসীকার মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে তারা হল ইহুদী এবং নাসারা। কেননা, তারা বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে এবং একে অন্যকে কাফের বলেছে।

এ পর্যায়ে অন্য মত হল এই, যারা দ্বীন ইসলামের কিছু অংশকে গ্রহণ করেছে আর কিছু বর্জন করেছে তাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের হাতে। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে। (হে রসূল!) আপনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, আপনি তাদের থেকে মুক্ত এবং আলাদা।

যারা দ্বীনে হক্ব পরিত্যাগ করে বাঁকা পথ অবলম্বন করেছে তারা হল ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক, বেদআতী যেমন খারেজী, রাফেজী, কাদরীয়া, মুরজীয়া প্রভৃতি বাতিল ফেরকা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা হল আহলে বেদআত সন্দেহবাদী এবং পথভ্রষ্ট লোক।[১]

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ.

অর্থাৎ তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশকে মান আর কিছু অংশকে অমান্য কর?

আরও এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ.....

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭২

অর্থাৎ যারা নামফরমানী করে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলগণের এবং তারা ইচ্ছা করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে আর তারা বলে, আমরা কিছু মানি আর কিছু মানিনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তৃতীয় অভিমত হল তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ)-এর কথা, তিনি বলেছেন, এ আয়াতের যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হল বেদআতী এবং সন্দেহবাদী।

ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের মূল লক্ষ্য হল এ বিষয়ে তাগিদ করা যে মুসলিম জাতি যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে, অভিন্ন অবিচ্ছেদ্য থাকে তাদের মধ্যে যেন ফেরকা বন্দী দলাদলি না হয়, যা ধর্ম নয় তাকে ধর্মের অংশ মনে করে তারা যেন বেদআতী না হয়। এ সম্পর্কেই বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, যারা ফেরকা বন্দী করে আপনি তাদের থেকে মুক্ত, তাদের ব্যাপারে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নেই।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল যারা দ্বীনে হক্বের সঙ্গে নিজের মনগড়া অভিমতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এ অন্যায় কাজ তারা শয়তানের প্ররোচনায় অথবা কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় করেছে। এভাবে হক্ব ও বাতিলকে একত্রিত করে যারা ফেরকা বন্দী করেছে তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)। তিনি এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতে সে সব ঘটনা ঘটবে যা বনী ইসরাইলে ঘটেছিল। বনী ইসরাইলে ৭২ ফেরকা হয়েছিল। আমার উম্মতে ৭৩ ফেরকা হবে। তন্মধ্যে এক ফেরকা ব্যতীত আর সবই দোযখী হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! নাজাত লাভকারী ফেরকা কোন্‌টি হবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ

ما انا عليه واصحابى.

অর্থাৎ যারা আমার এবং আমার সাহাবায়ে কেরামের পথে চলবে। (তিরমিযী)

আহমদ এবং আবু দাউদ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন, তাতে রয়েছে বাহাত্তর ফেরকা দোযখে আর এক ফেরকা জান্নাতে যাবে। আর তা অধিকাংশ লোকের হবে। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতে এমন লোক সৃষ্টি হবে যাদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তির তাড়না এভাবে প্রবেশ করবে যেভাবে কুকুর তার মালিকের সঙ্গে বিভিন্ন গলিতে প্রবেশ করে থাকে। আবু দাউদ, তিরমিযী, এবনে মাজা, এবনে হাব্বান, হাকেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন। ইহুদীদের ৭১ ফেরকা হয়েছিল তন্মধ্যে একটি ব্যতীত সবই দোযখে যাবে। নাসারাদের ৭২ ফেরকা হয়েছিল তন্মধ্যে একটি ব্যতীত সবই দোযখে যাবে। আর আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় ভাগ হবে। তন্মধ্যে একটি ব্যতীত আর সবই দোযখে যাবে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৮
তফসীরে ফাতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮৩

আল্লামা বগভী হযরত ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেনঃ হে আয়েশা! যারা দ্বীনকে খন্ড খন্ড করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে তারাই এ উম্মতে বেদআতী। তিরমিযী এবং এবনে মাজা, হযরত এরবাজ এবন সারীয়া (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযে ইমামতি করেন, এরপর আমাদের দিকে ফিরে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন যা শ্রবণ করে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হই এবং আমাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

তিনি এরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাককে ভয় করার নসিহত করছি আর একথারও নসিহত করছি যে, তোমরা তোমাদের আমীরের আনুগত্য প্রকাশ কর। যদি সে হাবশী গোলাম হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে আমার পরে যে জীবিত থাকবে সে মুসলমানদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখবে কিন্তু তোমরা আমার পথ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ আঁকড়ে ধরে রাখবে সুদৃঢ়ভাবে। দ্বীনে হক্বের উপর জমে থাকবে। নতুন কথা থেকে আত্মরক্ষা করবে। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে নতুন কথা যা হবে তাই বেদআত। আর প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ পাক বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কোরআনে করীম নাযিল করেছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সমূহের শিক্ষার ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করে, তারা সঠিক পথে থাকে। পক্ষান্তরে, যারা নিজের অভিমতকে এর সঙ্গে সংযোজন করে এবং নিজের মতকে প্রাধান্য দেয় তারা নিজের মতে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে এবং সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই বাতিল ফেরকা সমূহ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কোন কোন বাতিল ফেরকা আখেরাতে আল্লাহ পাকের দীদারকে অস্বীকার করে। এমনিভাবে কবরের আযাব, হিসাব নিকাশ, পুলসেরাত প্রভৃতি অস্বীকার করে। অথচ এসব বিষয়ে পবিত্র কোরআনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা আল্লাহর দ্বীনকে ছেড়ে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুতাজিলা ফেরকার কথা বলা যেতে পারে। এ বাতিল ফেরকা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ পাকের কর্তব্য হল সেই কাজ করা যা বন্দাদের জন্যে উপকারী হয়। তারা তকদীরকে অস্বীকার করে। এমনিভাবে তারা গুনাহ থেকে মাগফেরাত লাভও অসম্ভব মনে করে। এমনিভাবে আরো বাতিল ফেরকা রয়েছে যেমন মুরজীয়া, কাদরীয়া প্রভৃতি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের দু' প্রকার লোকের ইসলামে কোন অংশ নেই। তারা হল মুরজীয়া এবং কাদরীয়া। মুরজীয়া ফেরকার আকীদা হল এই যে, তাদের মতে সমস্ত আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার জন্যে শুধু ঈমানই

যথেষ্ট, নেক আমলের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, ঈমান থাকলে গুনাহ কোন ক্ষতি করতে পারে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ছয় প্রকার লোক রয়েছে যাদের উপর আমি লা'নত করেছি এবং আল্লাহ পাকও লা'নত করেছেন, যাঁদের দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন এমন আম্বিয়াগণও লা'নত করেছেন।

১. আল্লাহর কিতাবে পরিবর্ধনকারী।

২. জোর-জবরদস্তি করে যে মানুষের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে এবং আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে অপমানিত করে। আর আল্লাহ পাক যাদেরকে অপমানিত করেছেন তাদেরকে সম্মানিত করে।

৩. আল্লাহর তরফ থেকে হালাল করা বস্তুকে হারাম করে।

৪. আমার বংশধরদের সঙ্গে যে কাজ আল্লাহ পাক হারাম করেছেন তাকে সে হালাল মনে করে।

৫. আমার সুন্নতকে যে পরিত্যাগ করে।

এই হাদীস রাজীন এবং বায়হাকী তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহর কিতাবে পরিবর্ধনকারী ফেরকা হল রাফেজী। তাদের আকীদা হল পবিত্র কোরআন এর চেয়ে বেশী ছিল এখন যা আছে, সাহাবায়ে কেরাম এর কিছু অংশ কমিয়েছেন।

অথচ পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হলো– إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

(নিশ্চয় আমি এই কোরআনের হেফাজতকারী)

রাফেজীদের একথার উপর ঈমান নেই। আর তকদীরকে অস্বীকারকারী হল কাদরীয়া ফেরকা। যারা মানুষকে তার কর্ম তৎপরতার জন্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান মনে করে আর আল্লাহ পাককে বন্দার আমলের স্রষ্টা মনে করেনা। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশধরদের সঙ্গে নিষিদ্ধ ব্যবহারকে হালাল মনে করে খারেজী-ফেরকা। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত পরিত্যাগকারী হল বেদআতীরা যারা নিজেদের খেয়াল খুশি মাফিক চলে এবং কোরআনে করীমের মোতাশাবেহ আয়াত সমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। সলফে ছালেহীন এ আয়াত সমূহের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মানেনা।

এমনি আরো বহু ফেরকা রয়েছে যারা পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত। রাফেজীরা দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে। কেননা, দ্বীন ইসলাম কোরআন, হাদীস এবং এজমার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অথচ তারা পবিত্র কোরআনই পরিত্যাগ করেছে। তারা বলে, হযরত ওসমান (রাঃ) পবিত্র কোরআনের এক চুতুর্থাংশ বাদ দিয়ে দিয়েছেন। আর যা ইচ্ছা বাড়িয়ে দিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। রাফেজীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নতও পরিত্যাগ করেছে। কেননা, তারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে কাফের ও মুরতাদ

বলে (নাউজুবিল্লাহ)। অথচ সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত হাদীসের এলম অর্জন সম্ভব নয়। আর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাকে অস্বীকার করার অর্থ হল হাদীসকে অস্বীকার করা। এর পাশাপাশি তারা তাদের মনগড়া কথা হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ), হযরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রহঃ)-এর নামে প্রচার করে।

وَكَانُوْا شِيَعًا.

অর্থাৎ তারা হয়েছে বহুদলে বিভক্ত, তারা প্রত্যেকে নিজেদের নেতার অনুসারী হয়েছে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কোরআনের এটি একটি মোজেযা যে রাফেজীরা নিজেদেরকে শিয়া বলে, অথচ পবিত্র কোরআনের ভাষায় এই বাতিল ফেরকার ব্যাপারে এর ইঙ্গিত রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَانُوْا شِيَعًا.

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমার সাথে ঈসার অবস্থার কিছু মিল রয়েছে। ঈসার সঙ্গে ইহুদীরা এত শত্রুতা করেছে যে, তাঁর মাননীয়া মাতার প্রতিও তারা অপবাদ দিয়েছে আর খৃষ্টানরা তাঁর প্রতি এত ভক্তি এবং ভালবাসা দেখিয়েছে যে, যে মর্তবা তাঁর ছিলনা তা তাঁকে দিয়েছে অর্থাৎ তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করেছে (নাউযুবিল্লাহ)।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ আমার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দু' দল লোক ধ্বংস হবে।

১. যারা আমার সাথে মহব্বতের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে এবং আমার মধ্যে এমন সব গুণাবলী আছে বলে মনে করে যা আসলে আমার মধ্যে নেই।

২. আমার সাথে যারা দুশমনি রাখে। এ দুশমনীর কারণে তারা আমার প্রতি অপবাদ দিতে থাকে। (আহমদ)

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতে কিছু লোককে রাফেজী বলা হবে। তারা ইসলামকে ছেড়ে দেবে। (বায়হাকী)

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে আমার পরে কিছু লোক হবে যাদেরকে রাফেজী বলা হবে। যদি তুমি তাদেরকে পাও তবে হত্যা করবে। নিশ্চয় তারা মুশরেক হবে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তাদের পরিচয় কি? তিনি এরশাদ করেন, তারা সীমালঙ্ঘন করে তোমার এমন গুণাবলী বর্ণনা করবে যা তোমার মধ্যে নেই। তারা পূর্ববর্তী লোকদের সমালোচনা করবে। (দারেকুতনী)

দারেকুতনী অন্য একটি সূত্রে এই হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে কিছু কথা বেশী আছে– "তারা আমার বংশধরদের সাথে মহব্বতের দাবীদার হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

তারা এমন হবেনা। তাদের পরিচয় হবে এই যে, তারা আবুবকর (রাঃ) এবং ওমরকে (রাঃ) গালি দেবে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ পর্যায়ের আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

"আসসায়ফুল মাছলুল" নামক গ্রন্থে ঐ হাদীস সমূহের উল্লেখ রয়েছে।[১]

إِنَّ الَّذِينَ

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ যে কেউ আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলের দ্বীনের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি এবং ফেরকাবন্দী করে এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে নতুন দ্বীন অবলম্বন করে এবং নতুন মাজহাব আবিষ্কার করে, সে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে সতর্কবাণী রয়েছে তার ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে। কেননা, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা একটিই, একাধিক নয়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রসূলকে ফেরকবন্দী থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর দ্বীনেরও হেফাজত করেছেন। অতএব, আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় দ্বীন হল তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করা। এছাড়া যা কিছু আছে সবই মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতা।[২]

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী রুকুর কয়েকটি আয়াতে বহু বিধি-নিষেধ প্রদানের পর ঘোষণা করা হয়েছেঃ

অর্থাৎ এটিই হল সরল সঠিক পথ, সিরাতুল মুস্তাকীম, তোমরা সকলে এ পথেরই অনুসরণ কর। এখানে উল্লেখ্য, সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ চিরদিনই এক, তথা সুপথ বা সৎ পথ সর্বদা একটিই থাকে আর পথভ্রষ্টতা বা বিপথ একাধিক। হযরত আদম (আঃ) থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীগণ মূলতঃ একই নীতির অনুসারী ছিলেন, তাঁরা সকলেই আল্লাহ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রচার করে গেছেন। আর এজন্যেই পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

অর্থাৎ রসূলগণের কারো মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করিনা। মূলতঃ দ্বীন ইসলামের মূল নীতি চিরদিনই এক, তবে স্থান-কাল-পরিবেশ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে হয়ত শাখা-প্রশাখায় কোন পার্থক্য পলিক্ষিত হতে পারে কিন্তু এ পার্থক্য মৌলিক নয়, অমৌলিক, মূখ্য নয় গৌণ।

এখানে একথা প্রনিধানযোগ্য, মূল এক হলেও ক্ষেত্র বিশেষে একই পন্থায় সর্বদা উদ্দেশ্য সফল হয় না। আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। একই বীজ এবং একই মূল হওয়া সত্ত্বেও স্থান কাল এবং আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে ক্ষেত্র বিশেষে গাছে গাছে বা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫২-৫৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৪

ফলে আকার-আকৃতিতে বা স্বাদে গন্ধে পার্থক্য দেখা দেয়। আরও লক্ষ্যণীয় এই যে, বীজ এবং ফল এক হওয়া সত্ত্বেও কোথাও ভালভাবে গাছও জন্মায় না। কোথাও গাছ জন্মায় কিন্তু ফল ধরেনা অথবা এমনও হয় যে, কিছুদিন ফল ধরার পর ঐ বৃক্ষ ফল ধারণে আর সক্ষম হয় না। ঠিক তেমনি পূর্ববর্তী কালের পয়গম্বরদের শরীয়তের মূলনীতি এক হওয়া সত্ত্বেও স্থান-কাল এবং পরিবেশের পার্থক্যের কারণে দ্বীনের শাখা-প্রশাখায় কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আরো লক্ষ্যণীয়, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর এবং পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তিম কালে খৃষ্টীয় ধর্ম নাজাতের ফল প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এজন্যে পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পূণ্য পন্থার অনুসরণের তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, যারা ধর্মের মূল নীতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ আবিষ্কার করে এবং জাতীয় জীবনে ফেরকাবন্দীর অভিশাপ ডেকে আনে তারা ইহুদী হোক বা খৃষ্টান, কাদরীয়া হোক বা জাবরীয়া, রাফেজী হোক বা মুরজীয়া তারা ইসলামের দাবীদার হলেও ঈমানদার নয়।[১] তাই আলোচ্য আয়াতের শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

(হে রসূল!) যারা ফেরকাবন্দী করে তাদের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই আর তাদেরও কোন সম্পর্ক আপনার সাথে নেই। আপনি সরল সঠিক পথে অবিচল থাকুন।

إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ.

তাদের ব্যাপার আল্লাহ পাকের উপর ছেড়ে দিন, তাদের শাস্তি এবং প্রতিদানের বিষয় আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। তারা হক্ব বা সত্য পথ থেকে যত দূরে থাকবে তাদের শাস্তি তত বেশী হবে।

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

অতঃপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, সর্বপ্রথম তাদেরকে ফেরকাবন্দী করার এবং আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ব্যাপারে শাস্তি দেয়া হবে। এরপর তাদেরকে তাদের পাপাচারের শাস্তি দেয়া হবে।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে দ্বীন এর অর্থ হল দ্বীনে ইব্রাহীম আর দ্বীনকে খন্ড খন্ড করার তাৎপর্য হল দ্বীনকে পরিত্যাগ করা যেমন, ইহুদী নাসারারা তাই করেছে। ঠিক এভাবে মুসলমানদের মধ্যে যারা বাতিল ফেরকা রয়েছে যেমন জাবরীয়া, কাদরীয়া, রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি, তারাও তাই করেছে।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা-১৯৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৭

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে দুপুর বেলা হাযির হলাম। তখন দু' ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরস্পর ঝগড়া করছিল। তাদের উচ্চস্বর শ্রবণ করে তিনি বাইরে তাশরীফ আনলেন, চেহারা মোবারকের মধ্যে তখন ক্রোধের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তখন তিনি এরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

(মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা আল্লাহ পাকের কিতাবের ব্যাপারে কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য এখানে কথা হল যারা দ্বীনের মূল নীতিতে পার্থক্য করে তাদের উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমাম মুজতাহেদীনের মধ্যে যে মতভেদ হয়েছে তা এর আওতায় পড়ে না। কেননা এই এখতেলাফ হল রহমতের এখতেলাফ। যেমন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের মূল নীতিতে এক এবং অভিন্ন মত পোষণ করতেন। এমনিভাবে আইম্মায়ে মুজাতাহেদীনও দ্বীনের মূল নীতিতে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। শুধু শাখা প্রশাখা পর্যায়ে বা কর্ম পদ্ধতিতে তাঁরা একাধিক মত পোষণ করেছেন। আর তাতে কোন দোষ নেই। এজন্যেই ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যেন মুসলমানগণ আকিদা এবং বিশ্বাসে এক এবং অভিন্ন থাকে। দ্বীনের ব্যাপারে দলাদলি না হয় এবং বেদআতের অনুপ্রবেশ না ঘটে।[১]

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

পূর্ববর্তী আয়াতে বিভ্রান্ত লোকদের ভয়াবহ পরিণাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে নেককারদের সওয়াব এবং বদকারদের শাস্তির কথা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ যে ব্যক্তি কোন নেক আমল নিয়ে আসবে তাকে কমপক্ষে তার দশগুণ সওয়াব দেয়া হবে। আর এর চেয়ে বেশী কত হবে তার সীমা নির্দৃষ্ট করা হয়নি। দশগুণ কমপক্ষে আর দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তার চেয়েও বেশী দান করে থাকেন। কোন একটি নেকীর সওয়াব দশগুণ হওয়ার তাৎপর্য হল ঐ ব্যক্তি যেন নেক কাজটি দশবার করেছে, এটি হল আল্লাহ পাকের দানের একটি নমুনা, তিনি ইচ্ছা করলে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ.

"আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করেন"।

এর দ্বারা সুফিয়ায়ে কেরাম একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রমাণ করেছেন। যখন প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হবে বলে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে আর একথা

১। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭২

সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ পাকের মহব্বত এবং তাঁর মহান দরবারে হাযিরীর আকাঙ্খার চেয়ে বড় কোন নেক আমল নেই। তাই আল্লাহর যে সব প্রেমিক বন্দাগণ তাঁর দীদার হাসিলের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এবং জীবনকে আল্লাহর প্রেমের সাধনায় উৎসর্গ করেছেন তাদের মর্তবা কত উচ্চ হবে তা বর্ণনাতীত। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে যে তাঁর দীদার নসিব করবেন, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

পক্ষান্তরে, যে একটি গুনাহর কাজ করবে সে এই একটি মন্দ কাজের নিদৃষ্ট শাস্তিই ভোগ করবে।

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

বরং যদি ভাগ্য সু-প্রসন্ন হয় তবে একেবারে মাফও হতে পারে। যেখানে করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত, অপার করুণা রয়েছে সেখানে কারো প্রতি অবিচার করার প্রশ্নই আসেনা তাই আলোচ্য ব্যাক্যাংশে এরশাদ হয়েছে– "তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না"।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ নেক আমলের সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে, আর কম পক্ষে দশগুণ সওয়াব দেয়া হবে। কোন লোককে সত্তর গুণও দেয়া হবে। এমনকি, আল্লাহ পাক যার জন্যে ইচ্ছা করবেন, তার জন্য সাতশ' গুণ পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধি করবেন। সওয়াব বৃদ্ধির মানদন্ড হল আমলকারীর এখলাস। আমলকারীর নিয়তে এখলাস যত বেশী থাকবে, তার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর নিয়ত হল মানব মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের কথা। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকই সর্বাধিক অবগত, তাই তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বহুগুণে সওয়াব বৃদ্ধি করে দেবেন।

এ মর্মে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নিজের ইসলামকে অত্যন্ত সুন্দর করে নেবে (অর্থাৎ অতি উত্তমভাবে ইসলামের বিধি-নিষেধের উপর আমল করবে)। এমন অবস্থায় যদি সে একটি নেক আমল করে তবে তার দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করে তবে তার আমলনামায় ঐ একটি মন্দ কাজই লিপিবদ্ধ হবে। অবশেষে সে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে।

উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, বহুগুণে সওয়াব বৃদ্ধির ব্যাপারটির সম্পর্ক রয়েছে ইসলামের সৌন্দর্যের সঙ্গে। আর ইসলামের সৌন্দর্যের একটি মাত্র পন্থা রয়েছে তা হল আত্মসংশোধন তথা মনের পবিত্রতা অর্জন। এর সম্পর্ক হল এখলাসের সঙ্গে। যখন মানুষ আত্মসংশোধন করে তথা মনের পবিত্রতা অর্জন করে এক কথায় শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমল করে, তখনই তার মধ্যে এখলাস পয়দা হয়। আর এখলাসের মর্তবা যত বৃদ্ধি পাবে আমলের সওয়াবও তত বৃদ্ধি পাবে।

নেক আমলের সওয়াব বৃদ্ধি পাওয়ার এ ঘোষণার আরেকটি তাৎপর্য হল অতীতের উম্মতগুলোর নেক আমলের যে সওয়াব নিদৃষ্ট করা হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে তার চেয়ে দশগুণ বেশী দেয়া হবে।

হযরত আবুদারদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলবো যা তোমাদের সকল আমলের থেকে উত্তম এবং যা তোমাদের মালিকের নিকট পবিত্রতর এবং যা তোমাদের মর্তবাকে সর্বাধিক বৃদ্ধিকারী এবং যা স্বর্ণ রৌপ্য দান করার চেয়েও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী এবং যা জেহাদে দুশমনের মোকাবেলা করে দুশমনকে নিপাত করলে বা নিজেকে উৎসর্গ করলে যে সওয়াব পাওয়া যায় তার চেয়েও উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, অবশ্যই বলুন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তা হল আল্লাহ পাকের স্মরণ। (এবনে মাজাহ-তিরমিযী-আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর জিকরের চেয়ে উত্তম কোন সদকা নেই।[১]

قُلْ إِنَّنِي
هَدٰىنِي رَبِّي إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيمَ
حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِي رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۚ ثُمَّ إِلٰى
رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِي مَآ ءَاتٰىكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬০-৬২

তরজমা

(১৬১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, তা হল সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্রাহীমের আদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

(১৬২) (হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার সকল এবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই।

(১৬৩) তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম।

(১৬৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য প্রতিপালককে খুঁজতে যাব? অথচ তিনিই সব কিছুর পালনকর্তা। প্রত্যেকে স্বীয় কর্মকান্ডের জন্যে দায়ী এবং কেউ অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। এরপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করেছিলে সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

(১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিনিধি করেছেন, তোমাদের কিছু লোককে অপরের উপর তিনি মর্যাদায় উন্নত করেছেন যেন তিনি তোমাদেরকে যা দান করেছেন তার ব্যাপারে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অতি সত্ত্বর আযাব দেন আর নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদের দলিল সমূহ বর্ণিত হয়েছে এবং মুশরেকদের বাতিল আকীদার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্বরতার যুগের পথভ্রষ্টতা এবং মূর্খতার ঘন অন্ধকার দূরীভূত করে সত্য ও ন্যায়ের পথ তথা সরল সঠিক পথ অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ পাক এ নির্দেশ দিয়েছেন (হে রসূল!) আপনি বলুন–

قُلْ إِنَّنِي هَدٰنِي رَبِّي إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে হেদায়েত করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হেদায়েত আল্লাহর তৌফিক ব্যতীত সম্ভব নয়।[১]

যারা সত্য দ্বীনকে, সরল সঠিক পূণ্য পন্থাকে পরিহার করে পথভ্রষ্ট হয়েছে, দ্বীনে বাড়াবাড়ি করে বিভিন্ন বাঁকা পথ অবলম্বন করেছে এবং ফেরকাবন্দীর শিকার হয়েছে, তাদের বিভ্রান্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে সূরা আনআমের এই ছয়খানি আয়াতের মধ্যে। প্রথম তিন খানি আয়াতে সরল সঠিক পথের তথা দ্বীনে হক্বের মৌল নীতি সমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দু' আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি বলুন যে, আমার

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১০

প্রতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের ন্যায় নিজের খেয়াল খুশি মোতাবেক কোন ধর্ম অবলম্বন করিনি। অথবা পূর্ব পুরুষদের ঘৃণে ধরা কথার অনুসরণও করিনি; বরং আমার প্রতিপালক স্বয়ং আমাকে পথ-নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে "রব" শব্দটির উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু তিনি পালনকর্তা তাই তাঁর শান হল এই যে তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। অতএব, তোমাদেরও উচিত স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করা। আর এতেই রয়েছে তোমাদের সমূহ কল্যাণ।

দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا.

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত এই জীবন-বিধান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সু-প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যক্তির খেয়াল খুশি বা চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি নয় এই জীবন-বিধান, বরং এটি আল্লাহ পাক প্রদত্ত জীবন-বিধান আর আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন-বিধান। আর এটি কোন নতুন কিছু নয়; বরং পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামেরও এটিই ছিল ধর্ম। বিশেষতঃ এ পর্যায়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নামোল্লেখ করা হয়েছে এজন্যে যে, দুনিয়ার সকল ধর্মাবলম্বীগণ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। ইহুদী, নাসারা বা আরবের পৌত্তলিকরা পরস্পরের মধ্যে যত বিরোধিতাই থাকুক না কেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আজমত এবং শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলেই একমত। নেতৃত্বের এ উচ্চ মর্তবা বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ পাকই তাঁকে দান করেছেন। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا.

"নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম নির্বাচিত করবো"। আর এ কারণেই তদানীন্তন কালের প্রত্যেকটি দল বা ফেরকা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো যে আমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী। আমরাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনাদর্শের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত। বাতিল ফেরকাগুলোর এ ভুল ধারণা নিরসন-কল্পেই ঘোষণা করা হয়েছে তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো এবাদত করতেন না, তিনি শেরক করতেন না।

তিনি ছিলেন তৌহিদের আহ্বায়ক। তিনি মুশরেক ছিলেন না। মানবতার কলঙ্ক পৌত্তলিকতার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। এটিই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। তোমরা যখন শেরক বা পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছ, ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে এবং আরবের পৌত্তলিকরা অগণিত পাথর এবং দেব-দেবীকে আল্লাহর শরীক মনে করেছে এমন অবস্থায় তোমাদের একথা বলার অধিকার নেই যে, তোমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী। এ অধিকার শুধু এবং শুধু মুসলমানদেরই কেননা, মুসলিম জাতিই সর্বপ্রকার শেরক এবং

কুফর থেকে মুক্ত। এটিই মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার সকল এবাদত এবং আমার জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি, আমার মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আলোচ্য আয়াতে نسك শব্দটির অর্থ একাধিক। শব্দটি কোরবাণীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। হজ্জের যাবতীয় কাজকেও نسك শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। এতদ্ব্যতীত, এই শব্দটি এবাদতের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এই হিসেবে ناسك অর্থ আবেদ বা এবাদতকারী। এখানে সকল অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন থেকে এই সকল অর্থই বর্ণিত হয়েছে তবে আয়াতের বর্ণনা-শৈলীর প্রতি লক্ষ্য করলে نسك শব্দটি এবাদত অর্থে গ্রহণ করা অধিকতর সমীচিন মনে হয়। অর্থাৎ আমার নামায, আমার সকল এবাদত এবং আমার সারা জীবন এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড এমনকি, আমার মরণ পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম নামাযের উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা নামায হল সকল নেক আমলের প্রাণ, দ্বীন ইসলামের খুঁটি এবং বন্দা ও মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম এবং নামায হল হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্বের প্রতীক। এরপর সংক্ষিপ্তভাবে সকল এবাদতের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর সারা জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে মৃত্যুর কথাও বলা হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ বল আমাদের সব কিছু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই, যাঁর কোন শরীক নেই আর এটিই হল পরিপূর্ণ ঈমান, প্রকৃত ঈমান। মানুষ যখন তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি স্তরে এ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখে এবং এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বন্দা, আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের দান। অতএব, আমার দ্বারা কোন ভাবেই যেন আল্লাহ পাকের কোন নাফরমানী না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। মানুষ যদি এই মোরাকেবা করে তবে সে খাঁটি মানুষ হতে পারে। পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, আত্ম সংশোধনের মাধ্যমে আত্মোন্নতি লাভ করতে পারে।

তফসীরে দূররে মনসুরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমার মন চায় যেন প্রত্যেক মুসলমান এ আয়াতকে বার বার পাঠ করে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করে। এরপর

وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ- আমাকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি একথার অঙ্গীকার করি আর আমি সর্বপ্রথম মুসলমান, আল্লাহ পাকের প্রতি যারা অনুগত হয় আমি

তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম মুসলমান। কেননা প্রত্যেক উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলমান স্বয়ং সেই নবী বা রসূল হন, যাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়।

এতদ্ব্যতীত, এ বাক্য দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। এরপর আসমান জমীন ও অন্যান্য সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে–

اول ما خلق الله نورى

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।[১]

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন নিরঙ্কুশ তৌহিদের কথা। আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য প্রকাশের কথা এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতার কথা। দ্বিতীয়তঃ এতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিদৃষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মানব জীবনের সকল সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা।

তৃতীয়তঃ এতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে মিল্লাতে ইব্রাহীমের একমাত্র অনুসারী মুসলিম জাতি আর কেউ নয়।

এতদ্ব্যতীত, এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু তাঁর উম্মতের মধ্যেই নন, বরং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান, একথাও আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছেঃ

كُنْتُ نَبِيًّا وَّادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ.

অর্থাৎ-আদম যখন ছিলেন আত্মা এবং দেহের মাঝে, তখন থেকেই আমি নবী। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী ছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বমানবের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান। সময় এবং মর্যাদা উভয় দিক থেকেই তিনি প্রথম। সময়ের দিক থেকে তিনি যেমন সবার আগে ঠিক তেমনি মর্যাদার দিক থেকেও তিনি সবার উপরে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশেষ নবী।

প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি সর্বপ্রথম নবী হলে সর্বশেষ নবী হবেন কি করে?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর জবাব দিয়েছেনঃ

كنت اول النبيين فى الخلق واخرهم فى البعث.

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৫৩-৫৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহ.) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৭১

অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আমি সর্বপ্রথম আর পৃথিবীতে প্রেরণের ব্যাপারে আমি সর্বশেষ, তাই তিনি সর্বপ্রথম নবী আর সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। কেননা, তিনি নিজেই বলেছেনঃ

انا نبيُّ الانبياء

অর্থাৎ-আমি নবীগণেরও নবী।

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ.

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হল জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ পাক অর্থাৎ তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ঈমান এবং আনুগত্য যার উপর আমি জীবিত আছি এবং যার উপর আমার মৃত্যু হবে সবই আল্লাহ পাকের জন্যে। অথবা محياى অর্থ হল জীবনের সকল এবাদত যেমন নামায, রোজা আর ممات অর্থ সেই আনুগত্য যা মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কীয় যেমন, ওসীয়ত।

অথবা এর অর্থ হল জীবনের সকল বন্দেগী এক আল্লাহ পাকের জন্যে। আর মৃত্যুর পর তার সওয়াবও আল্লাহ পাকের নিকটই।

অথবা এর অর্থ হল নেক আমলের সঙ্গে জীবন-যাপন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, যাঁর কোন শরীক নেই আর এই অংগীকার করার আদেশ আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পেয়েছি, আর আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছি এবং এজন্যে তোমাদেরকেও আহ্বান করছি।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.

কোরায়শ বংশের পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বারে বারে অনুরোধ করত যে, আপনি আমাদের ধর্মে ফিরে আসুন। তার জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনি বলুনঃ আমি কি আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে খুঁজবো? অথচ তিনিই সব কিছুর মালিক, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা। এতদসত্ত্বেও কি তাঁর এবাদতে আমি অন্য কাউকে শরীক করবো? তা সম্ভব নয়। মনে রেখ, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা আর সবই তাঁর সৃষ্টি। অতএব, কোন সৃষ্টি উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। অতএব, এমন অন্যায় আশা আমার নিকট করোনা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬০-৬১

আল্লামা বগভী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, ওলিদ এবনে মুগিরা নামক এক ব্যক্তি মুসলমানদেরকে বলতো তোমরা আমার অনুসরণ কর, যদি এতে কোন গুনাহ হয় তবে তার দায়িত্ব আমি নিলাম অর্থাৎ এর কারণে যদি কোন শাস্তি হয় তবে সে শাস্তি তোমাদের পক্ষ থেকে আমি একাই ভোগ করবো। একথার জবাবেই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেন–

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا.

অর্থাৎ তোমাদের কথা অত্যন্ত ভুল, প্রত্যেককেই তার নিজের কর্মকাণ্ডের জন্যে দায়ী হতে হবে। প্রত্যেকের যাবতীয় পাপাচারের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। একের বোঝা অন্যকে বহন করতে দেয়া হবে না। তোমাদের কথা অত্যন্ত অবাস্তব এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের অন্যত্র কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ.

"প্রতিটি মানুষকে তার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে"।

যদি কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করে তবে এর ভয়াবহ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, দুনিয়াতে যেমন অন্যায় করে একজন এবং তা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করা হয় আখেরাতে তা সম্ভব নয়। আখেরাতে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের জন্যে পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

মনে রেখো, অবশেষে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ তোমাদের সকলকে কেয়ামতের দিন দরবারে এলাহীতে হাযির হতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন যে সম্পর্কে তোমরা মতবিরোধ করতে। অর্থাৎ কে হক্বের উপর ছিল আর কে বাতিল পন্থী ছিল এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেয়ামতের দিন হবে এবং প্রত্যেককে তার আকীদা বিশ্বাস এবং আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি দেয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْأَرْضِ.

তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি স্বরূপ নিয়োগ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে অন্যদের স্থলবর্তী করেছেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ এতে খেতাব করা হল উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে এ মর্মে যে, হে উম্মতে মোহাম্মদীয়া! পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ধ্বংসের পর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী বানিয়েছে। خَلٰٓئِفَ শব্দটি বহুবচন হল খলিফার, আর খলিফা শব্দের অর্থ হল স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতি সমূহের স্থলে আবাদ করেছেন। পূর্বে পৃথিবীতে যারা ছিল আল্লাহ পাক তাদেরকে বিদায় করে দিয়ে তোমাদেরকে এখানে বসিয়েছেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

(অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে নিয়োগ করেছি। তোমরা কেমন আমল কর, তা আমি দেখতে চাই) বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক ব্যক্তি, দল, সমাজ এবং জাতির আমল দেখেন। সবই তাঁর নখদর্পণে, পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। যারা সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করে তাঁর শুভ পরিণতি তারা লাভ করে। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে তারা নিজেদের শাস্তির ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে।

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ.

আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, যেন তিনি যা দান করেছেন তার ব্যাপারে তোমাদের পরীক্ষা করেন। দুনিয়াতে কেউ আমীর, কেউ ফকীর, কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর, কেউ আলেম, কেউ জাহেল, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, কেউ ভদ্র, কেউ অভদ্র, কেউ বুদ্ধিমান, আর কেউ নির্বোধ। এভাবে পরস্পরের উপর পরস্পরকে মর্যাদা সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে করে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন। যাকে নেয়ামত দেয়া হয়েছে সে নেয়ামতের শোকর আদায় করে কি-না, শোকর গুজারীর ব্যাপারে তার পরীক্ষা করা হয়। আর যাকে বিপদগ্রস্ত করা হয়েছে সে সবর অবলম্বন করে কিনা, তার পরীক্ষা নেয়া হয়। অতএব, রিয্ক, দৌলত, মর্যাদা-সম্মান এসব কিছু হল পরীক্ষার বিষয়। গৌরবের বিষয় নয়। শোকর এবং সবরের বিষয়। যে নেয়ামতের জন্য শোকর আদায় করে আল্লাহ্ পাক তার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ...

যদি তোমরা শোকর আদায় কর তবে তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি তোমরা না-শোকরী কর তবে মনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। আর যাদের সবেরর পরীক্ষা করা হচ্ছে তারা যদি সবর করে তবে তারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থাৎ-আল্লাহ্ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। যারা সবর অবলম্বন করে তারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়।

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

নিশ্চয় আপনার প্রভূ অতি সত্ত্বর শাস্তি প্রদানকারী। এ ঘোষণা তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ এবং নাফরমান।

অতএব, আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা নাফরমানদের শাস্তি বিধান করেন। আর নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। যারা নাফরমানী ও পাপাচারের পর খাঁটি অন্তরে

তওবা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন। কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল আর তিনি অত্যন্ত দয়াবান। যারা আল্লাহর নেককার বন্দা, তাদের জন্যে সর্বদাই রয়েছে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া মায়া। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে ক্ষমার সম্পর্ক আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সাথে করেছেন। কিন্তু শাস্তির ঘোষণার সম্পর্ক নিজের সাথে করেননি। কেননা, আল্লাহ পাক মূলতঃ অত্যন্ত দয়াবান, অতীব ক্ষমাশীল, তিনি সর্বদা দয়ামায়া করেই থাকেন। সারা পৃথিবীই তাঁর দয়া মায়ার জীবন্ত নিদর্শন। কিন্তু ন্যায়বিচার কায়েমের প্রয়োজনে কোন কোন সময় অবাধ্য অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহীকে শাস্তিও দিতে হয়। তাই শাস্তির কথাও ঘোষণা করেছেন। অতএব, আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা সাবধান থাকা কর্তব্য আর তাঁর দরবার থেকে ক্ষমা লাভের জন্যে কৃত অন্যায়ের কথা স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য। আর আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া মায়া লাভের জন্যে সত্য-সাধনায় এবং কল্যাণকর কাজে তথা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকা কর্তব্য।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১০ই জুন রোজ রোববার ১৯৯০ মোতাবেক ১৬ই জিলক্বদ ১৪১০ হিজরী বেলা ১টায় সূরা আনআ'মের তফসীর শেষ হল। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, এভাবে পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশের তফসীর সম্পূর্ণ হল।

হে আল্লাহ! এ মহান কাজ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন এবং এই তফসীরকে কবুল করুন। তফসীরে নূরুল কোরআনের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের আলো বিচ্ছুরিত করুন এবং বিশেষ রহমত এবং দয়ায় আমাদের এই সাধনাকে কবুল করে মাগফেরাত দান করুন এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ শাফায়াত নসীব করুন এবং এ মহান তফসীর গ্রন্থকে আমার জন্যে এবং আমার পিতা-মাতার জন্যে এবং সকল সন্তান-সন্ততির জন্যে ও ভাই বোনদের জন্যে বিশেষভাবে এবং সাধারণতঃ সকল মুসলমানের জন্যে হেদায়েতের মাধ্যম ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আরাফ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের নামে

সূরা আরাফ প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ২০৬ আয়াত এবং ২৪ রুকু রয়েছে। এ সূরার ৮ খানি আয়াত وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ থেকে وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ পর্যন্ত মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার এবং তার অনুসরণের কথা ছিল, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ

আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের আলোচনা দ্বারা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

الٓمّٓصٓ. كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ.

এতদ্ব্যতীত, বিগত সূরায় তওহীদের বিবরণ ছিল অধিকতর, আর এ সূরায় রেসালত বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে অধিক পরিমাণে। এ সূরার শুরুতে হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত লুত (আঃ) এবং হযরত শোয়ায়েবের (আঃ) ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের উম্মতের অন্যায় আচরণের শাস্তি স্বরূপ তাদের প্রতি আল্লাহ্র যে আযাব আপতিত হয়েছিল, তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ জানতে পারে যে, নবী রসূলগণের বিরোধিতার পরিণতি কত ভয়াবহ হয়। এরপর হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ফেরাউনের সাথে তাঁর যে মোকাবেলা হয়েছে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশেষে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক মানব জাতি থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে যা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। এরপর এ সূরার শেষে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণের তাগিদ রয়েছে।

اٰيَاتُهَا ٢٠٦ (٧) سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ (٣٩) رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ
مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط قَلِيْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا
اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ
قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ
وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا
غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾

তরজমা

(১) আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ।

(২) (হে রসূল!) আপনার নিকট কিতাব নাযিল করা হয়েছে আপনার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে। এর দ্বারা আপনি যেন মানুষকে সতর্ক করেন, আর মোমেনদের জন্যে এটি হলো নসিহত।

(৩) তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকের অনুসারী হয়োনা। তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।

(৪) কত জনপদকে আমি নিপাত করে দিয়েছি, আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, রাত্রি কালে অথবা দ্বিপ্রহরে, যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।

(৫) আমার আযাব যখন তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের কথা শুধু এটিই ছিল যে, "নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম"। অতএব, যাদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো এবং অবশ্যই রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করবো। এরপর আমার জ্ঞান দ্বারাই তাদের নিকট তাদের কার্যাবলী বর্ণনা করবো। আর আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না।

الٓمٓصٓ

আলিফ, লাম, মিম, সোয়াদ। এ অক্ষরগুলো সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে আমরা আলোচনা করেছি, তাই এ সম্পর্কে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।[১]

অবশ্য এক্ষেত্রে الٓمٓصٓ এর অর্থ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রায় সকল তফসীরকারগণ। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ অক্ষর গুলোর অর্থ বলেছেন ঃ

أنا الله أفضل

আমি আল্লাহই উত্তম। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

أنا الله أعلم وأفضل.

আমি আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।

আল্লামা আলুসী (রঃ) পূর্বোল্লেখিত কথাগুলোর বিবরণ দেয়ার পর আরো লিখেছেনঃ তফসীরকার যাহ্যাক বলেছেন, এর অর্থ হল–

انا الله الصادق

আমি আল্লাহই সত্যবাদী। আর মুহম্মদ এবনে কা'বুল কারযী বলেছেনঃ এ অক্ষরগুলোর মধ্যে আলীফ এবং লাম আল্লাহ শব্দ থেকে এবং মিম রহমান শব্দ থেকে এবং সোয়াদ সামাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার এ অক্ষরগুলোর আরো অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাকই এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী।[২]

فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

(হে রসূল!) এই কিতাব পবিত্র কোরআন আপনার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে যেন তা দ্বারা আপনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং মোমেনদের জন্যে এই কিতাব হলো নসিহত। অতএব, (হে রসূল!) আপনার মন যেন এই কিতাবের প্রচারে সংকীর্ণ না হয় তথা এর প্রচারে আপনি কোন প্রকার সংকোচ বোধ করবেন না।

আলোচ্য আয়াতে حَرَجٌ শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হল সংকীর্ণতা, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। حرج শব্দটির আভিধাণিক অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই যে, "(হে রসূল!) এই কিতাব পবিত্র কোরআন পরিবেশনে আপনি কোন প্রকার ভয় বা ইতঃস্তত করবেন না। কেননা

১। তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃঃ ১৯৩
১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃঃ ৭৪

আমিই আপনার হেফাজতকারী তথা আপনার হেফাজতের দায়িত্ব আমার। যারা বিদ্বেষপরায়ণ, যারা জালেম তাদের অন্যায় আচরণের কারণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কারণে পবিত্র কোরআনের প্রচার বা পরিবেশনে আপনি কখনও পিছপা হবেন না। তাই তফসীরকার আবুল আলীয়া বলেছেনঃ পবিত্র কোরআনের প্রচারে মানুষের অন্যায় আচরণের ভয় যখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় সে অবস্থাকে حرج শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ কষ্ট দেবে বা বিরোধিতা করবে এ ভয়ে (হে রসূল!) আপনি পবিত্র কোরআনের প্রচারে ইতঃস্তত করবেন না, বরং পবিত্র কোরআনের প্রচারের ক্ষেত্রে আপনি কাউকে ভয় করবেন না। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহর কিতাবের যে হক্ব আপনার প্রতি রয়েছে, তা সঠিকভাবে এবং পূর্ণভাবে আদায় না করার আশঙ্কা আপনি করবেন না। এ কাজটি যত কঠিনই হোক না কেন আমি আপনার জন্যে সহজ করে দেব এবং আপনাকে পবিত্র কোরআনের প্রচারের হক্ব আদায়ের তৌফিক দান করবো।[১]

অথবা এর অর্থ হল (হে রসূল!) আপনি পবিত্র কোরআনের প্রচারে এ মর্মে ভয় করবেন না যে, কাফেররা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে এবং আপনাকে তারা কষ্ট দেবে। কেননা আল্লাহ পাকই আপনাকে রক্ষা করবেন এবং তিনিই আপনার সাহায্যকারী।

অথবা এর অর্থ হল (হে রসূল!) আপনি এজন্যে মনক্ষুণ্ন হবেন না যে, কাফেররা আপনার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঈমান আনেনি এবং আপনার ডাকে সাড়া দেয়নি কেননা, আপনার দায়িত্ব হল সত্যের জন্যে আহ্বান করা, গ্রহণ করা না করা তাদের দায়িত্ব, আপনার নয়।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রহ.) এবং কাতাদা (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের حرج শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছেন সন্দেহ, এমন অবস্থায় অর্থ হবে (হে রসূল!) এই কিতাব পবিত্র কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে আপনি সন্দেহ করবেন না। বস্তুতঃ যাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের কিতাব নাযিল হয়েছে, যাঁকে আল্লাহ পাক তাঁর নবী ও রসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন, যাঁর প্রতি বিশ্ব মানবের হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তিনি আল্লাহ পাকের কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ করবেন এমন কথা চিন্তাও করা যায় না, এমন সন্দেহ হলে অতি স্বাভাবিক ভাবে চিত্তের সংকীর্ণতা দেখা দিতে পারে। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি এই কিতাব আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করবেন না, বরং নিঃশঙ্ক মনে নিঃসন্দেহে সাবধান করতে থাকুন, আখেরাত বা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকুন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৪।
২। তফসীরে ফাতহুল কাদীর (খন্ড-২), পৃঃ ১৮৭

অতএব, حَرَجٌ শব্দটির উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, (হে রসূল!) যদি কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস না করে তবে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা, আপনার দায়িত্ব হলো তাদেরকে তাদের পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

لِتُنْذِرَ بِهٖ

অর্থাৎ এই কিতাব আপনার প্রতি এজন্যে নাযিল হয়েছে যেন আপনি এর দ্বারা মানুষকে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যখন আল্লাহর রসূলের অন্তরে এই একীন থাকে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না থাকে তখন তিনি মানুষকে আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে নির্ভিক চিত্তে ভয় প্রদর্শন করেন। অথবা কাফেরদেরকে তিনি আদৌ ভয় করেন না। অথবা তিনি একথার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রচারে আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তিনি আমাকে এর তৌফিক দান করবেন। حَرَجٌ শব্দটির একাধিক অর্থের প্রেক্ষিতেই আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।[১]

وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আর এ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নসিহত হলো মোমেনদের জন্যে।

পবিত্র কোরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআন দ্বারা মোমেনগণই উপকৃত হবে। কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে হলে ঈমান হবে তার পূর্বশর্ত।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো–

الانذار الكافرين وذكرى للمؤمنين لانهم المنتفعون به

অর্থাৎ- পবিত্র কোরআন দ্বারা কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হবে এবং মোমেনদেরকে নসিহত করা হবে। কেননা, পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ মোমেনদেরই রয়েছে।[২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনার প্রতি আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, আর যখন আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন আপনার প্রতি নাযিল করেছেন তখন একথা জেনে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-২৬৫
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৪

রাখুন যে, আল্লাহ পাকের সাহায্য আপনার সঙ্গে রয়েছে। আল্লাহ পাকের দান আপনার প্রতি হয়েছে।

অতএব, আপনার অন্তরে কোন প্রকার সংকোচ, সন্দেহ, ভয়, আশঙ্কা কিছুই থাকতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যার হেফাজতকারী হন, তার কাউকে ভয় করার দরকার হয় না। যখন আপনার অন্তর থেকে ভয় দূর হলো তখন আপনি নির্ভীক চিত্তে কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে থাকুন এবং মানুষকে নসিহত করতে থাকুন, কোন বিদ্রোহী বা বিদ্বেষীর তরফ থেকে কোন প্রকার ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা করবেন না। কেননা, স্বয়ং সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকই আপনার রক্ষাকারী।

মানুষ দু' প্রকার

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন যে, মানুষ দু' প্রকার।

১. যারা ভোগবাদের মরফিয়া পান করে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সবকিছু মনে করে; এ জীবনের আরাম-আয়াশ, উন্নতি-অগ্রগতির জন্যেই হয়ে থাকে তাদের সকল প্রয়াস, সর্বদা গাফলতের আবর্তে তারা থাকে নিপতিত। দেহের আনন্দ উল্লাসকে তারা প্রাধান্য দেয়, আত্মাকে তারা বিস্মৃত করে, তাই আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবন-যাপন করে।

২. যারা বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী হয়, কল্যাণকামী এবং আদর্শবাদী হয়। আলোচ্য আয়াতে মানুষের প্রথম দলের উদ্দেশ্যে لِتُنْذِرَ بِهٖ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আত্মবিস্মৃত, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত, তাদের ভয় প্রদর্শনের জন্যে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় প্রকার লোকদের জন্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে নসিহত। যেমন সূরা বাকারার শুরুতে এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

এই কিতাব পথ প্রদর্শনকারী তাদের জন্যে যারা পরহেযগার, যারা মোত্তাকী, এই দলের জন্যে পবিত্র কোরআনে রয়েছে নসিহত, তারা যেন আল্লাহর তরফ থেকে নবীর আহ্বানের অপেক্ষা করতে থাকে। যখন নবীর আহ্বান আসে তখন বিনা দ্বিধায় অনতিবিলম্বে সে আহ্বানে সাড়া দেয়।[১]

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ.

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ নির্দেশ ছিল তিনি যেন নিঃশঙ্ক চিত্তে, সৎ সাহস নিয়ে পবিত্র কোরআনের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর। এরশাদ হয়েছেঃ তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৭

থেকে তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার পরিপূর্ণ অনুসরণ কর, আল্লাহর পথ ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করোনা। আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে জ্বীন ও মানুষের অনুগামী হয়োনা। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ পাককে পালনকর্তা হিসাবে মানে, যারা নিজেদের আদি অন্ত সম্পর্কে জানে, ভাল মন্দের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে, তারা সর্বদা সতর্ক থাকে।

তারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর নাফরমান হয় না, আল্লাহর পথ পরিহার করে ভ্রান্ত পথে চলেনা।

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ.

(তোমাদের অল্প সংখ্যক লোকই নসিহত হাসিল করে) পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না। যেমন আজকের পৃথিবীতে (১৯৯০ ইং) ৫২০ কোটি মানুষ বাস করছে অথচ তন্মধ্যে মাত্র ১০০শ' কোটি মানুষ তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে। এ আয়াতের অনুরূপ আরও একখানি আয়াত রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

অর্থাৎ আমার বন্দাদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোকই শোকর-গুজার।

আলোচ্য বাক্যে অনুপ্রেরণা রয়েছে পবিত্র কোরআন দ্বারা নসিহত হাসিল করার, পরিণামদর্শী হওয়ার, ইহকালীন জিন্দেগীতে পরকালীন জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহ করার।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ

مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ.

(যা তোমাদের নিকট নাযিল হয়েছে)

এতে পবিত্র কোরআন ও সুন্নতে রসূলের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

"আমার নবী নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, তিনি যা বলেন তা ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

"রসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে আসেন তা গ্রহণ কর, আর যে বিষয়ে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"।

এ আয়াতে আদেশ রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের প্রতি। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআনের প্রচারের নির্দেশ রয়েছে, তাই এ আয়াতের নির্দেশ হলো শুধু উম্মতের উদ্দেশ্যে, যেন তারা তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে।

আর এতে এ নির্দেশও রয়েছে যেন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী না করা হয়, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন কিছুকে শরীক না করা হয় এবং যেন অন্য কারো অনুসরণ না করা হয়, যেমন বর্বরতার যুগের গোত্রীয় সর্দারদের অনুসরণ করা হতো।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ.

"কত জনপদকে আমি নিপাত করে দিয়েছি, রাত্রি কালে অথবা দুপুরের বিশ্রামের সময় তাদের প্রতি আমার আযাব আপতিত হয়েছে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করার এবং তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে মহান বাণী নিয়ে এসেছেন তা মেনে চলার নির্দেশ ছিল। কিন্তু মক্কাবাসী এ নির্দেশ পালন করেনি। তাই আলোচ্য আয়াতে অতীত ইতিহাসের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কেননা ইতিহাস হলো মানুষের পথের দিশারী।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে মানেনি, আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে, আল্লাহ পাকের মহান বাণীকে উপেক্ষা করেছে এবং নাফরমানী ও অবাধ্যতার মাধ্যমে এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তুলেছে। অবশেষে তারা তাদের অপকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করেছে। রাতের বেলা যখন তারা নিদ্রায় বিভোর ছিল তখন তাদের প্রতি আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। যেমন লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি রাত্রি বেলা আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনিভাবে যখন তারা দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম রত থাকে তখনও তাদেরকে আযাব পাকড়াও করে যেমন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব এসেছে। রাত্রি এবং দ্বিপ্রহরের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, এ সময়টিতে সাধারণতঃ মানুষ গাফলতের অবস্থায় থাকে।

যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে থাকে, বারে বারে সতর্ক করা সত্ত্বেও যাদের গাফলতের নিদ্রা ভাঙ্গেনা অবশেষে তারা আল্লাহ পাকের গজবের অতর্কিত আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আত্মরক্ষারতো প্রশ্নই ওঠেনা, কোন প্রকার সাফাই পেশ করারও কোন সুযোগ থাকে না। তখন নিজের দোষ স্বীকার করা ব্যতীত তাদের কোন গত্যন্তর থাকে না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَا كَانَ دَعْوٰهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ.

যখন তাদের প্রতি আমার আযাব আপতিত হয় তখন তাদের একমাত্র ফরিয়াদ থাকে এই, আমরাই অপরাধী। আমরাই গুনাহগার, অবশেষে তারা এ সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আমরা অন্যায় করেছি, আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি অবিচার করেননি; বরং আমরাই আমাদের প্রতি অত্যাচার করেছি। কিন্তু তাদের এ অপরাধ স্বীকার তাদের জন্যে উপকারী হয় না।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থাৎ-যে সব উম্মতের নিকট নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কি আমার নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে? তাদের উপদেশ গ্রহণ করেছিলে? এবং নবী রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা তাদের নিকট থেকে কি জবাব পেয়েছিলে?

বায়হাকী হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা নবী রাসুলগণের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে কি? আর পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা আমার বিধি-নিষেধ বন্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে ছিলে? এবনে মোবারক (রঃ) আবু হিলার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইসরাফীল (আঃ)-কে তলব করা হবে। আল্লাহ পাক তাঁকে বলবেন তুমি কি আমার আদেশ পৌঁছিয়েছ?

ইসরাফীল (আঃ) আরজ করবেন জ্বী-হ্যাঁ। আমি জিব্রাইলকে পৌঁছিয়েছি। তখন জীব্রাইল (আঃ)-কে তলব করা হবে। আল্লাহ পাক তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেনঃ ইসরাফীল তোমার নিকট আমার নির্দেশ পৌঁছিয়েছে? জীব্রাইল (আঃ) আরজ করবেন জ্বী-হ্যাঁ। এরপর ইসরাফীল (আঃ) ছুটি পাবেন। তখন আল্লাহ পাক জীব্রাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি আমার আদেশ সম্পর্কে কি করেছ?

জীব্রাঈল (আঃ) আরজ করবেন হে প্রতিপালক! আমি পয়গম্বরগণের নিকট সে আদেশ পৌঁছিয়েছি। এরপর পয়গম্বরগণকে হাযির করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে জিব্রাইল কি আমার আদেশ তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে ছিল? তখন পয়গম্বরগণ আরজ করবেন জ্বী হ্যাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করা হবে তোমরা সে আদেশের কি করেছ? তখন তাঁরা আরজ করবেন আমরা সে আদেশ উম্মতদের নিকট পৌঁছিয়েছি (আর একথাই এরশাদ হয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশে)। وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ "আমি অবশ্যই রসূলগণকে জিজ্ঞাসা করব"।

পূর্ববর্তী বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, এরপর উম্মতদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, পয়গম্বরগণ কি আমার হুকুম পৌঁছিয়েছে? তখন কিছু লোক পয়গম্বরগণের কথা অস্বীকার করবে আর কিছু লোক স্বীকার করবে। তখন পয়গম্বরগণ আরজ করবেন, আমাদের নিকট আমাদের কথার পক্ষে সাক্ষী রয়েছে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেনঃ কে তোমাদের সাক্ষী? পয়গম্বরগণ বলবেনঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত

আমাদের সাক্ষী। তখন উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে তলব করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আমার পয়গম্বরগণ তাদের উম্মতদের নিকট আমার আদেশ পৌঁছে দিয়েছে। উম্মতে মোহাম্মদীয়া আরজ করবে জ্বী-হ্যাঁ। ঐ মুহূর্তে অন্য উম্মতীরা বলবে যারা আমাদের যুগে ছিল না তারা আমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে সাক্ষ্য দেবে?

তখন আল্লাহ্ পাক উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে জিজ্ঞাসা করবেনঃ তোমরা কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে? অথচ তোমরা তাদের যুগে ছিলেনা। তখন উম্মতে মোহাম্মদীয়া আরজ করবে হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট রসূল প্রেরণ করেছ এবং তাঁর প্রতি কিতাব (পবিত্র কোরআন) নাযিল করেছ এবং পবিত্র কোরআনে একথা ঘোষণা করেছে পয়গম্বরগণ তাদের উম্মতদের নিকট তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

সূরা বাকারার এ আয়াত

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

এর এটিই হলো তাৎপর্য।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ.

(অতঃপর আমি আমার জ্ঞান দ্বারাই তাদেরকে তাদের ইতিকথা জানিয়ে দেব। আর আমি অনুপস্থিত ছিলাম না) বস্তুতঃ মানুষের ছোট-বড় কোন কাজই আল্লাহ্ পাকের অজানা নয়, সবই তাঁর নখদর্পণে, আর তিনি সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে সব কিছু জানেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

(তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের যাবতীয় কাজ তিনি প্রত্যক্ষ করছেন) তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আমি আমার জ্ঞান দ্বারাই তাদের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করবো। ফেরেশতাদের রিপোর্ট প্রণয়ন, মানুষের আমলনামা প্রস্তুত করা, এসবই নিয়মতান্ত্রিক ভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের এলমের জন্যে এসবের কোন প্রয়োজন নেই এমনকি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সাক্ষ্য দানেরও কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে কেয়ামতের ময়দানে বিশেষ মর্যাদা দেয়ার উদ্দেশ্যই এ সওয়াল জবাব করা হবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৬-৬৮

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ
مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَا
تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

তরজমা

(৮) সেদিন ওজন সত্যই হবে অতএব, যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম।

(৯) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছে কেননা, তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করতো।

(১০) আর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি আর তাতে তোমাদের জন্যে জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(১১) এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, এরপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করি, এরপর ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছি তোমরা আদমকে সেজদা কর, ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করলো। কিন্তু ইবলিস সেজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন উম্মতদেরকে নবী রসূলগণের আহ্বান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, আর রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করা হবে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমল ও আচরণের পরিমাপ করা হবে। এ ওজন বা পরিমাপ সুনিশ্চিত, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ـ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

অর্থাৎ- যে সামান্যতম বালুকণা পরিমাণও নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে সামান্যতম মন্দ কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

"ভয় কর সেদিনকে যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যাবে, সেদিন তোমাদের প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ বদলা দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না"।

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন প্রত্যেকটি আমল পরিমাপ করা হবে, আর কেউ বলেছেন আমলনামা ওজন করা হবে। আর কেউ বলেছেন স্বয়ং আমলকারীকে ওজন করা হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, এর প্রত্যেকটি অভিমতই সত্য। কখনও আমল ওজন করা হবে আর কখনও আমলনামা ওজন করা হবে। আর কখনও আমলকারীকে ওজন করা হবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

(আর আল্লাহ পাকই সবচেয়ে বেশী জানেন)।[১]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভাল বা মন্দ আমল অবশ্যই পরিমাপ করা হবে। এ পরিমাপ কিভাবে হবে তার সঠিক ধারণা করা সহজ নয়। এ পর্যায়ে শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষের এ অশরীরি আমলকে দেহ প্রদান করা হবে এবং ঐ দেহযুক্ত আমলকেই পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন যে, একথাটি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যেমন হাদীস শরীফে আছে কেয়ামতের দিন সূরা বাকারা এবং সূরা আলে এমরান দুটি মেঘখন্ডের মত রূপ ধারণ করবে।

আর হাদীস শরীফে একথাও আছে কবরে মোমেনদের জন্য অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন এবং সুগন্ধময় যুবক আসবে। তখন মোমেন তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? সে জবাব দেবে আমি তোমার নেক আমল। আর কাফের এবং মুনাফেকের সম্পর্কে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে বোখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস হল–

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان

حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১

অর্থাৎ দুটি বাক্য এমন উচ্চারণে অতি হালকা কিন্তু পাল্লায় অনেক ভারি, আল্লাহ পাকের নিকট অতি প্রিয়। এ দুটি বাক্য হল, "সোবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি" "সোবহানাল্লাহিল আজীম"।

হাদীস শরীফে একথাও উল্লেখিত রয়েছে, যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করেনা তার ধন-সম্পদ কবরে বিষাক্ত স্বর্পের রূপ ধারণ করে তাকে দংশন করবে এবং বলবে– "আমি তোমার সম্পদ", "আমি তোমার সম্পদ"।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, মানুষের নেক আমল কেয়ামতের দিন তার যানবাহনে পরিণত হবে। আর যারা বদকার তাদের মন্দ কাজগুলো বোঝস্বরূপ ধারণ করবে এবং তাদের মাথায় চড়িয়ে দেয়া হবে।

এমনি আরো হাদীস রয়েছে যা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে মানুষ যে আমল করে তা একটি দৈহিক রূপ লাভ করবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا.

মানুষ পৃথিবীতে যে কাজ করে কেয়ামতের দিন তা দেখতে পাবে। ভাল-মন্দ সেদিন সবই প্রকাশ পাবে। এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, দুনিয়াতে যে আমলের কোন রূপ নেই কোন দেহ নেই তা কিভাবে পরিমাপ করা হবে? কেননা, আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি কিভাবে ক্যাসেটের মধ্যে মানুষের কথাবার্তা সংরক্ষিত হয়ে থাকে। আর তা দু'এক দিনের জন্যে নয়, বরং বছরের পর বছর থাকে। তাহলে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক যে মানুষের আমল সংরক্ষণ করবেন তা সন্দেহাতীত ভাবে বলা চলে। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াতে বিভিন্ন জিনিসের পরিমাণের জন্য বিভিন্ন প্রকার পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মানুষের দেহের তাপ, বৃষ্টি-বাদল, গ্রীষ্মের তাপ সবই পরিমাপ করা হচ্ছে। গাড়ী যখন চলে তখন তাতে রাস্তা পরিমাপক যন্ত্র এবং গাড়ীর গতি পরিমাপক যন্ত্র ও জ্বালানী তেল কতখানি ব্যয় হচ্ছে তার পরিমাপক যন্ত্র একই সঙ্গে কার্যকর থাকে। যদি বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষের পক্ষে এসব করা সম্ভব হয় তবে স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষের আমল পরিমাপ করা কেন সম্ভব হবে না? তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ.

(ওজন সেদিন সত্যই হবে)

দ্বিতীয় অভিমত

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আমল নয়, বরং আমলনামা পরিমাপ করা হবে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ মানুষের ভাল-মন্দ আমলের বিবরণ যে দপ্তরে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তা পরিমাপ করা হবে। তিরমিজী এবং মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে যার কার্যাবলীর বিবরণ ৯৯টি দপ্তরে লিপিবদ্ধ থাকবে। আর এক একটি দপ্তর মানুষের চোখের সীমা সমান সুদীর্ঘ হবে। এ সমস্ত দপ্তর এক পাল্লাতে রাখা হবে। এরপর এ ব্যক্তিরই একটি কাগজের টুকরা পেশ করা

হবে যাতে কলেমায়ে তায়্যেবা লিপিবদ্ধ থাকবে। এ ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করবে, আমার কৃতকর্মের ঐ সুদীর্ঘ দপ্তরগুলোর মোকাবেলায় এ কাগজের টুকরা কি কোন কাজে আসবে? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, তোমার প্রতি জুলুম করা হবে না। এরপর ঐ কাগজের টুকরাটি অন্য পাল্লায় রেখে সমস্ত আমলের ওজন করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তখন এ পাল্লা ভারি হবে যে পাল্লায় কলেমায়ে তায়্যেবা লিখিত কাগজ থাকবে। আর অপর পাল্লাটি হালকা হবে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কলেমায়ে তায়্যেবার মোকাবেলায় কোন কিছুই টিকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমলনামা পরিমাপ করা হবে একথার প্রমাণও এই হাদীস দ্বারা পাওয়া যায়।

তৃতীয় অভিমত

তত্ত্বজ্ঞানীদের আরও একটি দল এ মত পোষণ করেন যে, আমল নয়; আমলনামাও নয় বরং যে ব্যক্তি আমল করবে তাকেই ওজন করা হবে। হাদীস শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন একজন মোটা-তাজা ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। তার ওজন মাছির পাখারও সমান হবে না। এতে একথা বোঝা যায় যে কাফেররা ওজনে হালকা হবে।

উপরোল্লিখিত এ তিনটি অভিমতের মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হল প্রথমটি। এ মত পোষণ করেছেন আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ)। তিনি বলেছেন, যদিও দুনিয়াতে মানুষের আমল অশরীরি কিন্তু কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি আমলকে দেহ প্রদান করা হবে। আর আমলকে পাল্লায় পরিমাপ করা হবে। যে ব্যক্তি নেক আমল করেছে এখলাসের সঙ্গে এবং যথা সময়ে এবং যথাযথভাবে তার আমলেরই ওজন হবে। পক্ষান্তরে যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ভাল কাজ করে অথবা শরীয়তের খেলাফ কাজ করে তার আমল ওজনে হালকা হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

যাদের ওজন ভারী হবে তারা সফলকাম হবে, পক্ষান্তরে যাদের ওজন হালকা হবে তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে কেননা, তারা আমার আয়াত সমূহ সম্পর্কে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। তথা আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, পরিণামে তাদের ধ্বংস নেমে এসেছে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা একথা জানা যায় যে কেয়ামতের দিন একটি পরিমাপক যন্ত্র রাখা হবে। তার দুটি পাল্লা থাকবে এবং তার একটি রসনাও থাকবে, এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। তবে ঐ পরিমাপক যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি কি হবে এবং তা দ্বারা পরিমাপ করার পন্থা কি হবে তা জানা সম্ভবও নয় এবং জরুরীও নয়। অদৃশ্য জগতের বিষয় সমূহের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। তার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে জানা জরুরী নয়। এসব বিষয়ের এলম একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬-৮
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৬২- ৬৩

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত বিখ্যাত হাদীসে জীব্রাঈলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসে রয়েছে হযরত জীব্রাইল (আঃ) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি জবাবে এরশাদ করেন, ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং জান্নাত ও দোযখ এবং মিজান তথা আমল পরিমাপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মৃত্যুর পর হাশরের দিন হাযির হতে হবে– একথাও বিশ্বাস করবে। আর একথার প্রতি ঈমান রাখবে যে, সকল ভাল-মন্দ আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তকদীর মোতাবেকই হয়ে থাকে। যদি তুমি এসব কথার প্রতি বিশ্বাস কর তবে তুমি প্রকৃত মোমেন। হযরত জীব্রাইল (আঃ) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। (বায়হাকী)

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আমরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হযরত আদম (আঃ)-এর দাঁড়াবার একটি স্থান নিদৃষ্ট হবে। তিনি সবুজ বর্ণের দুটি কাপড়ের পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকবেন। তাঁকে মনে হবে একটি সুদীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় দোযখের যাত্রীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। এই সময় উম্মতে মোহাম্মদীয়ার এক ব্যক্তিকে দোযখে যেতে দেখে তিনি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডাক দিয়ে বলবেন, আহমদ, তিনি এরশাদ করেনঃ আমি বলবো হে আবুল বাশার (মানব জাতির আদি পিতা)! আমি এখানে। হযরত আদম (আঃ) বলবেনঃ তোমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন আমি অনতিবিলম্বে ফেরেশতাদের নিকট পৌঁছে বলবো হে আল্লাহর প্রতিনিধিগণ! তোমরা থাম। ফেরেশতাগণ বলবেনঃ আমরা অত্যন্ত কঠোর এবং শক্তিশালী। আল্লাহ পাক যে আদেশ আমাদেরকে দেন আমরা তার বরখেলাফ করতে পারিনা। আমাদেরকে যে আদেশ তিনি দেন আমরা তা পালন করি।

(বর্ণনাকারী বলেন) যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদের কথায় নিরাশ হবেন তখন তিনি বাম হস্তে তাঁর দাড়ী মোবারক স্পর্শ করে আল্লাহ্ পাকের আরশের দিকে দৃষ্টিপাত করে আরজ করবেনঃ হে আমার মালিক! তুমি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, আমার উম্মতের মধ্যে আমাকে অপমানিত করবে না। তখন সঙ্গে সঙ্গে আরশ থেকে ঘোষণা করা হবে, মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) কথা মান এবং ঐ বন্দাকে আমল পরিমাপের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তখন আমি একটি সাদা কাগজ নিজের তরফ থেকে বের করে পাল্লাতে রাখবো। ফলে নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হবে সফলকাম হয়েছে। তার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হয়েছে। অতএব, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। এ ব্যক্তি ফেরেশতাদের বলবে আমাকে এ সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ দাও, যাঁর এত সম্মান রয়েছে আল্লাহ্ পাকের দরবারে, তখন সে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে বলবেঃ আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। আপনি কে? আপনার চেহারা মোবারক কত সুন্দর এবং আপনার ব্যবহার কত মধুর, কত উচ্চতর!

তখন আমি জবাবে বলবোঃ আমি তোমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর এ হলো তোমার দরূদ শরীফ সমূহ যা তুমি আমার প্রতি পাঠ করতে, তোমার কঠিন বিপদের মুহূর্তে তোমার জন্যে উপকারী হয়েছে।

বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا.

এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করে তার ব্যাখ্যায় এরশাদ করেছেনঃ কোন কোন শক্তিশালী এবং বৃহদাকারের দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে পাল্লাতে তোলা হবে। কিন্তু তাদের ওজন বলতে কিছু হবে না। ফেরেশতাগণ এমন ৭০ হাজার মানুষকে এক ধাক্কায় দোযখে নিক্ষেপ করবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তাদের মতে আমলকারীকে পরিমাপ করা হবে। এ অভিমতের সমর্থনে আলোচ্য হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর একথার উল্লেখও করেছেন যে, দুনিয়াতে মানুষ যে আমল করে কেয়ামতের দিন সে আমলকে দৈহিক অস্তিত্ব প্রদান করা হবে। এর সমর্থনে তিনি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং বোখারী শরীফের সর্বশেষ সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি)।

এসবেহানী "আত-তারগীবে" হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সোবহানাল্লাহ পাল্লার অর্ধেক হবে, আর আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেবে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পবিত্রতা অর্জন ঈমানের অর্ধেক এবং আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেবে।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে তাঁর দু' পুত্রকে ডেকে বলেছিলেনঃ আমি তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই) একথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখ। কেননা আসমান জমিনে যা কিছু আছে তা যদি এক পাল্লাতে রাখা হয়, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অন্য পাল্লাতে রাখা হয় তবে তা ভারী হয়ে যাবে।

হাকেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছেন যে, সাত আসমান, সাত জমিন এবং আমি ব্যতীত যা কিছু আছে তা যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অন্য পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয় তবে এ পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি আসমান জমিন এবং তাতে যত কিছু রয়েছে এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগৎ এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অন্য পাল্লায় লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য রাখা হয় তবে এ পাল্লা ভারী হবে।

আবু দাউদ, তিরমিযী এবং এবনে হাব্বান হযরত আবু দরদা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমল পরিমাপক যন্ত্রে চরিত্র মাধুর্যের চেয়ে বেশী ভারী কোন জিনিস হবে না। তেবরানী এবং বায়হাকী অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবুজর (রাঃ)-কে বলেছেনঃ হে আবুজর! আমি কি তোমাকে এমন দুটি কাজের কথা বলবো যা করা সহজ কিন্তু আমল পরিমাপকারী পাল্লায় তা হবে অত্যন্ত ভারী।

হযরত আবুজর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! অবশ্যই আরজ করুন। তিনি বলেনঃ চরিত্র মাধুর্য এবং অধিকতর নীরবতা পালনের নীতি অবলম্বন কর। শপথ সেই পবিত্র সত্তার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, এ দুটির সমান কোন আমল নেই।

ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর "আয্ যোহদ" গ্রন্থে হাযেম নামক এক ব্যক্তির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি বসে কাঁদল। এমন সময় জীব্রাইল (আঃ)-এর আগমন হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ ব্যক্তি কে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিচয় দিলেন। এরপর জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আদম সন্তানের সকল আমলের ওজন হতে পারে কিন্তু ক্রন্দনের ওজন হতে পারে না। এক ফোটা অশ্রু সমুদ্র সমান অগ্নিকে নিভিয়ে দিতে পারে। বায়হাকী হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসারের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন চক্ষু থেকে অশ্রু নির্গত হয় (আল্লাহর ভয়ে) তখন আল্লাহ পাক সারা দেহের উপর দোযখকে হারাম করে দেন। আর যখন অশ্রুর ফোটা গন্ডদেশে প্রবাহিত হয় তখন সে চেহারা অপমানিত হয় না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এই হাদীস সমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কেয়ামতের দিন আমলের ওজন করা হবে। অবশ্য এই হাদীস সমূহের এ অর্থও হতে পারে যে, আমলনামা ও আমলকারীরও ওজন করা হবে।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, পরিমাপক যন্ত্রের একটি রসনা ও দুটি পাল্লা হবে। একটিতে নেক আমল, অন্যটিতে মন্দ আমল পরিমাপ করা হবে। নেক আমলকে অতি সুন্দর ভাবে পেশ করা হবে, মন্দ কাজের পাল্লা থেকে যখন নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে তখন ঐ সুন্দর আকৃতিকে জান্নাতে স্বস্থানে রেখে দেয়া হবে। তখন মোমেনকে বলা হবে তুমি তোমার আমলের সঙ্গে একত্রিত হও। তখন মোমেন জান্নাতের দিকে চলে যাবে এবং তার আমলের কারণে সে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান চিনে ফেলবে। আর মন্দ কাজগুলোকে অত্যন্ত মন্দ আকৃতি দিয়ে পাল্লায় রাখা

হবে। এ পাল্লা হালকা হবে। আর বাতিলের ওজন হালকাই হয়। এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আর পাপাচারী লোকটাকে বলা হবে তুমি তোমার আমলের সঙ্গে একত্রিত হও। তখন ঐ ব্যক্তি দোযখে যাবে এবং নিজের কৃতকর্ম দেখে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান চিনে ফেলবে। আর বিভিন্ন রকমের আযাব দেখবে যা আল্লাহ্ পাক তার জন্যে তৈরি করে রেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যেভাবে জুমআর দিন নামাযের পর লোকেরা তাদের বাড়ী-ঘরে যায় এবং নিজে নিজের স্থান চিনে ফেলে, দোযখী দোযখে তার স্থানকে এবং জান্নাতী জান্নাতে তার স্থানকে তাদের নিজ নিজ আমলের কারণে ঐ নামাজীদের চেয়েও অধিক পরিমাণে চিনতে পারবে।

এবনে মোবারক হাম্মাদ এবনে আবি সোলায়মানের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি নিজের আমলকে অতি সামান্য দেখবে। তখন একটি জিনিস মেঘমালার মত এসে তার নেক আমলের পাল্লায় পড়বে। তখন ফেরেশতা বলবেনঃ এটি সেই নেকী যার শিক্ষা তুমি মানুষকে দিতে। তোমার পর সেই নেকী বংশানুক্রমে অব্যাহত থাকে, যার সওয়াব তোমাকে আজ দেয়া হচ্ছে।

এবনে আবদূর রাজ্জাক ইব্রাহীম নখয়ীর সূত্রেও এ বর্ণনার উল্লেখ করেছেন।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমি নিজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযার সাথে যাবে তার আমল পরিমাপের পাল্লায় এর নেকী দুই কিরাত রাখা হবে যা পাহাড়ের সমান হবে।

ইসবেহানী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় লিখেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ফরজ নামাযের একটি ওজন আল্লাহ্ পাকের নিকট রয়েছে। যে ব্যক্তি ফরজ নামাযে কিছু কম করবে তবে তার নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করা হবে।

আবু দাউদ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তাতে রয়েছে ফরজ নামাযে যদি কিছু ত্রুটি হয় আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন যে, দেখ আমার বন্দার কোন নফল নামায আছে কি-না? যদি নফল থাকে তবে তা দ্বারা ফরজের কমতি পুরো করা হয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা জানা যায় আমলের সাথে সম্পর্ক আছে কেয়ামতের দিন এমন দেহের ওজন করা হবে।

তেবরানী হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন বন্দার আমলের পরিমাপের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম সেই খরচ পাল্লায় রাখা হবে যা সে তার পরিবারবর্গের জন্যে করেছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অঙ্গীকারকে সত্য জেনে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে নিজের বা অন্য কোন মুজাহেদের জন্যে একটি ঘোড়া জেহাদের উদ্দেশ্যে রেখে দেবে তবে সে ঘোড়ার মলমূত্র পর্যন্ত কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির পাল্লায় রাখা হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেছেনঃ ওঠ এবং তোমার কোরবানীর পাশে থাক। তার রক্তের যে ফোটাটি বের হবে তা তোমার প্রত্যেকটি গুনাহর মাগফেরাতের কারণ হবে। খুব ভাল করে জেনে নাও, তার রক্ত এবং গোশ্‌তের ৭০ গুণ করে কেয়ামতের দিন তোমার নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে। একথা শ্রবণ করে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ আদেশটি শুধু আপনার পরিবারবর্গের জন্যে? তিনি এরশাদ করলেনঃ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আওলাদদের জন্যে এবং সকল মুসলমানের জন্যে।

তেবরানী লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ আমি একটি উষ্ট্রী আল্লাহর রাহে দান করি। এরপর উষ্ট্রীর বাচ্চাটি ক্রয় করার ইচ্ছা করি তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়োসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এরশাদ করেনঃ এভাবেই থাকতে দাও, কেয়ামতের দিন এ উষ্ট্রী এবং তার সকল সন্তান-সন্ততি তোমার পাল্লায় আসবে। আল্লামা জাহাবী হযরত এমরান এবনে হোসাইনের সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আলেম সমাজের লেখার কালি এবং শহীদের রক্ত ওজন করা হবে। আলেম সমাজের লেখার কালি শহীদদের রক্তের চেয়ে ভারী হবে।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অতঃপর যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে তারা হবে সফলকাম, তাদের জীবন-সাধনা হবে সার্থক সুন্দর। তারাই লাভ করবে সাফল্যের মনি-মানিক্য।

পক্ষান্তরে যাদের নেক আমলের পাল্লা হালকা হবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ.

আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে তারাই সে সব লোক, যারা নিজেদের সর্বনাশ করেছে। আমার আয়াত সমূহের প্রতি অবিচার করার কারণে কেননা, তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে। তাই তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গী দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে তারা কাফের হোক অথবা গুনাহগার মোমেন হোক সকলের ব্যাপারেই আয়াতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। কিন্তু তফসীরকারগণ বলেছেন যে, এ স্থলে বিশেষভাবে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে কেননা, পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য এই, যেখানে মোমেনদের

আলোচনা হয় সেখানে তার মোকাবেলায় কাফেরদের উল্লেখও থাকে। আর যে সব মুসলমান নেক কাজের পাশাপাশি মন্দ কাজও করে তাদের আলোচনা এভাবে করা হয় না।

الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا.

এ বাক্য দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা জন্মগত স্বভাব হারিয়ে ফেলেছে, যারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে বিশ্বাস করার স্থলে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। এভাবে তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহের প্রতি অবিচার করেছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর জীবন সায়াহ্নে হযরত ওমর (রাঃ)-কে নসিহত করে বলেছিলেন, কেয়ামতের দিন যার পাল্লা ভারী হবে তা শুধু এজন্য ভারী হবে যে, সে সত্যের অনুসরণ করেছিল। যে পাল্লায় হক্ব বা সত্য রাখা হবে তা ভারী হওয়াই স্বাভাবিক। আর যার পাল্লা হালকা হবে তা এজন্য হবে যে, সে বাতিলের অনুসারী ছিল। আর বাতিলের পাল্লা হালকা হওয়াই স্বাভাবিক।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এখানে বাতিল অর্থ বাতিল আকিদা বিশ্বাস এবং মন্দ কাজ যাকে বাতিল পন্থীরা ভাল কাজ মনে করে। আল্লাহ পাকের দরবারে তার কোন ওজন বা গুরুত্ব নেই। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে দূর থেকে কেউ তাকে পানি মনে করে অথচ কাছে গিয়ে সে কিছুই পায় না, ঠিক এমনিভাবে কাফের এবং পথভ্রষ্টরা আল্লাহ পাকের দরবারে গমন করেও কিছু পাবে না; বরং জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ.

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগ করার আদেশ দেয়া হয় এবং এরপর যারা সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তাদের শুভ পরিণতি আর যারা সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে ও তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলে।

আলোচ্য আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টির সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থার বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়ামায়া এবং তাঁর অনন্ত অসীম করুণার নিদর্শন পেশ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অণুপ্রাণিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রতি যে অনন্ত অসীম অনুগ্রহ করেছেন বিশেষভাবে তার কয়েকটির উল্লেখ এখানে রয়েছে।

১. আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা পৃথিবীকে ব্যবহার করতে পার।

২. তোমাদের জীবনের উপকরণ আমি মাটিতেই সৃষ্টি করেছি। আর আমার অবতীর্ণ বিধি-নিষেধ মোতাবেক যেন তোমরা উপকৃত হতে পার তার ব্যবস্থা করেছি।

৩. তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-কে এ বিশেষ মর্যাদা দান করেছি যে, পৃথিবীতে তাঁকে আমার প্রতিনিধি মনোনীত করেছি এবং সমস্ত ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁকে সেজদা করিয়েছি। ইবলিস সেজদা করতে অস্বীকার করেছে তাই তাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছি। মনে রেখো, শয়তান তোমাদের চির শত্রু। তার ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকবে এবং তোমাদের মনের গহনে শয়তান যে প্ররোচনা দেবে তা থেকে তোমরা সাবধান থাকবে।

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা অতি সামান্যই শোকর আদায় কর। তোমাদের প্রতি আমার যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা অতি সামান্যই শোকর আদায় কর। অথবা এর অর্থ হলো তোমরা অতি সামান্য সময় শোকর আদায় কর।

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ

"আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি"।

ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ.

"এরপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি, এরপর ধারাবাহিক ভাবে তোমাদের পিতামহ এবং পিতাকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদের মায়েদের উদরে তোমাদের আকৃতি সৃষ্টি করেছি।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলোঃ আমি তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তাঁর পৃষ্ঠদেশে তোমাদের আকৃতি সৃষ্টি করেছি। আদম (আঃ) যেহেতু আদি পিতা, তাই তাঁর সৃষ্টিকে সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ.

এরপর আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছি, যেন তারা আদমকে সম্মান সূচক সেজদা দেয়, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই তাকে সেজদা করেছে। ইবলিস সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

এতদ্বারা মানুষের উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, মানুষকে যে আল্লাহ পাক উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় স্থান পেয়েছে।[১]

১। এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১. পৃঃ ২৫৫-৬২

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي
مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِي
إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১২) আল্লাহ পাক বললেন, আমি যখন আদেশ দিলাম তাকে সেজদা করতে, তখন কে তোকে বাধা দিল? ইবলিস বলে, আমি যে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাকে সৃষ্টি করেছ অগ্নি দ্বারা আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা।

(১৩) আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ এখান থেকে নেমে যা। এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারেনা। অতএব, বের হয়ে যা। নিঃসন্দেহে তুই অধমদের অন্তর্ভুক্ত।

(১৪) ইবলিস বলে, আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন মানুষ কবর থেকে উত্থিত হবে।

(১৫) আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ তোকে সময় দেয়া হলো।

(১৬) ইবলিস বলে, তুমি আমাকে শাস্তি দিলে এজন্যে নিশ্চয় আমিও তোমার সরল সঠিক পথে মানুষের জন্যে ওঁত পেতে থাকব।

(১৭) এরপর আমি তাদের নিকট আসবই, তাদের সম্মুখ থেকে, তাদের পেছন থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেনা।

(১৮) আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ তুই এখান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা, তাদের মধ্যে যে কেউ তোর অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তাদের সকলের দ্বারা দোযখকে ভর্তি করব।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক ইবলিসকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যখন তোকে আদেশ দিয়েছি আদমকে সম্মান সূচক সেজদা দিতে, কিসে তোকে তাতে বাধা দিল? অর্থাৎ আদমকে সেজদা না করার কারণ কি? আল্লাহ পাক সে কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু ইবলিসকে তিরস্কার করার লক্ষ্যেই তিনি তাকে এ প্রশ্ন করেন। সে তার জবাবে বলেঃ

قَالَ اَنَا خَيْرٌ.

আমি আদম থেকে উত্তম। কেননা হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর আদমকে মাটি দ্বারা। মাটি থেকে অগ্নি উত্তম। তাই আমি আদম থেকে উত্তম। অতএব, আমি কি করে তাকে সেজদা করতে পারি!

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ অভিশপ্ত ইবলিস আদেশ অমান্য করার যে কৈফিয়ত পেশ করেছে তা আরো বড় অন্যায়। কেননা তাতে রয়েছে অহংকার, আল্লাহ পাক অহংকারকে বরদাশত করেন না।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে–

الكبر رداءى

অহংকার হলো আমার চাঁদর, এজন্যেই কোন সৃষ্টির জন্যে উচিত নয় অহংকার করা। আর যে অহংকার করে তার ধ্বংস হয় অনিবার্য।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেনঃ ইবলিসের বক্তব্য হলো আমি অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট, আর আদম মাটি দ্বারা। অতএব আমি উত্তম, তাই আমি আদমকে সেজদা করতে পারি না। ইবলিসের এ দাবীই বাতিল যে আগুন মাটি থেকে উত্তম। কেননা আগুন ও মাটি উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন বিষয়ে মাটি উত্তম, কোন বিষয়ে অগ্নি উত্তম। মূলতঃ অহংকারের কারণেই ইবলিসের পতন হয়। এজন্যেই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ যে ব্যক্তি অহংকারের ভিত্তিতে নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে প্রয়াসী হয় বা শরীয়তের মোকাবেলায় নিজের মতকে উত্তম মনে করে, সে ইবলিসের উত্তরাধিকারী।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সৃষ্টির ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইবলিস কেয়াসের ভিত্তিতে কাজ করেছে আর তাতে সে ভুল করেছে। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মতকে প্রাধান্য দেয় আল্লাহ পাক তাকে ইবলিসের সঙ্গে একত্রিত করবেন। অগ্নি উর্দ্ধমুখী এজন্যে তা উত্তম হওয়া জরুরী নয়, বরং উত্তম হয় আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়ে। আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর উচ্চ মর্তবা দান করেছেন। স্বীয় কুদরতী হাতে তাঁকে তৈরী করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে তাঁকে এলম দান করেছেন। আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৩১৪

কারণে তাঁকে বিশেষ নৈকট্য দান করেছেন। সবার উপরে যে আমানত গ্রহণ করতে আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত সাহস করেনি সে আমানত তাঁর উপর অর্পণ করেছেন, এর চেয়ে বড় ফজিলত এবং মর্তবা আর কি হতে পারে! অতএব, আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।[১]

ইবলিস যখন তার অহংকারের কথা প্রকাশ করলো আল্লাহ পাক তখন তাকে নির্দেশ দিলেন, হে ইবলিস! তুই এখান থেকে নীচে নেমে যা, জান্নাত থেকে বা আসমান থেকে নীচে নেমে যা। কেননা জান্নাত বিনয়ী বন্দাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, অহংকারীদের জন্যে নয়।

فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا.

এখানে থেকে তুই অহংকার করবি, এর অনুমতি দেয়া যায় না। অহংকার একমাত্র আল্লাহ পাকেরই বৈশিষ্ট্য, তাঁর জন্যই তা শোভনীয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে যে, যারা অহংকার করবে জান্নাতে তাদের স্থান নেই। এ অহংকারের কারণেই ইবলিস অভিশপ্ত এবং আসমান থেকে বহিস্কৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার অন্তরে সামান্য বালুকণা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না (মুসলিম) এই হাদীস শ্রবণের পর এক ব্যক্তি আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কোন কোন লোক নিজের জন্যে উত্তম পোষাক, উত্তম পাদুকা পছন্দ করে (এটি কি অহংকারের চিহ্ন?) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক নিজে সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন (অর্থাৎ এগুলো অহংকারে চিহ্ন নয়)। অহংকার হলো সত্যের মোকাবেলায় বাধা হয়ে দাঁড়ানো এবং মানুষকে ছোট মনে করা।

হযরত হারেসা এবনে ওহাব বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদের বলবো, জান্নাতী কে? দোযখী কে? সেই দুর্বল ব্যক্তি, যাকে মানুষ দুর্বল মনে করে অপমানিত মনে করে) কিন্তু সে যদি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে তবে আল্লাহ পাক সেই শপথ পূর্ণ করে দেন। (সে জান্নাতি) আর চরিত্রহীন বদমেজাজ, অহংকারী ব্যক্তি দোযখী। এজন্যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাকের এরশাদঃ "শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাঁদর, অহংকার আমার পোশাক, যে এর কোনটি নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে দোযখে ফেলবো"। (মুসলিম)

فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৬

অতএব, হে ইবলিস! তুই বের হয়ে যা। তুই আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে এবং তাঁর বন্ধুদের দৃষ্টিতে অপমানিত। প্রত্যেকে তোকে মন্দ বলবে। সকল রসনা থেকে তোর জন্যে লা'নত উচ্চারিত হবে।

আলোচ্য আয়াতাংশে ইবলিসকে صاغر (সাগের) বলা হয়েছে। কামুস সহ অন্যান্য বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে صاغر বলা হয়েছে সে ব্যক্তিকে যে অপমানিত অবস্থায়ও খুশি থাকে।

এর দ্বারা একথা জানা যায় যে, অহংকারী এবং সম্মানের মিথ্যা দাবীদারের জন্যে অপমান অবশ্যম্ভাবী, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন, সে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি সে বড় হয়। পক্ষান্তরে যে অংহকার করে আল্লাহ পাক তাকে অপমানিত করেন, সে নিজের খেয়ালে বড় হয় কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর ও শুকরের চেয়েও অপমানিত হয়। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে ব্যক্তি মন্দ যে অহংকার করে এবং মহান আল্লাহকে ভুলে যায়।

قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

অভিশপ্ত ইবলিসকে যখন বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হল তখন সে একটি আরজী পেশ করলো আর সে আরজী হল, যেদিন কবর থেকে মানুষের পুনরুত্থান হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, অর্থাৎ সেদিন পর্যন্ত আমাকে জীবিত থাকার সুযোগ দিন। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, ইবলিস তার অহংকার এবং ঔদ্ধত্যের কারণে অপমানিত এবং অভিশপ্ত হল তখনও সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলো আর সে আরজী হলো কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া। আল্লাহ পাক তার এ আরজী মঞ্জুর করলেন।

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ.

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তোমাকে সময় দেয়া হল কত সময় দেয়া হল একথা আলোচ্য আয়াতে নেই, তবে অন্য আয়াতে বিষয়টি এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ.

অর্থাৎ তোমাকে সময় দেয়া হল একটি নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ নিদৃষ্ট কাল কতদিন তা আল্লাহ পাকই জানেন যা মানুষকে জানানো হয়নি। অথবা এ সময় হল তখন যখন কেয়ামতের জন্যে প্রথম শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সমস্ত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহর অনুগত হওয়া জরুরী নয়। আল্লাহ পাকের মর্জি হলে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এমনকি কাফেরের দোয়াও

কবুল করেন যেন তাকে আরও গাফলতের আবর্তে নিপতিত রাখা হয়।[১] দুনিয়াতে কাফেরের দোয়া কবুল হতে পারে যেমন অভিশপ্ত ইবলিসের দোয়াও কবুল হয়েছে কিন্তু আখরাতে কোন কাফেরের দোয়া কবুল হবে না। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ পাক ইবলিসের আরজীর জবাবে আমি তোমাকে অবকাশ দিলাম, انى انظرتك বলেননি; বরং বলেছেন اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ "নিশ্চয় তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে"। অর্থাৎ তোমার দরখাস্তের কারণে তোমাকে অবসর দেয়া হয়েছে তা নয়, বরং তোমাকে বহিস্কার করা এবং অবকাশ দেয়া তকদীরে এলাহিতে পূর্বেই স্থির ছিল। এ ঘোষণা দ্বারা পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তেরই বহিঃপ্রকাশ হল।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক মানুষ ও জ্বীন জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

(এবং আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করেছি) আলোচ্য আয়াতের يَعْبُدُوْن শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন يَعْرِفُوْن অর্থাৎ যেন সৃষ্টি জগৎ তাঁর অনন্ত অসীম গুণাবলীর পরিচয় লাভ করে, আল্লাহ পাকের জ্ঞানের গুণের পরিচয় লাভই হল বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন নেককার-বদকার, ভাল-মন্দ, কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ, বাধ্য-অবাধ্য, সকলের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। যারা আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা তাঁর বিদ্রোহী তারা তাদের ছলবল কৌশল ব্যবহার করবে অবাধে, অবশেষে যারা নেককার, যারা আল্লাহর অনুগত তারা লাভ করবে সাফল্যের মনি-মানিক্য আর যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ পৌত্তলিক বা বিদ্রোহী তাদের জীবন হবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যারা বিবেকবান যারা পরিণামদর্শী, তারা শতবার চিন্তা করবে যে আমিতো এ পৃথিবীতে ছিলাম না, অহরহ অনেকেই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিচ্ছে তাহলে কার ইচ্ছায় আমার এখানে আগমন? কার কাছে এখান থেকে গমন? কি উদ্দেশ্যে আমার সৃজণ? আমার দ্বারা কি আমার সৃজণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে? এবং যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন আমি কি তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলি? আমি কি তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সচেষ্ট হই? পক্ষান্তরে যারা নির্বোধ, যারা অপরিণামদর্শী তারা আদৌ এসব কথা চিন্তা করেনা। তারা শয়তানের অনুগামী হয়, তারা বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত মুগ্ধ এবং মত্ত থাকে। ভবিষ্যতের কথা আদৌ চিন্তা করে না। তাদের নেতৃত্ব করে ইবলিস শয়তান তাই ভাল-মন্দের তারতম্যের জন্যে পাপাচারের মূল উৎস ইবলিস শয়তানের এ অবকাশ অনিবার্য।[২]

যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধ এবং আল্লাহ পাকের মনোনীত নবী রসূল আদি পিতা আদম (আঃ)-এর কারণেই ইবলিস বিতাড়িত এবং বহিস্কৃত হয়েছে, তাই ইবলিসের যত শত্রুতা তা আদম (আঃ)-এর সাথে, এজন্যে সে বলেছে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়:

১। তফসীরে মাহারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৭৯
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৯৬

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ.

হেহেতু তুমি আমাকে পথ হারা করেছ তাই আমিও তোমার সরল পথে তাদের জন্যে ওঁত পেতে থাকব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত করবো। শয়তান এর দ্বারা আদম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ও আদম সন্তানদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ, জিঘাংসা এবং প্রতিহিংসা প্রকাশ করেছে এবং মানব জাতির বিরুদ্ধে তার দৃঢ় সংকল্পের কথা এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, মানব জাতির কারণে যখন আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমিও তাদের সর্বনাশ করবো। তাদের সম্মুখে পেছনে, ডানে বামে আমি তাদের প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করবো, আমি তাদের দিয়ে দোযখ পরিপূর্ণ করবো।

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ.

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে ইবলিস আদম সন্তানদের চরম ক্ষতি সাধনের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেছে। তাদের সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডানে এবং বামে এককথায় তাদের প্রতি সর্বদিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার এবং আল্লাহর দুশমন রূপে তৈরী করার সর্ব প্রকার চেষ্টা করব। ইবলিস উপরের দিকের কথা উল্লেখ করেনি কেননা, উপরের দিক থেকে আল্লাহর রহমত আসে। নিচের দিকের কথা সে বলে নাই, কেননা অহংকারের কারণে সে নিচের দিক থেকে আসবে না। তফসীরকারগণ এ বাক্যগুলোর একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। আল্লামা বগভী আলী এবনে তালহার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ বাক্যাংশের অর্থ হল مِنْ قِبَلِ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ আখেরাতের ব্যাপারে আমি মানুষকে সন্দিহান করে দেব যেন তারা আখেরাত বা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ না করে। আর مِنْ خَلْفِهِمْ এ বাক্যাংশের অর্থ হল من دنياهم অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যাপারে তাদেরকে আকৃষ্ট করব, দুনিয়ার লোভ-লালসায় তাদেরকে এত মত্ত করব যে, তারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে, পরকালকে ভুলে যাবে এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবন-যাপন করবে এবং عن ايمانهم এর অর্থ হল দ্বীনি বিষয়কে আমি সন্দেহের বিষয় বানিয়ে দেব এবং তাদের নিকট তা অস্পষ্ট বিষয় হয়ে যাবে, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে তারা পার্থক্য করতে পারবেনা আর عن شمائلهم অর্থ তাদেরকে আমি পাপাচারে লিপ্ত করব। এ বাক্য সমূহের ব্যাখ্যা আতীয়্যা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তরফ থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। من بين ايديهم এর অর্থ হল তাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত এভাবে বসিয়ে দেব যে, তারা আখেরাত ভুলে যাবে, আদম সন্তানরা মোহান্ধ হয়েই জীবন অতিবাহিত করবে। আর من خلفهم অর্থ আখেরাতের ব্যাপারে আমি একথা বলব যে জান্নাতও নেই, দোযখও নেই এবং হাশরও হবে না। عن ايمانهم অর্থ নেক আমলের দিক থেকে অর্থাৎ নেক আমল থেকে তাদেরকে আমি বিরত রাখব।

আর عن شمائلهم অর্থ পাপাচারের দিক থেকে তথা পাপাচারে তাদেরকে লিপ্ত করব। কাতাদা (রঃ) উপরোল্লিখিত বাক্য সমূহের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

এরপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হে মানব জাতি! ইবলিস তোমার নিকট সবদিক থেকে আসতে পারে কিন্তু উপরের দিক থেকে আসতে পারেনা কেননা, উপরের দিক থেকে আল্লাহর রহমত আসে আর ইবলিসের এ শক্তি নেই যে, সে আল্লাহর রহমত এবং মানুষের মাঝে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

মুজাহেদ (রঃ) عن شمائلهم ও من بين ايديهم এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর অর্থ হল (ইবলিস বলছে) আমি সেদিক থেকে আসবো যেদিক দিয়ে মানুষ দৃষ্টিপাত করে। من خلفهم وعن شمائلهم এর অর্থ হল আমি সেদিক থেকেও আসবো যেদিকে সে দৃষ্টিপাত করেনা। এবনে জোরায়েহ মুজাহেদের একথার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর অর্থ হল মানুষ দেখতেও পারে, ক্ষেত্র বিশেষ সে দেখতে পারে না, সকল অবস্থায় ইবলিস তাকে প্রতারিত করবে।

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

শয়তান তখন একথাও বলে যে, আমি মানব জাতিকে প্রতারণা করার ব্যাপারে সফল হবো। হে প্রতিপালক! আপনি মানব জাতির অনেককেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। তারা হবে আপনার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ। ইবলিসের একথা ছিল নিতান্ত ধারণার ভিত্তিতে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا.

আর ইবলিস মানব জাতির ব্যাপারে তার ধারণাকে সত্য পেয়েছে, তারা ইবলিসের অনুসরণ করেছে। মোমেনদের একটি দল ব্যতীত।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا.

তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে ইবলিস! যদি তোর কথাই সত্য হয়, যদি অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ হয় তাতে আমার কি আসে যায়! তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হয়ে আর একথা জেনে রাখ যারা তোর অনুসারী হবে আমি তাদের সকলকে দিয়ে দোযখ পরিপূর্ণ করবো। আর যারা হবে ঈমানদার, সংখ্যায় তারা কম হলেও অবশেষে তারাই হবে সফলকাম।

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ
عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ
لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۭ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ
اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(১৯) আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে অবস্থান কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা আহার কর কিন্তু ঐ বৃক্ষের কাছেও যেয়োনা। অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২০) অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের নিকট প্রকাশ করার জন্যে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বললো তোমরা দু'জন ফেরেশতা অথবা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে বলেই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(২১) এবং তাদের নিকট শপথ করে বলে, নিশ্চয় আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন।

(২২) এভাবে শয়তান তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে আকৃষ্ট করে, এরপর যখন তারা ঐ বৃক্ষ-ফলের আস্বাদন করে তখন তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তারা বেহেশতের পাতা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগে। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি? আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং যেখানে ইচ্ছা যা ইচ্ছা আহার কর তবে ঐ বৃক্ষটির কাছেও যেয়োনা। যদি তা কর তবে তোমরা নিজেদের প্রতিই অত্যাচারকারী হবে।

যেহেতু ইবলিস হযরত আদম (আঃ)-এর কারণেই ধিকৃত এবং অভিশপ্ত হল তাই হযরত আদম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তার অন্তরে জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার অগ্নি প্রজ্বলিত হল। এজন্যে সে চিন্তা করতে লাগল কিভাবে প্রতারণা করে হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁর এ উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করবে। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। জান্নাতের অবস্থানকালকে তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত মনে করতেন কেননা, জান্নাতে অবস্থানকালকে তিনি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের কারণ মনে করতেন। শয়তান মনে করল আদম (আঃ)-কে জান্নাতের চিরস্থায়ী অধিবাসী হওয়ার কথা বলে প্রতারণা করা যেতে পারে। তাই সে আগে আল্লাহর নামে শপথ করে নিল এবং বলল দেখ আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী।

يَاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ.

আমি কি এমন পন্থা তোমাদেরকে বাতলাব? যার মাধ্যমে তোমরা চিরদিন বেহেশতবাসী হয়ে থাকবে। অথবা তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে এবং ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকবে। সর্বদা জান্নাতে বাস করবে এবং আল্লাহ পাকের চির নৈকট্য লাভে ধন্য হবে।

যেহেতু হযরত আদম (আঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম পরিপূর্ণ ছিল, তাই আদৌ তিনি এ ধারণা করতে পারেননি যে, আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম নিয়ে কেউ মিথ্যা শপথ করতে পারে। এজন্যে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) ইবলিস শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হলেন। ইবলিসের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন। যেহেতু এ কাজটি আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ ছিল তাই এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আদম ও হাওয়ার শরীর থেকে বেহেশতী লেবাস সরে গেল। তাই তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং বেহেশতের বাগানের বৃক্ষের পাতা দিয়ে নিজ নিজ দেহ ঢাকতে লাগলেন এবং লজ্জিত অবস্থায় বেহেশতের বাগানের দিকে ধাবমান ছিলেন। তখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে ডাক দিয়ে বললেনঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিনি যে ঐ বৃক্ষের কাছেও যেয়োনা? আমি কি বলিনি যে শয়তান সব ব্যাপারেই তোমাদের দুশমন, তার প্রতারণা থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয়ো। তখন আদম ও হাওয়া (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমরা অন্যায় করেছি, আমরা তোমার মাগফেরাত এবং রহমতের আশা করি, আমরা ইবলিসের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করেছি, যদি আমাদের এ অপরাধ ক্ষমা না কর তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আর যদি আমাদেরকে দয়া করে ক্ষমা কর তবে আমাদের ক্ষতি লাভে পরিণত হবে।

যেহেত ইবলিস হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের চির নৈকট্য লাভের কথা বলে প্রতারণা করেছিল তাই তিনি আল্লাহ পাকের হুকুম ভুলে গিয়েছিলেন। তখন আদম (আঃ)-এর একথাও খেয়াল হয়নি যে, ফেরেশতারা যখন আমাকে সম্মানসূচক সেজদা দিয়েছে, তখন ফেরেশতা হওয়ার আর কি প্রয়োজন রয়েছে? এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.

অর্থা-"আদম ভুলে গেছে, আমি তার কোন সংকল্প লক্ষ্য করিনি"। যদিও ভুলক্রমে এ অন্যায় কাজটি হয়েছে আর ভুলক্রমে হওয়ার কারণেই তাকে পাপকার্য বলে অভিহিত করা যায় না। কেননা, পাপ বলা হয় তাকে, যা ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়। কিন্তু নবী রসূলেগণের শান হল এই যে, যখন তাঁদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তখন তাঁরা সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হন এবং সেই ভুল-ত্রুটির পক্ষে কোন ওজর-আপত্তি পেশ করাও আদবের খেলাফ মনে করেন। আর এটিই পার্থক্য হযরত আদম (আঃ) এবং ইবলিসের মধ্যে। ভুলক্রমে একটি অন্যায় কাজ হযরত আদম (আঃ)-এর দ্বারা হয়েছে কিন্তু যখনই তিন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন তখনই তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন।

পক্ষান্তরে, ইবলিস ইচ্ছা করেই আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছে, এরপর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে তার অন্যায়ের পক্ষে যুক্তি পেশ করেছে, তাই সে চির অভিশপ্ত হয়েছে। পবিত্র কোরআন এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে মানব জাতিকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, যদি তোমাদের দ্বারা কখনও কোন অন্যায় হয়ে যায় তবে আল্লাহ পাকের দরবারে অনতিবিলম্বে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তওবা এস্তেগফার কর, অন্যায়ের পক্ষে দলিল বা-যুক্তির অন্বেষণ করোনা। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়োসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون.

"তোমাদের প্রত্যেকেই গুনাহগার। তবে ভাল গুনাহগার সে, যে তওবা করে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়"।[১]

আম্বিয়ায়ে কেরামের যে উচ্চ মর্তবা এবং শান রয়েছে তার কারণে তাঁরা সর্বদা আল্লাহ পাককে ভয় করেন এবং সামান্য ত্রুটিকে অনেক বড় মনে করেন। হযরত মওলানা রুমী (রঃ) এ ঘটনাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

گرچہ یک موبد گنہ کوجستہ بود = لیک آں مودر دود دیدہ رستہ بود

অর্থাৎ যদিও হযরত আদম (আঃ)-এর দ্বারা যে গুনাহ হয়েছে তা একটি চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, কিন্তু সেই চুলটি চোখে ধরা পড়েছে। আমরা সর্বদা লক্ষ্য করি, মানব দেহের অনেক স্থানেই চুল থাকে, তাতে কারো কোন কষ্ট হয়না কিন্তু কারো চোখে যদি চুল প্রবেশ করে তবে অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাই মওলানা রুমী (রঃ) এর পরের পংক্তিতে বলেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮০

بود آدم دیدۂ نور قدیم = موئے در دیدہ بود کوہ عظیم

আদম (আঃ) ছিলেন চিরস্থায়ী নূরের চোখের ন্যায় আর চোখের ন্যায় নাজুক জিনিষের মধ্যে যখন চুল প্রবেশ করে তখন তা পাহাড়ের মত ভারী মনে হয়।

যাহোক, হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করলে আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাঁদের তওবা কবুল করেন এবং বলেন, "তোমাদের তওবা কবুল হল। কিন্তু তোমরা এখান থেকে নীচে চলে যাও।"

পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا.

"আমি বললাম তোমরা এখান থেকে নীচে চলে যাও"।

وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

আর পৃথিবীতে তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে এবং ঐ সময়ের জন্যে পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে রয়েছে ভোগ ও সম্পদ। হে আদম! তুমি পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি মনোনীত, তোমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে তোমাকে পৃথিবীতে যেতে হবে আর খেলাফতের এ দায়িত্ব প্রতিটি আদম সন্তানের উপর অর্পিত। তাই কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের পদচারণা হতে থাকবে। যদিও পৃথিবীতে আগমন একটি ভুলের মাশুল মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এতদ্বারা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হয়েছে। কেননা, বেহেশত থেকে বের হওয়া এবং পৃথিবীতে অবতরণ করা আদম (আঃ)-এর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে একান্ত জরুরী ছিল। এজন্যেই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

(হে মানব জাতি!) এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব এবং এরপর এই মাটি থেকে তোমাদের পুনরুত্থান করা হবে। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার পিতা আদমের অনুসারী হবে, (যে অনুসরণ করবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) সে জান্নাতে যাবে।

পক্ষান্তরে, যে তার পিতা আদমের পথকে ভুলে যাবে তথা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হবে না, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবেনা, তার জন্যে দোযখের কঠিন শাস্তি অবধারিত।[১]

তফসীরকারগণ হযরত আদম (আঃ)-এর এ ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেনঃ সকল আদেশ নিষেধ এক পর্যায়ের হয় না কোন কোন আদেশ অবশ্য পালনীয় হয় এবং তা পালন না করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। আর কোন কোন আদেশ পালন করলে পালনকারীর কল্যাণ লাভ হয়, না

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮-১৯

করলে তাতে কোন দণ্ড থাকেনা। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি আমরা বুঝতে পারি। একটি সরকারী আদেশ হল "বিনা টিকেটে ভ্রমণ করবেন না"। আর অন্য একটি আদেশ হল "যেখানে সেখানে থুথু ফেলবেন না। এতে রোগ ছড়ায়"। উভয় আদেশই সরকারী। কিন্তু প্রথম আদেশ অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আদেশটি অমান্য করলে ভ্রমণকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। হযরত আদম (আঃ) তাঁর প্রতি ঐ আদেশকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আদেশ মনে করতঃ আল্লাহ পাকের চির সান্নিধ্য লাভের আশায় শয়তানের প্ররোচনায় ঐ ভুল করে বসেন।[১]

وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ.

"নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদনের পর তাঁদের নূরানী লেবাস যখন খসে পড়লো, তাঁরা জান্নাতী বৃক্ষের পাতা দ্বারা নিজেদের দেহকে আবৃত করতে লাগলেন"। এ আয়াতাংশের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন যে, দেহকে আবৃত রাখা মানুষের স্বভাবগত বিষয়। আর নগ্নতা স্বভাব বিরোধী কাজ। হযরত আদম (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে এ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, এজন্যেই তাঁরা দ্রুত গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।[২]

অতএব, বর্তমান যুগে নগ্নতা, নির্লজ্জতা এবং অশ্লীতার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মানবতা বিরোধী কাজ। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান যুগে আধুনিকতার নামেই যাবতীয় মানবতা বিরোধী কাজ হচ্ছে। এতে রয়েছে মানবতার অবমাননা এবং ইবলিসী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।[৩]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) উচ্চতায় একটি খেজুর বৃক্ষের ন্যায় ছিলেন। মাথায় ছিল লম্বা চুল। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর যখন দেহ অনাবৃত হল তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং যে ভুল তাঁর দ্বারা হয়েছে তার পরিণতি স্বরূপ শরীরের সকল অঙ্গ প্রকাশিত হল। তিনি পলায়নপর হয়ে একটি বাগানে পৌঁছলেন। একটি বৃক্ষের ডালার সঙ্গে তার চুল ফেসে গেল, তিনি বৃক্ষটিকে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। বৃক্ষটি বললো না, ছাড়বনা তখন আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বললেনঃ

وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ.

"আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করিনি? আমি কি বলিনি শয়তান তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য শত্রু"? এবং আল্লাহ পাক একথাও বললেন, হে আদম! তুমি কি আমার নিকট থেকে পলায়ন করছো? তিনি বললেন, হে পরওয়ারদেগার! না, তা নয়; বরং আমি লজ্জাবোধ করছি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম তা কি তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিলনা? আদম (আঃ) আরজ করলেন, নিশ্চয়

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৯৭
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৪৯
৩। তাফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৩২৭

যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হে পরওয়ারদেগার! আমার একথা জানা ছিলনা যে, কেউ তোমার পবিত্র নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, এখন তোমাকে ভুলের মাশুল আদায় করতে হবে এবং কষ্ট ভোগ করতে হবে। এরপর আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে পৃথিবীতে অবতরণ করতে হল, তাঁকে কৃষি কাজ শেখানো হল। তিনি জমীনকে পরিষ্কার করলেন, বীজ-বপন করলেন, চারা উঠলো, গাছে পরিণত হল, ফল ধরলো, ফল পাকলো, সে ফল তিনি কাটলেন। এরপর গম থেকে আটা তৈরী করলেন তা দিয়ে রুটি তৈরী হল আর তা আহার করে ক্ষুধার কষ্ট থেকে নাজাত পেলেন।

হযরত আদম (আঃ) যখন তাঁর ভুল উপলব্ধি করলেন তখনই তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার শুরু করলেন, অথচ ইবলিস অহংকার করলো। আল্লাহ পাক হযরতে আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করলেন আর ইবলিস ক্ষমা প্রার্থী হলোনা; বরং কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার জন্যে আরজী পেশ করলো, আল্লাহ পাক তার আরজীও গ্রহণ করলেন। বর্ণিত আছে যখন হযরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন তখনই আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কেন তা করলে? আদম (আঃ) তখন একথাও বলেছিলেন, হাওয়া আমাকে উৎসাহিত করেছিলো। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছিলেন, এর শাস্তি হল গর্ভধারণের সময় তার কষ্ট হবে এবং শিশুর জন্মের সময়ও তার কষ্ট হবে। হাওয়া তখন কাঁদতে লাগলেন। আদেশ হল এ অবস্থা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হলে আল্লাহ পাক তাঁকে একটি দোয়া শিক্ষা দিলেন। তখন সে দোয়া করলে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন এবং হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-কে ক্ষমা করলেন।[১] তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا
تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০

তরজমা

(২৩) তারা উভয়ে বললো, হে পরওয়ারদেগার! আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি, যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়াদ্র না হও তবে নিঃসন্দেহে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(২৪) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তোমরা নিচে নেমে যাও একে অন্যের শত্রু হয়ে এবং পৃথিবীতে এক নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের অবস্থান এবং ভোগ-সম্পদ রইল।

(২৫) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, পৃথিবীতে তোমরা জীবন-যাপন করবে আর সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। আর তা থেকে তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।

(২৬) হে বনী আদম! আমি তোমাদেরকে দান করেছি পোশাক, তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশ-ভূষার জন্যে। আর পরহেযগারীর পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট। মানুষ যেন উপদেশ গ্রহণ করে এজন্যেই আল্লাহ পাকের কুদরতের এ সমস্ত নিদর্শন।

তফসীরুল কোরআন

হযরত আদম এবং হাওয়া (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন, 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছি, নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে মাফ না কর, আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি সগীরা গুনাহ মাফ না হয় তবে তার শাস্তি হতে পারে।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন যে, এ ঘটনা ঘটে হযরত আদম (আঃ)-এর নবুওয়্যত লাভের পূর্বে।[২]

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا.

"হে পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের প্রতি জুলুম করেছি"।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "জুলুম" শব্দটির অর্থ ক্ষতি, ত্রুটি। এতদ্ব্যতীত জুলুমের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে শেরককে "জুলমে আজিম" বা "মহা পাপ" বলেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

(নিশ্চয় শেরক হল মহা পাপ) আর অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক কণা মাত্রও জুলুম করেন না"।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০১
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫০

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জুলুম বা ক্ষতি এত ক্ষুদ্রও হয় যেমন একটি বালু কণা। হযরত আদম (আঃ) তাঁর দোয়ায় যে জুলুম শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার মর্মকথা হল, হে পরওয়ারদেগার! আমরা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজেদের ক্ষতি করেছি। তোমার আনুগত্যে এবং শয়তানের বিরোধিতার মাধ্যমে আমাদের যে উচ্চ মর্তবা অর্জিত হয়েছে তা লাঘব হয়েছে। পরিণামে জান্নাতের পোষাক আমাদের দেহ থেকে সরে গেছে এবং তোমার নৈকট্যের বিশেষ স্থান থেকে আমাদেরকে দূরে চলে যেতে হচ্ছে এবং জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত থেকে আমরা মাহরুম হতে যাচ্ছি, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের প্রতি দয়া কর।[১]

মওলানা রুমী (রহঃ) বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

অদৃষ্টের লিখন কে করবে খন্ডন

তিনি বলেছেনঃ হযরত আদম (আঃ)-এর যে ঘটনা আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হল সম্পূর্ণ তকদীরি বিষয় তথা অদৃষ্টের লিখন, আর তা খন্ডন করার ক্ষমতা কারোই নেই। মওলানা রুমীর ভাষায়ঃ

چوں قضا آید شود دانش بخواب = مہ سیہ گردد بگیرد آفتاب

যখন তকদীর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন বিবেক বুদ্ধি ঘুমিয়ে পড়ে আর তার অনুভূতিও বিদায় নেয়। আল্লাহর হুকুমেই চন্দ্র গ্রহণের সময় তার জ্যোতি লোপ পায়। এমনিভাবে সূর্য গ্রহণের সময় তার আলো নিস্প্রভ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের বিবেক যা চন্দ্র সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়, কিন্তু আল্লাহর হুকুমে চন্দ্র সূর্য শুধু আলো বিহীন হয়না; বরং অন্ধকার হয়ে যায়। হযরত আদম (আঃ) এত বড় জ্ঞানী গুণী হওয়া সত্ত্বেও তকদীরের সিদ্ধান্তের কারণে তিনি নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারেননি। তাই মওলানা রুমী (রঃ) পরবর্তী পংক্তিতে বলেছেনঃ

ابوالبشر کو علم الاسما بگ است = صد ہزاراں علمش اندر ہر رگ است

আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا.

এবং আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে পৃথিবীর সব কিছুর নাম এবং গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছেন। এলম তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

چشم آدم چوں بنور پاک دید = جان و سر نامہا گشتن پدید

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১-২২

হযরত আদম (আঃ)-এর নয়ন যুগল আল্লাহর নূর দ্বারা আলোকিত ছিল। তিনি যখন সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন সমস্ত কিছুর রহস্যই তাঁর নিকট উদঘাটিত হয়। অতএব, হযরত আদম (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা এজন্যে ছিল যে, তিনি আল্লাহর নূর এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম এলমের প্রকাশ মাধ্যম মনোনীত হয়েছিলেন। তাই মওলানা রুমী বলেছেনঃ

چوں ملک انوار حق بروے بتافت = در سجود افتاد ودر خدمت شتافت

যখন ফেরেশতারা হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ পাকের নূর উদ্ভাসিত দেখলেন তখন তারা সেজদায় রত হলেন এবং তাঁর সেবায় অগ্রসর হলেন।

این ہمہ دانست وچوں آمد قضا = دانش یک نہی شد بروئے غطا

যদিও হযরত আদম (আঃ) সব বিষয়ের এলম হাসিল করেছিলেন এবং সমস্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু অদৃষ্ট বা তকদীর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং আল্লাহ পাকের নিষেধাজ্ঞার এলম তাঁর নিকট থেকে সাময়িকভাবে দূরীভূত হয় এবং তাঁর এলমের উপর একটি আবরণ এসে পড়ে। পরিণামে ইবলিস দ্বারা তিনি প্রতারিত হন।

کاے عجب نہی از پئے تحریم بود = یا بتاویلے بدو توہسیم بود

হযরত আদম (আঃ) কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন যে, আল্লাহ পাকের এ নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য কি? এ নিষেধাজ্ঞার কারণে ব্যক্তিগতভাবে ঐ বৃক্ষের নিকট গমন করা কি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, নাকি এর রূপক অর্থ রয়েছে। হযরত আদম (আঃ) এ ধারণা করেছেন, হয়তো এ নিষেধাজ্ঞার কোন বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ঐ বৃক্ষের ফল আহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নাও হতে পারে। হয়তো বিশেষ কোন হেকমতের প্রেক্ষিতে আপাততঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

যাহোক, হযরত আদম (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ পাকের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে এ সন্দেহে পড়েছেন যে, হয়তো এই নিষেধাজ্ঞা শুধু আমার প্রতি আল্লাহ পাকের দয়ার বহিঃপ্রকাশ। এজন্যে আমার যোগ্যতার অভাবে হয়তো এ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ আমার জন্যে সহনীয় হবে না। এ নিষেধাজ্ঞার বরখেলাফ করা পাপকার্য বলে বিবেচিত হবে না। মওলানা রুমী (রঃ) পরবর্তী বাক্যে বলেছেনঃ

دردلش تاویل چوں ترجیح یافت = طبع در حیرت سوئے گندم شتافت

হযরত আদম (আঃ)-এর মনে নিষেধাজ্ঞার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে তাঁর মন গন্দম খাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। পরিণামে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বেহেশতী পোষাক দেহ থেকে খসে পড়েছে এবং বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের আদেশ হয়েছে। কেননা, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলের বৈশিষ্ট্য হল এই ফল যে খাবে অবশ্যই তাকে পৃথিবীতে অবতরণ করতে হবে।

হযরত আদম (আঃ) যখনই উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গেছে তখনই তিনি তওবা এস্তেগফার শুরু করেছেন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর তওবা কবুল করে তাঁকে ক্ষমা করেছেন। মওলানা রুমী (রঃ) হযরত আদম (আঃ)-এর এ ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন পরবর্তী পংক্তিতেঃ

باغباں راخار چوں در پائے رفت = دزد فرصت یافت کالا برد تفت

এ ঘটনার দৃষ্টান্ত হল এই যে, এক বাগানের মালিক বাগান পরিদর্শনে গেছেন। ঘটনাক্রমে তাঁর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হল। তিনি কাঁটা খুলতে সচেষ্ট হলেন। এই সুযোগে চোর বাগানের মালপত্র নিয়ে অতিদ্রুত পলায়ন করল। ঠিক এভাবে হযরত আদম (আঃ) ছিলেন এলম এবং মা'রেফাতের বাগানের মালিক। ওয়াস ওয়াসার কাঁটা তাঁর অন্তরের পায়ে বিদ্ধ হল। তিনি সেই কাঁটা বের করতে মশগুল হলেন। এই সুযোগ অভিশপ্ত শয়তান তাঁর আরাম, শান্তি এবং অবস্থানের যাবতীয় সুখ-সামগ্রী চুরি করে পলায়ন করল।

چوں ز حیرت رست باز آمد براہ = دید بردہ دزد درخت از کارگاہ

যখন হযরত আদম (আঃ)-এর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব শেষ হল এবং সত্য তাঁর নিকট দিবালোকের মত সুস্পষ্টভাবে ধরা দিল তখন তিনি দেখলেন, চোর বাগান থেকে মালপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে। হযরত আদম (আঃ) মর্মে মর্মে অনুভব করলেন যে যা কিছু হয়েছে তা শয়তানের প্রতারণা ছিল। সে চেয়েছিল আমাকে জান্নাত থেকে মাহরুম করতে। তাই হযরত আদম (আঃ) অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বললেনঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا.

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। তাই পরবর্তী পংক্তিতে তিনি বলেনঃ

ربنا انا ظلمنا گفت وآہ = یعنی آمد ظلمت و گم گشت راہ

অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) অত্যন্ত লজ্জিত, অনুতপ্ত এবং ব্যতীত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমার বিবেক বুদ্ধির ওপর জুলমত বা অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। ক্ষণিকের জন্যে আমার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, পরিণামে আমি সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। একথা বলে আদম (আঃ) ক্রন্দন করছিলেন এবং নিজের ভুলের জন্যে আক্ষেপ করছিলেন।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আদম (আঃ) স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে বলেছেনঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا.

হে পরওয়ারদেগার! আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। পক্ষান্তরে, ইবলিস শুধু যে অপরাধ স্বীকার করেনি তাই নয়; বরং সে অন্যায়ের সম্পর্ক আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। সে বলেছে–

رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ.

(হে পরওয়াদেরগার! তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছে) তাই মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেনঃ

گفت شیطاں کہ بما اغویتنی = کرد فعل خود نہاں وبودنی

শয়তান بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ বলে নিজে অন্যায়কে গোপন করতে চেয়েছে এবং নিজের অন্যায়কে আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

گفت آدم کہ ظلمنا انفسنا = اوز فعل حق نہ بد غافل چوما

পক্ষান্তরে, হযরত আদম (আঃ) رَبَّنَا ظَلَمْنَا বলে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারের আদব রক্ষা করেছেন। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁকে পৃথিবীতে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন আর শয়তান তার অহংকার ও বেয়াদবীর কারণে চির ধিকৃত ও অভিশপ্ত হয়েছে।

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ.

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ তোমরা নীচে নেমে যাও পরস্পর শত্রু হয়ে।

তফসীরকারগণ এ আদেশ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, এ আদেশ আদম হাওয়া এবং ইবলিসের জন্যে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ ইবলিসকে ইতিপূর্বেই বের হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ আদেশ শুধু আদম ও হাওয়ার উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু তাঁদের সন্তান-সন্ততিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত তাই বহুবচনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে কেননা, হযরত আদম (আঃ)-এর অবতরণের অর্থ সমগ্র মানব জাতির অবতরণ।

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

আর পৃথিবীতে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের অবস্থান ও ভোগ-সামগ্রী রয়েছে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ পৃথিবী মানুষের চিরস্থায়ী আবাস স্থল নয়; বরং এ জীবন যেমন ক্ষণভঙ্গুর এ জগৎও ক্ষণস্থায়ী। অতএব, মানুষের কর্তব্য হল আত্মবিস্মৃত না হওয়া, বরং আত্মসংশোধনের মাধ্যমে আত্মোন্নতি লাভে সচেষ্ট হওয়া এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কেননা, সে মানুষের সুস্পষ্ট শত্রু। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ.

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ জমিনেই তোমাদেরকে জীবন-যাপন করতে হবে। আর সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অবশেষে ঐ জমীন থেকে তোমাদের পুনরুত্থান করতে হবে।

অর্থাৎ জীবন, মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান-এ তিনটি স্তরে মানব জীবন বিভক্ত। জীবনের অবসান ঘটবে মৃতুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে। কিন্তু এটি জীবনের শেষ কথা নয়; বরং মানুষকে হাযির হতে হবে কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। তখনই সিদ্ধান্ত হবে কে ভাল কে মন্দ, কে ভাগ্যবান আর কে হতভাগা, কে জান্নাতী আর কে দোযখী।

পবিত্র কোরআনের সূরা জুমআয় আল্লাহ্ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ.....

(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ তা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করবে। এরপর তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অবশেষে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করাবেন।

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا.

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্যে পোষাকের ব্যবস্থা করেছি যা তোমাদের দেহকে ঢেকে রাখে এবং তোমাদের ভূষণ হয়। আর পরহেযগারীর পোষাকই সর্বোত্তম। আর এসব আল্লাহ্ পাকের বিধান যেন তা মানুষ স্মরণ রাখে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ বর্বরতার যুগে মানুষ নগ্ন অবস্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফ করত, পুরুষরা দিনে এবং মেয়েরা রাতে তওয়াফ করত। নগ্ন অবস্থায় তওয়াফের কারণ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, যে পোষাক পরিহিত অবস্থায় আমরা পাপাচারে লিপ্ত হই সে পোষাক পরিধান করে আমরা পবিত্র কা'বা শরীফের তওয়াফ করব না। এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্যে পোষাক সৃষ্টি করেছি অতএব, তোমরা পোষাকের মাধ্যমে নিজের দেহকে আবৃত রাখ এবং এই পোষাক তোমাদের জন্যে ভূষণও বটে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا.

এর অর্থ এই নয় যে, আসমান থেকে আল্লাহ্ পাক পোষাক নাযিল করেছেন, বরং এর অর্থ হল আমি তোমাদের জন্যে পোষাক পরিধানের আদেশ নাযিল করেছি অথবা এর অর্থ

হল আসমান থেকে এমন উপকরণ নাযিল করেছি যারা দ্বারা পোষাক তৈরী হয়। যেমন বৃষ্টি আসমান থেকে বর্ষিত হয়, তার দ্বারা এমন কিছু উৎপন্ন হয়, যা কাপড় তৈরীর উপকরণ হয়।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মানব দেহের বিশেষ অংশগুলো অনাবৃত উম্মুক্ত রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শয়তান মানুষকে যে প্ররোচনা দেয় তার পরিণতি স্বরূপ আসে নগ্নতা। শয়তান আদম ও হাওয়াকে প্রতারণা করে, যার পরিণামে তাদের দেহ থেকে বেহেশতী লেবাস খসে পড়ে এবং ক্ষণিকের জন্যে তাঁদেরকে নগ্ন হতে হয়। আজও শয়তান আদম সন্তান-সন্ততিকে নগ্নতায় আকৃষ্ট করে।

আলোচ্য আয়াতে رِيْشًا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল উত্তম পোষাক। (কামুস) অথবা এর অর্থ সৌন্দর্য। (বয়যাবী) অথবা ধন-সম্পদ। এ মত পোষণ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)।

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ.

"আর পরহেযগারীর পোষাক সর্বোত্তম"। এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম একাধিক মত পোষণ করেছেন। কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, তাকওয়ার পোষাকের ব্যাখ্যা হল ঈমান। হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে, এর অর্থ হল লজ্জা। কেননা, লজ্জাই পরহেযগারীর কারণ হয়। আতীয়্যা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এর অর্থ হল নেক আমল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো সুন্দর নকশা।

হযরত ওরওয়াহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেছেনঃ "লেবাসুত তাকওয়া"র অর্থ হলো আল্লাহর ভয়।

কালবী (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো নৈতিকতা তথা চরিত্রের পবিত্রতা, কেননা এটিই সুন্দরতর ভূষণ। এবনুল আম্বারী বলেছেন, এর অর্থ হলো সেই পোষাক যা পরিধানের জন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে তাগিদ করা হয়েছে।

আর যায়েদ এবনে আলী (রঃ) বলেছেনঃ যুদ্ধ পোষাক যা যুদ্ধাবস্থায় নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিধান করা হয়। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো সেই মোটা কাপড় যা সাধারণতঃ দুনিয়াত্যাগী লোকেরা পরিধান করে থাকে।[১]

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৪
তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৫২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-১০৪

অর্থাৎ মানব জাতির জন্যে পোষাকের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য নিদর্শন সমূহ মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দান এবং রহমতের সুস্পষ্ট প্রমাণ, যাতে করে তোমরা তাঁর নেয়ামতের পরিচয় পাও এবং উপদেশ গ্রহণ কর ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক।

তাকওয়ার পোষাক

لِبَاسُ التَّقْوٰى

তাকওয়ার পোষাক সম্পর্কে যদিও তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু আমরা এর মর্মকথা সহজে যা বোঝা যায় তা হল সততা এবং সাধুতার পোষাক। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যেভাবে মানুষের দৈহিক অংগাবরণ বা পোশাক থাকে তেমনি মানুষের অভ্যন্তরীণ পোষাকের ব্যবস্থাও রয়েছে। সে পোষাকটির নামই হল তাকওয়া বা পরহেযগারী। মানুষের নৈতিক মান যত উন্নীত হবে মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় ও মহব্বত যত বেশী হবে তার তাকওয়া পরহেযগারীর মানও তত উন্নীত হবে।

যেভাবে দৈহিক পোষাকে মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি সততা, সাধুতা, আন্তরিকতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা, অল্পে সন্তুষ্টি, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকার প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তার চারিত্রিক সৌন্দর্য লাভ করে। হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, সার্থপরতা, হীনমন্যতা, ক্রোধ, লোভ-মোহ তথা যাবতীয় চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানুষ সাধুতার পোষাক বা তাকওয়ার লেবাস অর্জন করতে পারে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন এবং মানসিক সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য হাসিল হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছিলেন তা হল–

লেবাসুত তাকওয়া বা সাধুতার পোষাক। পবিত্র কোরআন বিষয়টির উপর কত বেশী গুরুত্বারোপ করে তা অনুধাবন করার জন্যে সূরা বাকারার প্রথম আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট। এরশাদ হয়েছে–

الٓمّٓ . ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

আলিফ লাম মিম, এই কিতাব এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, এই কিতাব পথ প্রদর্শক তাদের জন্যে যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে তথা যারা সততা ও সাধুতার পোষাক পরিধান করে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআন দ্বারা হেদায়েত লাভের জন্যে পরহেযগারীর লেবাস অর্জন করা পূর্ব শর্ত।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, শয়তান হযরত আদম (আঃ)-কে প্রতারণা করে তাঁর বেহেশতী পোষাক সরিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ্ পাক মানুষকে পোষাক তৈরীর পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যে পোষাকের মাধ্যমে তাকওয়া পরহেযগারী সংরক্ষিত হয় সেই পোষাক পরিধানের তাগিদ করা হয়েছে। যেমন পুরুষের জন্যে রেশমী কাপড়ের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান না করার তাগিদ রয়েছে। আর নারীদেরকে এমন পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে যার কারণে তার দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে তাকওয়া পরহেযগারী থাকে তারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নিষিদ্ধ কোন প্রকার পোষাক ব্যবহার করে না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ তথা হে আদম সন্তান! বলে সম্বোধন করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতে আদি পিতা আদম (আঃ) আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে ইবলিস তাঁদেরকে প্রতারণা করেছে এবং কিভাবে তাঁদেরকে বেহেশত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করতে হয়েছে তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। তাদের পূর্বে অভিশপ্ত ইবলিসও পৃথিবীতে এসেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বনী আদম বলে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সম্বোধন করে ইবলিসের প্রতারণা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করেছেন। এ পর্যায়ে চারটি আয়াতে চার বার يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ বা হে আদম সন্তানগণ! বলে খেতাব করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ রয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয়ঃ অক্ষরটি আরবী ভাষায় দূরের কাউকে ডাক দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে এদিকে যে, যারা অন্যায় অসুন্দর কাজে মশগুল হয় তারা মানবতার স্বভাব থেকে দূরে। তাই তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে يَا বলে ডাক দেয়া হচ্ছে, এ পর্যায়ে প্রথম ডাক হল আলোচ্য আয়াতে :

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا.

আর দ্বিতীয় ডাক হল পরবর্তী আয়াতে :

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ

আর তৃতীয় ডাক হল :

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

এবং চতুর্থ ডাক হল :

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ.

প্রথম ডাকে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের জন্যে পোষাক অবতরণ করেছি যা তোমাদের লজ্জা স্থানকে গোপন করে রাখে এবং তোমাদের জন্যে ভূষণ হয় আর এ প্রকাশ্য পোষাক ব্যতীত আরেকটি অভ্যন্তরীণ পোষাক রয়েছে যাকে পরহেযগারীর পোষাক বলা হয়। আর পরহেযগারীর পোষাক সর্বোত্তম। এর মধ্যে ঈমান, নেক আমল এবং আল্লাহ পাকের ভয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এজন্যে কবি বলেছেনঃ

اذا انت لم تلبس ثيابا من التقى

عريت وان وارى القميص قميص

যদি তুমি পরহেযগারীর পোষাক পরিধান না কর তবে প্রকৃত অবস্থায় তুমি নগ্ন। যদিও পোষাকের উপর পোষাক পরিধান করে থাকো।

অতএব, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। এটি মানবতার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত পন্থা, আর এটিই জীবন-সাধনাকে সার্থক করার পন্থা আর এটিই পবিত্র কোরআনের আহ্বান।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ
كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ
اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا
عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ
اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۫
وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾ ؕ فَرِيْقًا هَدٰى وَ
فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৭) হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনভাবেই প্রলুব্ধ না করে। তোমাদের পিতা মাতাকে যেভাবে সে বেহেশত থেকে বহিস্কার করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান যেন তাদের দৃষ্টি গোচর হয় এজন্যে তাদের বস্ত্রাবরণ সরিয়েছিল। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। যারা ঈমান আনেনা শয়তানদেরকে আমি তাদের বন্ধু করেছি।

(২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে তা করতে দেখেছি আর আল্লাহ পাকও আমাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন। (হে রসূল!) আল্লাহ পাক কখনও মন্দ কাজের আদেশ দেননা। তোমরা আল্লাহ পাক সম্পর্কে কি এমন কথা বল যা তোমরা জাননা।

(২৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় বিচারের, আর তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় মুখ সোজা করবে আর একমাত্র তাঁরই একান্ত অনুগত হয়ে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবে পুনরায় তোমরা ফিরে আসবে।

(৩০) এক দলকে তিনি হেদায়েত করেছেন আর অপর দলের পথভ্রষ্টতা নির্ধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহ্ পাককে বাদ দিয়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল অথচ নিজেরা ধারণা করত যে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত।

তফসীরুল কোরআন

পবিত্র কোরআনে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল উপদেশ গ্রহণ করা। পরবর্তীতে যারা এসব ঘটনাবলী জানবে তারা সতর্ক হতে পারবে। হযরত আদম (আঃ)-এর এ ঘটনা বর্ণনার পর আদম সন্তানদেরকে সম্বোধন করে শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছেঃ হে বনী আদম! তোমরা তোমাদের আদি পিতার ঘটনা শ্রবণ করেছ অতএব, সতর্ক হও এবং সকল অবস্থায় এবং সকল কাজে ও কথায় শয়তানের ধোকাবাজী থেকে সাবধান থাক। তোমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে এই ইবলিস শয়তানই জান্নাতচ্যুত করেছে, তাঁদের জান্নাতী পোষাক তাঁদের দেহ থেকে সরিয়েছে। অতএব, মনে রেখো শয়তান তোমাদের পৈত্রিক শত্রু। তার সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। ইবলিস শয়তান এবং তার দল তোমাদেরকে এভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এজন্যে তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এমন অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁর সাহায্য-ধন্য হওয়াই আত্মরক্ষা করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়।

বস্তুতঃ যিনি স্বয়ং অদৃশ্য, যাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের এই ঘোষণা–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"কোন চোখ যাঁকে দেখতে পারেনা, তিনি সকল চোখকে দেখেন"। তিনি অতি সূক্ষ্ম, সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি মানুষের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত। অতএব, শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ঈমান এবং পরহেযগারীর প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

নিশ্চয় আমি তাদেরকে শয়তানের বন্ধু এবং অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি, যারা ঈমান আনেনা, যারা কাফের মুশরেক, বে-দ্বীন, পাপিষ্ঠ তারা শয়তানের অনুগত। তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করেনা।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا.

যখন তারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় যেমন নগ্ন অবস্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফ করে এবং তাদেরকে কেউ যদি এমন অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে তখন তারা এই অশ্লীল কাজের পক্ষে এই যুক্তি দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে এভাবে নগ্ন

অবস্থায় কা'বা গৃহে তওয়াফ করতে দেখেছি। শুধু তাই নয়; তারা একথাও বলে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দটির অর্থ মন্দ ও অশ্লীল কাজ। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা শেরক উদ্দেশ্য করা হয়েছে কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটির অর্থ হল নগ্ন অবস্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফ করা।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ সাধারণতঃ فَاحِشَةً শব্দটির মধ্যে সকল কবীরা গুনাহ্ অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন তারা কোন নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় এবং তাদেরকে নিষেধ করা হয় তখন তারা এর পক্ষে দু'টি দলিল পেশ করে। আমাদের পূর্বপুরুষকে এমন কাজ করতে দেখেছি অতএব, এ কাজ যত অন্যায়, অসুন্দর এবং অশ্লীলই হোক না কেন আমাদের নিকট অযৌক্তিক নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, যারা বেঈমান আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দেই। আর বন্ধু বানাবার পন্থা হল এই, তারা সত্যকে অপছন্দ করে এবং মিথ্যাকে ভালবাসে, শয়তানের প্রতারণায় মুগ্ধ মত্ত থাকে।

বস্তুতঃ এ কারণেই তারা নগ্ন অবস্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফ করার পক্ষে এমন খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করে।

এ সম্পর্কে তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হল আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ আদেশ দিয়েছেন। অথচ এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর কিছুই হতে পারে না। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ অন্যায় উক্তির জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ.

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কখনো নির্লজ্জ, অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তওয়াফ বা অন্য কোন পূণ্য কাজে নগ্নতা, সকল যুগেই সভ্য মানুষের চোখে নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। মানব সভ্যতা কোন দিনও এমন অন্যায় কাজকে সমর্থন করেনি। অতএব, এমন অন্যায় অশ্লীল কাজের নির্দেশ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আসবে এমন কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অবাস্তব এবং অচিন্তনীয়।

বর্বরতার যুগে পৌত্তলিক নর-নারীরা আপাদ-মস্তক উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা শরীফের তওয়াফ করে মানবতার যে অবমাননা করত তাতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি এমনকি, এমন অন্যায় কাজের আদেশ আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন বলেও দাবী করত। তাই আল্লাহ্ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেনঃ

أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"তোমরা কি আল্লাহ্ পাকের শানে এমন কথা বল যা তোমরা জাননা"।

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমান রাজী (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল তোমরা যে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বল তা কি তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে সরাসরি শ্রবণ

করেছ? নাকি কোন নবীর নিকট প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছ? আর একথা সর্বজন-বিদিত যে, উভয় পন্থার কোনটিই এখানে নেই, অতএব কেন তোমরা আল্লাহ পাকের শানে মিথ্যা কথা বল যা তোমরা জাননা। মনে রেখ, নির্লজ্জতা, নগ্নতা এবং অশ্লীলতা ইবলিস শয়তানেরই কাজ। এসব তারই শিক্ষা। আর পোষাক মানবতার বৈশিষ্ট্য এবং জান্নাতী আদর্শ। অতএব, শয়তানী শিক্ষা থেকে সর্বক্ষণ সতর্ক থাক। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ.

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক পবিত্র, তিনি কোন মন্দ কাজের আদেশ দেননা; বরং তিনি ন্যায় বিচারের আদেশ দেন।)

ন্যায় বিচার কায়েম করার আদেশ

আর ন্যায় বিচার হল আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। যিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব জগৎকে, যাঁর দানে ধন্য কুল মাখলুকাত, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। আলোচ্য আয়াতে القسط শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল ন্যায়বিচার। বিন্দুমাত্রও কমবেশী নয়, কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতীত ঠিক মাঝামাঝি অবস্থা, তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে القسط শব্দটির অর্থ হল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। আর যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এ শব্দটি দ্বারা তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ শব্দটির অর্থ সেই আমল যাতে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি নেই। কোন ধরনের ত্রুটি নেই এবং সীমালঙ্ঘনের প্রবণতাও নেই। শরীয়তের সমস্ত বিধানই এ মর্মে القسط এর অন্তর্ভুক্ত।[১]

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

অর্থাৎ নামায আদায়ের সময় তোমাদের মুখ যেন কা'বার দিকে থাকে। কোন কোন তফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সঠিকভাবে এবং একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে সর্বদা মনোনিবেশ করাই হল এ আয়াতের মর্মকথা।

মুজাহেদ এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল যেখানেই থাক নামাযের সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ কর। যাহ্যাক (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল যদি তুমি কোন মসজিদের নিকট থাক আর সেখানে নামাযের সময় হয় তখন তুমি ঐ মসজিদে নামায আদায় কর। একথা বলোনা যে, আমি নিজেদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করবো। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-ও এ মত প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি একথাও

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০৬-০৭

বলেছেন, যদি কেউ কোন মসজিদের ইমাম হয় আর সেই মসজিদে নামাযের ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এমন ব্যক্তির জন্যে কোন মসজিদে আযান হওয়ার পরও সেখান থেকে চলে যাওয়া বৈধ। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর এবাদতে সঠিকভাবে মনোনিবেশ কর, কা'বা শরীফের দিকে মুখ কর। আর একান্ত একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং এবাদতকে শেরক, রিয়া থেকে পবিত্র রাখ।

كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ.

অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবে তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যেভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন ঠিক এভাবে মৃত্যুর পরও তোমাদেরকে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের আমলের বদলা দান করবেন। প্রথম সৃষ্টির সঙ্গে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই যে, প্রথম সৃষ্টি যেখানে কোন নমুনা ব্যতীতই সম্ভব হয়েছে অতএব দ্বিতীয় সৃষ্টিও অতি সহজ ব্যাপার, আর আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, যেভাবে জন্মের সময় তোমরা নগ্ন অবস্থায় ছিলে পুনরুত্থানের সময়ও তোমরা নগ্ন থাকবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিনে তোমাদেরকে নগ্ন পা, নগ্ন দেহ অবস্থায় উঠানো হবে।

তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! পুরুষ এবং নারী উভয়েই? তিনি এরশাদ করলেন, আয়েশা! সেদিনের ব্যাপার এর চেয়ে অনেক কঠিন হবে (অর্থাৎ সেদিন কারো প্রতি কারো দৃষ্টিপাত করার অবসর হবেনা)। (বোখারী, মুসলিম)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়েছেন এবং এরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! তোমাদেরকে নগ্ন পায়ে পদব্রজে নগ্ন দেহে খতনা না করা অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছানো হবে। এরপর তিনি এ আয়াতাংশের তেলাওয়াত করেনঃ

كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ

সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পোষাক পরিধান করানো হবে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, কবর থেকে বের হওয়ার সময় মানুষ বস্ত্রাবৃত থাকবে। কিন্তু এরপর হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার প্রারম্ভে দেহ থেকে পোষাক সরে পড়বে। আর হাশরের ময়দানে নগ্ন অবস্থায় হাযির করানো হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘণিয়ে আসে তখন তিনি পোষাক আনার আদেশ দিলেন এবং তা পরিধান করে বললেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে সেই কাপড়েই উঠানো হবে যা পরিহিত অবস্থায় তার এন্তেকাল হয়। কোন কোন

তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যে হাদীসে এমন কথা রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে তার পোষাক পরিহিত অবস্থায় উঠানো হবে, তার অর্থ হল নেক আমল। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে তাকওয়া পরহেযগারীকে পোষাক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত যাবের (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন, মানুষ যে প্রকারের আমলরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে অবস্থায়ই তাকে উঠানো হবে। অর্থাৎ মোমেনকে ঈমানের অবস্থায় কাফেরকে কুফুরী অবস্থায়। হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা সে অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তন করবে যা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন।

মোহাম্মদ এবন কা'ব বলেছেন, যাকে আল্লাহ পাক অকল্যাণের উপর সৃষ্টি করেছেন সে অবশেষে মন্দ কাজের দিকেই যাবে। যদিও সে নেককারদের ন্যায় কোন কাজ করে থাকে। যেমন ইবলিস সে নেককারদের ন্যায় কাজ করতো কিন্তু অবশেষে মন্দ কাজের দিকেই চলে যায়। আর যাকে আল্লাহ পাক নেকী এবং কল্যাণের উপর সৃষ্টি করেছেন সে অবশেষে নেকীর দিকেই যাবে, যদিও তার দ্বারা মন্দ কাজ হয়ে থাকে। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় যে সব যাদুকর এসেছিল তারা মন্দ কাজেই লিপ্ত ছিল কিন্তু অবশেষে কল্যাণের দিকে ফিরে এসেছে। হযরত সাহল এবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ দোযখীদের মত কাজ করে অথচ অবশেষে জান্নাতীদের মধ্যে শামিল হয় আর কেউ জান্নাতীদের মত কাজ করে অথচ দোযখী হয়। কেননা গুরুত্ব হয় শেষ আমলের।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ.

অর্থাৎ আল্লাহ পাক কিছু লোককে হেদায়েত করেছেন আর কিছু লোকের গোমরাহী সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এদের পরিচয় হল এই যে,

اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

তারা আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা শয়তানকে আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, এতদসত্ত্বেও তারা এ ধারণা করে যে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মূর্খতা বা কোন বিষয়ে অবগত না হওয়া কৈফিয়ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কাফের যদি জন্মগতভাবে কাফের হয় অথবা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার জন্যে কাফের হয় সকল অবস্থায় তার শাস্তি অবধারিত।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ
اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا
وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ
اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

তরজমা

(৩১) হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাযের সময়ই তোমরা সুন্দর পোষাক পরিধান কর। পানাহার কর, অপচয় করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(৩২) (হে রসূল!) আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের জন্যে যে শোভা সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন এবং যে বিশুদ্ধ উপজীবিকা দান করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করলো? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, সমস্ত নেয়ামত মূলতঃ মোমেনদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে, বিশেষতঃ কেয়ামতের দিনে, এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আয়াত সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।

(৩৩) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীল কাজ তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে, পাপাচার, বাড়াবাড়ি এবং কোন কিছুকে আল্লাহ পাকের শরীক করা, যার কোন দলিল তিনি অবতীর্ণ করেননি। আর আল্লাহ পাকের সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা তোমরা জান না।

(৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই একটি সময় নিদৃষ্ট রয়েছে যখন সে সময় উপস্থিত হবে তখন এক মুহূর্ত বিলম্বও করতে পারবে না, আর এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারবে না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার বিবরণ এই, প্রাক-ইসলামী যুগে নর-নারী আপাদমস্তক নগ্ন অবস্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফ করতো, তারা যখন মিনায় পৌঁছতো তখন দেহের পোষাক খুলে ফেলত এবং নগ্ন অবস্থায় হরম শরীফে হাযির হত, তারা বলতোঃ যে পোষাক পরিহিত অবস্থায় পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছি সে পোষাকে আল্লাহর ঘরে হাযির হব না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ একথাও বলতো, যেভাবে আমরা পোষাক থেকে মুক্ত হয়েছি ঠিক তেমনি গুনাহ থেকেও মুক্ত হব। শুধু কোরায়শ গোত্রের লোকেরা পোষাক পরিহিত অবস্থায় তওয়াফ করতো। এতদ্ব্যতীত, প্রাক-ইসলামী যুগের মূর্খ আরবরা অনেকেই হজ্জের মওসুমে উত্তম খাবার বর্জন করতো। যেমন ঘি, গোশ্ত প্রভৃতি পরিহার করতো এবং তারা মনে করতো এটা একটা বিরাট সৎ কাজ। বর্বরতার যুগের এসব কু-সংস্কার পরিহার করার তাগিদ করেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে[১] এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, নগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করা কোন অবস্থাতেই সৎ কাজ হতে পারে না। কেননা, এটি একটি অভিশপ্ত, অপ্রিয় এবং চির-বর্জনীয় আচরণ, তাছাড়া উত্তম খাবার বর্জনেও কোন কল্যাণ নেই। আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ কর এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর গুজার হও।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বনী আদমকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেন, হে বনী আদম! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক বার হাযির হওয়ার সময় উত্তম পোষাক পরিধান কর। আলোচ্য আয়াতে زِينَت শব্দটির অর্থ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একমত যে, এর অর্থ হল সেই পোষাক যা দিয়ে সতর ঢাকা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, নামায হওয়ার জন্যে সতর ঢাকা পূর্ব শর্ত।

নামাযের জন্যে উত্তম পোষাক

মানুষের একান্ত কর্তব্য হল সকল অবস্থায় পোষাক পরিধান করা। এটি যেমন ইসলামী কর্তব্য তেমনি মানবিক কর্তব্যও। কথা এখানেই শেষ নয়, বরং কোন কোন তফসীরকারগণ বলেছেন যে, যেহেতু আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক পোষাককে উদ্দেশ্য করে زِينَت শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাই এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের সাধ্য মোতাবেক নামাযের সময় উত্তম পোষাক পরিধান করা কর্তব্য। হযরত হাসান (রাঃ) উত্তম পোষাক পরিধান করে নামায আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নামাযের সময় সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ পাক সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন এজন্যে আমি তাঁর মহান দরবারে হাযির হওয়ার সময় সুন্দর পোষাক পছন্দ করি।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত তামীমে দারী (রাঃ) এক হাজার দেরহাম দ্বারা একটি চাদর ক্রয় করেছিলেন। তিনি তা নামাযের সময় ব্যবহার করতেন। মসনদে আহমদে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৯
তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬০
২। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৯০

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। সর্ব প্রকার পোষাকের মধ্যে সাদা পোষাক উত্তম, সাদা কাপড় দ্বারা মৃতদের কাফন দিও।[১]

মাসআলা

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, নামাযের জন্যে সতর ঢাকা ফরজ। এতদ্ব্যতীত নামায হয় না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ)-এর নিকট সতর ঢাকা নামাযের শর্ত। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মাথায় "ওড়না" ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে মেয়েদের নামায কবুল হয় না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর যখন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে আমীরুল হজ্জ মনোনীত করে প্রেরণ করেন, তখন তিনি আমাকে একদলের সঙ্গে নিযুক্ত করে এই আদেশ দিলেন যেন আমি মানুষের মধ্যেই এই এ'লান করি, এ বছরের পর কোন মুশরেক হজ্জ করবে না। আর কেউ নগ্ন অবস্থায় তওয়াফ করবে না।[২]

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

"তোমরা পানাহার কর তবে অপচয় করোনা"।

আল্লামা বগবী কালবীর সূত্রে লিখেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে হজ্জের সময়ে বনী আমের গোত্রের লোকেরা শুধু এত সামান্য পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতো যেন কোন প্রকারে জীবন রক্ষা হয়। তারা গোশ্ত, চর্বি বা অন্য কোন সু-খাদ্য গ্রহণ করতো না। তারা এ কাজটিকে হজ্জের মাহাত্ম এবং সম্মান বলে ধারণা করতো, এ অবস্থা দেখে মুসলমানগণ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করলেন যে, যদি এ কর্মসূচীর মাধ্যমে হজ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয় তবে আমরাও এ কর্মসূচী গ্রহণ করবো। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

বস্তুতঃ মানুষ যেন আল্লাহ পাকের প্রদত্ত দান ভোগ করতে পারে এবং তাঁর নেয়ামত ভোগ করে এবাদতে মশগুল হতে পারে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত হতে পারে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হতে পারে- এ উদ্দেশ্যেই সমগ্র বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

"তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছু"।

অতএব, আল্লাহ পাকের নেয়ামত ভোগ করা, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার হওয়া মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯১

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পানাহার শরীয়তের দৃষ্টিতেও অবশ্য কর্তব্য। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি পানাহার বর্জন করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা এত দুর্বল হয়ে যায় যে, ফরজ ওয়াজিব আদায়ে সক্ষম না হয় তবে সে গুনাহগার হবে। আলোচ্য বাক্যাংশ দ্বারা একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, যত খাদ্য-দ্রব্য পৃথিবীতে রয়েছে সবই মানুষের জন্যে হালাল। অবশ্য শরীয়তে যেসব জিনিসকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা ব্যতীত। যখন কোন কিছু হারাম হওয়া বা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যাবে তখন তাকে হালাল মনে করা হবে, কেননা আলোচ্য আয়াতে

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا.

(পানাহার কর) বলা হয়েছে কিন্তু কোন কিছু নিদৃষ্ট করে বলা হয়নি যে, অমুক জিনিস খাও বা অমুক জিনিস পান কর।[১]

وَلَا تُسْرِفُوْا.

আর তোমরা অপচয় করোনা অর্থাৎ পানাহারের নির্দেশের পাশাপাশি এ নির্দেশও রয়েছে তোমরা পানাহারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করোনা।

এসরাফের তাৎপর্য

"এসরাফ" বা সীমালঙ্ঘনের তাৎপর্য হল হালালের স্থলে হারাম গ্রহণ করা, দ্বিতীয়তঃ কোন হালাল বস্তুকে অকারণে হারাম মনে করে বর্জন করা। যেভাবে হারাম বস্তু গ্রহণ করা অপরাধ ঠিক তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্ পাকের বিধানের বিরোধিতা করা এবং পাপ কাজ। এমনিভাবে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পরিমাণে খাওয়াও এসরাফের অন্তর্ভুক্ত, আর ঠিক এভাবে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের চেয়ে কম খাওয়া, পরিণামে দুর্বল হয়ে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফরজ ওয়াজিব আদায়ে সক্ষম না হওয়া। উভয় প্রকারের এসরাফকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোরআনে করীমে, এমনকি অহেতুক ব্যয় করে যারা সম্পদের অপচয় করে তাদেরকে "শয়তানের ভাই" বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ.

(নিশ্চয় যারা অহেতুক ব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই) আরও এরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বন্দা তারা, যারা ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্য পন্থা অবলম্বন করে। তারা অপচয়ও করেনা এবং প্রয়োজনের চেয়ে কমও করেনা। পানাহারের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাগিদ রয়েছে। খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, অধিক পরিমাণে পানাহার থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা তার কারণে শরীর খারাপ হয়, রোগ দেখা দেয়, অলসতার কারণ হয়। তাই তোমরা পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, কেননা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬২

স্বাস্থ্যের জন্যে তাই হয় উপকারী। আর সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে থাক। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ সে পর্যন্ত ধ্বংস হয় না যে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে শরীয়তের বিধানের উপর প্রাধান্য না দেয়। আমাদের সলফে সালেহীনগণ বলতেন, মানুষের সর্বদা পানাহারের ফিকরে থাকাও এসরাফ। তাই বলা হয়েছেঃ

خردن براے زیستن وذکر کردن است

توگ مان کدی کہ زیستن براے خوردن است

পানাহারের উদ্দেশ্য হলো জীবিকা থাকা এবং আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকা কিন্তু তুমি মনে করেছ, জীবিত থাকার উদ্দেশ্যই হলো পানাহার করা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরিধান করো তবে দু'টি বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করো (১) এসরাফ করোনা তথা সীমালঙ্ঘন করোনা, বাড়াবাড়ি করোনা (২) অহংকার করোনা।

এক আয়াত দ্বারা ৭টি মাসআলা

আলোচ্য আয়াত দ্বারা শরীয়তের ৭টি মাসআলা প্রমাণিত হচ্ছে–

১. প্রয়োজন মোতাবেক পানাহার ফরজ।

২. যতক্ষণ শরীয়তের কোন দলিল দ্বারা কোন জিনিসের হারাম হওয়া প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল।

৩. যে সব জিনিসকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোর ব্যবহার এসরাফের অন্তর্ভুক্ত এবং অবৈধ।

৪. যে সব বস্তু আল্লাহ পাক হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম মনে করা এসরাফ এবং অত্যন্ত বড় গুনাহ।

৫. উদর পরিপূর্ণ হওয়ার পরও খাদ্য গ্রহণ অনুচিত।

৬. অতি অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের ফলে দুর্বল হওয়া এবং ফরজ ওয়াজিব আদায়ে অক্ষম হওয়া।

৭. সর্বদা খাওয়া-দাওয়ার ফিকরে থাকাও এসরাফ।

হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) নিকট গমন করলেন। তিনি সেখানে গোশ্ত রাখা আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ গোশ্ত কেমন? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, এ গোশ্ত এমন যা আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যে জিনিস তোমার মন খেতে চায় তখন তা খেয়ে নেবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথা বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ তোমরা পানাহার কর, আল্লাহর রাহে দান কর, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান কর তবে এসরাফ করোনা, অহংকার করোনা।

চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে

আলোচ্য আয়াতখানি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকেও যদি বিচার করা হয় তবে স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এর চেয়ে বড় ব্যবস্থাপত্র আর কিছু নেই। আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাপকতার প্রেক্ষিতেই তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক মাত্র অর্ধেক আয়াতের মধ্যে

সম্পূর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত আছে খলিফা হারুনুর রশিদের নিকট একজন অভিজ্ঞ খৃষ্টান চিকিৎসক ছিল। সে একবার আলী এবনে হাসান এবনে ওয়াকেদকে বললো, তোমাদের কিতাবে (পবিত্র কোরআনে) চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে কোন কথা নেই অথচ এলম দু' প্রকার।

(১) এলমুল আবদান তথা শরীর সম্পর্কীয় এলম।

(২) এলমুন আদয়ান তথা দ্বীন সম্পর্কীয় এলম। আলী জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল কথা অর্ধেক আয়াতের মধ্যেই একত্রিত করে দিয়েছেন। আর সে আয়াতাংশ হল–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

তখন ঐ খৃষ্টান চিকিৎসক বললো, তোমাদের রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু বলেননি? আলী বললেন, আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল কথাকে কয়েকটি বাক্যে শেষ করে দিয়েছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ উদর হলো শরীরের চৌবাচ্চা, শিরাগুলো তা থেকে পানীয় গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করে। যদি উদর ভাল হয় তবে শরীর ভাল, অন্যথায় শরীর অসুস্থ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল সকল চিকিৎসার মূল কথা, শরীরকে তাই দাও, তুমি তাকে যার অভ্যস্ত করেছ। তখন ঐ খৃষ্টান চিকিৎসক বললো, তোমাদের কিতাব এবং তোমাদের রসূল বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ যালিনুসের জন্যে চিকিৎসা বিষয়ক কোন কথা ছেড়ে যাননি।[১]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ.

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক যে সৌন্দর্য, ভূষণ এবং উত্তম রিয্ক তাঁর বন্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করল? যেহেতু কাফের মুশরেকরা তওয়াফের সময় নগ্ন অবস্থায় থাকত এবং হজ্জের দিনগুলোতে উত্তম খাবার বর্জন করে মনে করত এটিও এবাদতের শামিল। এর দ্বারা হজ্জের মাহাত্ম বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেনঃ আসমান জমীনের মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাক। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, তিনি তাঁর বন্দাদের জন্যে রকমারী সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্য সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জন্যে পোষাক সৃষ্টি করেছেন, অতএব কোন কিছু হালাল বা হারাম করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। আর কারো নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা হালালকে হারাম মনে করে এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য হারাম মনে করে বর্জন করে ও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিহার করে নগ্ন অবস্থায় কা'বা শরীফ তওয়াফ করে, তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে।

উত্তম পোষাক, সুস্বাদু খাবার ইসলামের পরিপন্থী নয়

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সামর্থ থাকলে উত্তম ও মূল্যবান পোষাক পরিধান করা এবং সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়, সলফে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১০-১১
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৯৪-৯৫

ছালেহীন বুজুর্গানে দ্বীনের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় যে, তাঁরা অতি মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেছেন। স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও কোন কোন সময় উত্তম পোষাক পরিধান করতেন। বর্ণিত আছে, একবার তিনি হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তাঁর দেহ মোবারকে এমন একটি চাদর ছিল যার মূল্য তখনকার দিনে এক হাজার দেরহাম ছিল। আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) যে চাদর ব্যবহার করতেন, তদানীন্তন কালে তার মূল্য ছিল চারশত গিনি। এভাবে হযরত ইমাম মালেক (রঃ) সর্বদা অতি উত্তম পোষাক পরিধান করতেন। তাঁর একজন ভক্ত লোক তাঁর জন্যে বার্ষিক ৩৬০টি পোষাক সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন নূতন এক জোড়া পোষাক পরিধান করতেন এবং কোন জোড়া কাপড় একবার তিনি পরিধান করলে দ্বিতীয় বার তা ব্যবহারের সুযোগ হতো না। কেননা, তিনি প্রত্যেক দিন যে পোষাক ব্যবহার করতেন পরদিন সকালে তা কোন দরিদ্র তালেবে এলমকে দান করতেন।

বিখ্যাত সুফী সাধক হযরত মওলানা রুমীর (রঃ) অবস্থা আরো বিস্ময়কর ছিল। তিনি কোনদিনও জুব্বার বোতাম ব্যবহার করতেন না। কেননা, সাহায্য প্রার্থী হাযির হলে তিনি পকেটে হাত দিয়ে কিছু দেয়ার স্থলে গায়ের জুব্বাটি খুলে দিয়ে দিতেন।

শেখ শরফুদ্দিন নামক একজন বড় ব্যবসায়ী তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ২০০ জুব্বা নিয়ে তাঁর পেছনে বসে থাকতেন। যখনই মওলানা রুমী (রঃ) তাঁর জুব্বাটি কাউকে দান করতেন তখনই শেখ শরফুদ্দিন তাঁর গায়ে নতুন জুব্বা পরিয়ে দিতেন।

এর কারণ এই, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে রয়েছেঃ এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে হাযির হল। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হল লোকটি অত্যন্ত দারিদ্র প্রপীড়িত। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন এই আগন্তককে কিছু সাহায্য করতে। লোকটি বলল, আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, আমি সম্পদশালী, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন কোন বন্দাকে ধন-সম্পদের নেয়ামত দান করেন তখন তিনি পছন্দ করেন যে, তার পোষাক-পরিচ্ছেদে সেই নেয়ামতের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

অতএব, আল্লাহ পাকের নেয়ামত প্রকাশ করাও তাঁর শোকর গুজারী। পক্ষান্তরে, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ছেড়া, মলিন পোষাক পরিধানের মধ্যে অকৃতজ্ঞতার ভাব থাকে। তবে দু'টি জিনিসের প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। একটি হল রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছা পরিহার করা, আর অন্যটি হলো অহংকার পরিহার করা।

তাই অহংকারী মনোভাব নিয়ে মূল্যবান পোষাক পরিধান অনুচিত। সলফে ছালেহীন বুজুর্গানে দ্বীন এসব নিন্দনীয় কাজ থেকে মুক্ত থাকতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে এমন বর্ণনা রয়েছে যে, তাঁরা তালিযুক্ত জামা-কাপড় পরিধান করতেন। এর দু'টি কারণ ছিল। (এক) অর্থ-সম্পদ যা আসত তা তাঁরা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন, দ্বীনি কাজে ব্যয় করতেন। ফলে এমন ধন-সম্পদ থাকতো না যা দ্বারা উত্তম পোষাকের ব্যবস্থা করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র আদর্শ। তিনি সাদাসিধে তথা অনাড়ম্বর জীবন-যাপন পছন্দ করতেন।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত হল যে পোষাক বা যে খাবার সহজ প্রাপ্য হয় তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ কর। ঋণগ্রস্ত হয়ে ভাল পোষাক বা ভাল খাবারের ব্যবস্থা না করা। অথবা ভাল পোষাক ও ভাল খাবারের চিন্তা মগ্ন না হওয়া। আর যদি ভাল কিছু পাওয়া যায় তা গ্রহণে বিরত না হওয়া।

قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ

এ বিশ্বের যাবতীয় নেয়ামত, সুখ-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের ভক্ত প্রেমিক মোমেন বন্দাদের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যরা মোমেনদের সৌজন্যেই তা ভোগ করছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত, যাবতীয় সুখ-সামগ্রী এ অবস্থায় যে, তা আখেরাতে বিপদের কারণ না হবে মোমেনদের জন্যে। পক্ষান্তরে, কাফেরদেরকে দুনিয়ার নেয়ামত দেয়া হয় এমনকি, অনেক বেশী দেয়া হয় কিন্তু তা আখেরাতে তাদের জন্যে বিপদের কারণ হবে। আল্লাহ পাক কাফের, মুশরেক, বে-দ্বীন লোকদেরকে এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ভোগ-সম্পদ দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি; বরং মোমেনগণ যখন তাকওয়া পরহেযগারীর কারণে বিভিন্নভাবে অর্থ-সম্পদ উপার্জনে উদাসীন থাকে তখন কাফেররাই অধিকতর সুযোগ গ্রহণ করে।

একখানি হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, দুনিয়ার নেয়ামত আল্লাহ পাক মোমেন ও কাফের সকলকেই দান করেন কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু মোমেনদেরই প্রাপ্য। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামতে শুধু মোমেনদেরই অধিকার। কোন কোন তফসীকার বাক্যটির ব্যাখ্যায় একথা বলেছেনঃ এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নেয়ামত তথা পার্থিব সুখ-সামগ্রী সম্পূর্ণ নির্ভেজাল নয়, বরং তা কিছুটা দুঃখ-বেদনা জড়িত থাকে, যদি দুঃখ-যাতনা জড়িত না-ও হয়, কষ্ট সাধ্য ও কঠিন পরিশ্রমতো অবশ্যই প্রয়োজন।

কিন্তু আখেরাতের অনন্ত নেয়ামত সম্পূর্ণ নির্ভেজাল, সর্বপ্রকার কষ্ট বিবর্জিত এবং পরিশ্রম মুক্ত।

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

এভাবে আমি সমস্ত নিদর্শন সমূহকে সুস্পষ্ট ভাষায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা জ্ঞানী, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা জানে এবং মানে।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ.

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, কাফেররা যে সব জিনিষকে হারাম মনে করে রেখেছে তা হারাম নয়। আর এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে যা হারাম এবং নিষিদ্ধ তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে, তোমরা যে সব বস্তুকে অযথা হারাম মনে করে রেখেছ তা আদৌ হারাম নয়; বরং আল্লাহ পাক যা হারাম করেছেন তা হল চির বর্জনীয়। আল্লাহ পাক সমস্ত অশ্লীল কাজ তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে সমস্ত পাপ কার্য, কারো প্রতি জুলুম করা, আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করা, যার কোন দলিল আল্লাহ পাক নাযিল করেননি আর আল্লাহ পাকের শানে এমন কথা বলা যা তোমরা জাননা। اَلْفَوَاحِشَ তথা প্রকাশ্যে মন্দ ও অশ্লীল কাজ যেমন নগ্ন অবস্থায় তওয়াফ করা, আর গোপনে মন্দ কাজ যেমন ব্যাভিচার। اَلْاِثْمَ শব্দটির মধ্যে যাবতীয় এমন পাপাচার অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। اَلْبَغْيَ এমন পাপ, যার সম্পর্ক অন্যদের সঙ্গে তথা অন্য মানুষের হক্ব বিষয়ক পাপ, আর শেরক হলো আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ। আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রকার হারাম কাজের বিবরণ এসেছে, আকীদা এবং আমলের ক্ষেত্রে যাবতীয় অন্যায় অশ্লীল কাজ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা ব্যক্তিগত জীবনে হোক অথবা সমাজ জীবনে। বর্বরতার যুগের লোকেরা এসব অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থাকত, তারা হালাল বস্তু পরিহার করতো অথচ হারাম কাজে লিপ্ত থাকতো।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ

এবং প্রত্যেক দলের জন্যেই একটা নিদৃষ্ট সময় আছে। অর্থাৎ কাফেরদের প্রত্যেক দলের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার একটা সময় নিদৃষ্ট রয়েছে। সে সময় হলে অবশ্যই তারা কোপগ্রস্ত হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ এর দ্বারা মক্কাবাসীর উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

অতএব, যখন কোন সম্প্রদায়ের শাস্তির জন্যে নিদৃষ্ট সময় আসে তখন তা এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না। আর নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেও আসবে না। অর্থাৎ তাদেরকে সামান্যতম অবকাশও দেয়া হবে না এবং আযাবের জন্যে নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বেও তা আসবেনা।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হালাল এবং হারামের বিবরণ দিয়েছেন আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুর জন্যে সময় নিদৃষ্ট রয়েছে, সে নিদৃষ্ট সময় হলে মৃত্যু অবশ্যই হবে। এতে এক মুহূর্ত বিলম্বও হবে না আর নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বেও তা আসবে না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৯

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান (রঃ) এবং মুকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল যে সব সম্প্রদায় আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহর রসূলকে অস্বীকার করে তাদেরকে একটা নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়। ঐ সময় না আসা পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দেন না। কিন্তু যখন সেই সময় আসে তখন তাদের শাস্তি বিধানে আর বিলম্ব হয় না। যদি কোন সম্প্রদায় নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বেই আযাব দেখতে চায় তবুও নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বে আযাব আসে না। আল্লাহ পাকের এলমে তাদের শাস্তির জন্যে যে সময় নিদৃষ্ট আছে সে সময়ই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয় এবং শাস্তি ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় না।[১]

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا
يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ
يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ
قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৫) হে বনী আদম! যদি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হতে কোন রসূল আগমন করেন, তোমাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন তবে যারা পরহেযগারী অবলম্বন করবে এবং আত্মসংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নাই, তারা চিন্তিতও হবে না।

(৩৬) আর যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করবে এবং অহংকার প্রদর্শন করে তা থেকে বিমুখ হবে, তারা হবে দোযখবাসী, তারা চিরদিন তাতে থাকবে।

(৩৭) সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যে আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তারা তাদের কিতাবের মধ্যে লিখিত

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৬৭

অংশই লাভ করবে, যতক্ষণ না আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ সংহারের জন্যে তাদের নিকট আসবে এবং জিজ্ঞাসা করবে– আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাকতে, তারা কোথায়? তারা জবাব দেবে তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা ছিল কাফের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হালাল হারামের বিবরণের পর আল্লাহ পাক একথা ঘোষণা করেছেন যে, এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্যে সময় নিদৃষ্ট রয়েছে, সে সময় হলে প্রত্যেককেই পাড়ি জমাতে হবে পরপারে, ছেড়ে যেতে হবে এই সুন্দর পৃথিবী। তখন কার কি অবস্থা হবে? তারই বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতেঃ

فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থাৎ যারা এ জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলবে, পরহেযগারী অবলম্বন করবে তাদের কোন ভয় নেই।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথম এ প্রশ্নটি উত্থিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতের কথাগুলো আল্লাহ পাক কখন বলেছেন? এর জবাবে তফসীরকারগণ বলেছেন এ কথাগুলো আলমে আরওয়াহে তথা আত্মার জগতে যখন মানুষ এ পৃথিবীতে আসেনি তখন আল্লাহ পাক রূহগুলোকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন।[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েকটি রুকুতে হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ)-এর জান্নাতী জীবনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা যখন সাময়িকভাবে বেহেশতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতকর্মের জন্যে তওবা করেন, তখন আল্লাহ পাক সদয় হয়ে তাঁদেরকে ক্ষমা করেন। হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর বংশধররা যাতে বেহেশতে ফিরে যেতে পারেন এজন্যে আলোচ্য আয়াতে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া হয়। এতে সান্ত্বনা এবং সু-সংবাদ দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, তোমাদের তওবা কবুল করা হল, তবে এ মুহূর্তে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে না। তোমরা এখন পৃথিবীতে অবতরণ কর একটা নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান কর। যখন সময় শেষ হবে তখন আবার তোমরা বেহেশতে ফিরে আসবে তবে শর্ত হল এই, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে।

اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩১

অর্থাৎ যখন আমার প্রেরিত রসূলগণ তোমাদের নিকট আসবেন, যারা তাদের অনুসরণ করবে, আল্লাহ পাককে ভয় করে চলবে এবং আত্ম সংশোধনে প্রয়াসী হবে তাদের কোন ভয় নেই। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, فَلَا خَوْفٌ এর অর্থ হলো কবরে এবং কেয়ামতের দিনে তাদের কোন ভয় হবে না।

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থাৎ তারা দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না, কেননা যারা দোযখে যাবে তারা দুনিয়ার জীবনকে ধ্বংস করার কারণে দুঃখিত এবং ব্যথিত হবে।[১] দুনিয়াতে যদিও বেহেশতের সুখ ও সম্পদ, নাজ-নেয়ামত নেই, কিন্তু তবুও একটি নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান এবং ভোগ ও সম্পদের ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও বেহেশতী লেবাস দুনিয়াতে নেই কিন্তু উত্তম পোষাক ও সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শর্ত হল তোমরা দুনিয়ার লোভে মোহে আল্লাহকে ভুলে যেওনা। আল্লাহ পাকের নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অকৃতজ্ঞ হয়োনা। যে ইবলিস শয়তান একদিন তোমাদের আদি পিতা মাতা আদম ও হাওয়াকে প্রতারণা করে বেহেশত থেকে বের করেছিল সে তোমাদের সর্বনাশ করার জন্যে সর্বক্ষণ সচেষ্ট রয়েছে।

অতএব, তোমরা তার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবে। কোন অবস্থাতেই পাপাচারে লিপ্ত হবেনা, অন্যায় অশ্লীল কাজে শরীক হবে না। সীমালঙ্ঘন করবে না।

একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকবে। আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলবে। আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের সাফল্য, শুধু এভাবেই তোমরা পুনরায় বেহেশতে আসতে পারবে। যদি এরই মধ্যে তোমাদের নিকট আমার রসূল আগমন করেন এবং আমার আয়াত সমূহ পেশ করেন এবং তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের পথের সন্ধান দেন, তবে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর রসূলের অনুসারী হবে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পাপাচার পরিহার করে চলবে এবং রসূলের আদর্শের অনুসারী হবে, সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে তারা অবশ্যই বেহেশতের চির সুখ ও শান্তি লাভ করবে। তাদের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল। সুখ এবং শান্তি হবে তাদের চির সাথী।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ অমান্য করবে এবং আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করবে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে, অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হবে, অহংকার করবে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর কঠিন শাস্তি।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে যে হেদায়েতনামা প্রদত্ত হয়েছিলো তারই পুনরুল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০২
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১৪

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ.

(হে বনী আদম! যখন তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হতে রসূলগণ আগমন করেন।)

বাতিল ফেরকা কাদিয়ানীদের পথভ্রষ্টতা

যেহেতু আলোচ্য আয়াতে رسل শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আর এটি হল رسول শব্দের বহুবচন, এ কারণে বাতিল ফেরকা কাদিয়ানীরা এর দ্বারা এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করেছে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরও নবী রসূলের আগমন হবে (নাউযুবিল্লাহ) অথচ এটি হল তাদের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। কেননা, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতিকে, উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে নয়। আর এ আয়াত হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কিত। যখন পৃথিবীতে কোন মানুষের পদচারণা হয়নি, যখন কোন নবীর আগমন হয়নি তখন আল্লাহ পাক আত্মার জগতে মানবাত্মাকে সম্বোধন করে এ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন এবনে জাবীর আবু ইয়াসা সালমীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাকের একথা সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে তখন বলেছেন যখন তিনি আদম (আঃ) এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির রুহ সমূহকে স্বীয় কুদরতী হাতে নিয়ে আলমে আরওয়াহে তথা আত্মার জগতে এই হেদায়েতনামা দান করেছিলেন।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে রূহুল মা'আনীতে একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাঁর ভাষায়ঃ

ان الله تعالى جعل ادم وذريته فى كفة فقال يابنى ادم.

এরপর পৃথিবীতে আল্লাহ পাক লক্ষাধিক নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এজন্যে আলোচ্য আয়াতে رسل তথা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এরা দ্বারা খতমে নবুওয়্যত বা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি হয়েছে এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা, পথভ্রষ্টতা ও জ্ঞানের দৈন্যের বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আয়াতের সারমর্ম হল এই, হে আদম সন্তানগণ! যখনই তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের কোন নবী আগমন করবেন এবং মহান আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী তোমাদেরকে শোনাবেন তখন তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের সাথে সর্ব প্রকার সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য, এতেই রয়েছে তোমাদের কল্যাণ। পবিত্র কোরআনে এ আয়াত নাযিল হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং এর ব্যাখ্যা করার অধিকারও শুধু তাঁরই এবং তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ তাঁর নবুওয়্যতের মাধ্যমে নবীগণের আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে, আর তিনি যে খাতেমুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী একথার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং খাতেমুন নাবিয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন, তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না এবং এর কোন প্রয়োজনও নেই। বাতিল ফেরকা কাদিয়ানীরা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশের অপচেষ্টা করে। তাদের কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে অথচ তারা মুসলমান নয়। পৃথিবীর বহু মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে, তারা অমুসলিম।[১]

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ.

যারা আল্লাহ পাকের নামে অপবাদ দেয়, নিজেদের তরফ থেকে কথা রচনা করে আল্লাহর নামে প্রচার করে, আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে এমন লোকদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে এ আয়াতে। সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যে আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা কথা রচনা করে অর্থাৎ যে কথা আল্লাহ পাক বলেননি তা তিনি বলেছেন বলে যে দাবী করে এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে, অথবা তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যে কথা আল্লাহ পাক বলেছেন তাকে অস্বীকার করে তাদের শোচনীয় ও অনিবার্য পরিণাম তারা দেখতে পাবে।

اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ.

তারা তাদের জন্যে লিখিত অংশ পাবে অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের অদৃষ্টে যে বয়স, ধন-সম্পদ বা সম্মান মর্যাদা লিখে রেখেছেন তা তারা দুনিয়াতে পাবে। যখন তাদের জন্যে নিদৃষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ সংহার করতে আসবে তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে, আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকতে তারা এখন কোথায়? এখন তাদেরকে ডাক যেন তোমাদেরকে সাহায্য করে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করে। তখন কাফেররা অসহায় অবস্থায় বলবে আমাদের এই দুঃখের দিনে তারা হারিয়ে গেছে, আমরা যাদেরকে ডাকতাম, যাদের সম্মুখে মাথা নত করতাম তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। মূলতঃ দোষ আমাদেরই, আমরাই অপরাধ করেছি, যারা আমাদের ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না তাদেরকে আমরা মাথায় তুলেছিলাম। তাদের প্রতি আমাদের ভক্তি-অনুরক্তি প্রকাশ করেছিলাম। এভাবে কাফেররা তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কথা স্বীকার করবে এবং তারা যে পথভ্রষ্ট ছিল একথা অগত্যা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তখন তারা বিলাপ করে কান্নাকাটি করবে কিন্তু তাদের এ আত্মবিলাপ বা অনুশোচনা তাদের জন্যে কোনভাবেই উপকারী হবেনা কেননা, তারা এ জীবনে জীবনের মালিককে স্মরণ করেনি, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করেনি, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই চিরস্থায়ী মনে করেছে, বর্তমানকে পেয়ে

১। খাতেমুন নাবেয়্যীন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন ৬ষ্ঠ-১ পৃষ্ঠা-১২৮

ভবিষ্যতের চিন্তা করেনি, দুনিয়ার লোভ ও মোহে আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ মত্ত হয়ে আখেরাতের কথা ভুলে গেছে, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত পেয়ে নেয়ামতের মালিক আল্লাহ পাককে ভুলে গেছে তাই তাদের পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ এবং শোচনীয়। এ পর্যায়ে একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অহংকার করে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্যে আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তাদের দোয়া কবুল হবে না এবং যে স্থানে নেককার বন্দাদের আমল সংরক্ষিত হয় সেখানে তাদের আমল পৌছবে না, যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে কলেমায়ে তায়্যেবা পৌছানো হয় এবং মানুষের নেক আমলও।

আবু দাউদ, নেসায়ী, এবনে মাজা এবং ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী সাহাবীর জানাযায় তশরীফ নেন, কবর তৈরী হতে একটু বিলম্ব ছিল তাই তিনি এক স্থানে উপবিষ্ট হন, সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পার্শ্বে নীরবে বসেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, মোমেন বন্দার যখন মৃত্যুর সময় আসে তখন আসমান থেকে শুভ্র উজ্জ্বল চমকদার চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা আসেন। যাদের সাথে কাফনের কাপড় এবং খুশবু থাকে। তারা মৃত্যু পথ যাত্রীর সম্মুখে বসে পড়েন। এরপর মৃত্যুদূত আজরাঈল (আঃ) আসেন এবং সে ব্যক্তির রূহকে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নফসে মোতমাইন্না! প্রতিপালকের মাগফেরাত এবং সন্তুষ্টি লাভের জন্যে বের হয়ে আস।

এভাবে তারা প্রথম আসমানে ঐ রূহ নিয়ে উপস্থিত হন, তার জন্যে আসমানের দরজা খোলা হয়, এ সময় আরো কিছু ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হন। এভাবে তারা সপ্তম আসমানে পৌছেন। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমার এই বন্দার আমলনামা ইল্লিয়্যিনে রাখ এবং তাকে ফেরত দিয়ে দাও। তখন ঐ রূহ কবরে প্রত্যাবর্তন করে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতাগণ তাকে বসিয়ে দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাক, আমার দ্বীন, ইসলাম। এরপর প্রশ্ন করা হয় এই বুজুর্গ যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে ব্যক্তি বলে তিনি আল্লাহ পাকের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তখন আসমান থেকে ঘোষণা করা হয় আমার বন্দা সত্যবাদী, তার জন্যে জান্নাতের দুয়ার খুলে দাও। আর ঐ দুয়ার দিয়ে জান্নাতের খুশবু এবং বাতাস আসতে থাকে এবং তার নেক আমল অতি সুন্দর আকৃতি ধারণ করে তার নিকট চলে আসে যেন তার শান্তির কারণ হয়।

পক্ষান্তরে যখন কোন অবিশ্বাসী কাফেরের মৃত্যুর সময় হয় তখন আসমান থেকে কৃষ্ণ বর্ণের ভয়ানক চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা চট নিয়ে আসেন এবং মৃত্যুপথ যাত্রী এ ব্যক্তির

পাশে বসে পড়েন। এরপর হযরত আজরাঈল (আঃ) সে ব্যক্তির রূহ কবজ করেন। যেমন কোন কাঁটা যুক্ত ডালাকে তার দেহ থেকে টেনে বের করা হয়। এভাবে তার রূহ বের করা হয়। তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধ থেকেও অধিক হয়। ফেরেশতাগণ এই রূহ নিয়ে অগ্রসর হন পথে অন্য ফেরেশতাদের সাথে দেখা হলে তারা জিজ্ঞাসা করেন এ রূহ কোন্ খবিছের? তখন তারা তাকে যে মন্দ নামে দুনিয়াতে স্মরণ করা হয় সে মন্দ নাম নিয়ে বলে অমুকের ছেলে অমুকের রূহ। এরপর তারা আসমানে গমন করেন, দরজা খোলার অনুরোধ করা হয় কিন্তু তার জন্যে আসমানের দরজা খোলা হয় না এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদেশ হয় যে, এই বন্দার আমলনামা সিজ্জিনে রাখ যেখানে নাফরমানদের রূহ রাখা হয়। তখন তার রূহকে নিক্ষেপ করা হয় আর ঐ রূহ তার শরীরে ফিরে আসে। ফেরেশতাগণ তাকে বসিয়ে দেন এবং তাকে ঐ তিনটি প্রশ্ন করা হয় যা মোমেন বন্দাকে করা হয়েছিলো। সে সব প্রশ্নের একই জবাব দেয়ঃ

هاه هاه لا ادرى

অর্থাৎ আমি কিছুই জানিনা। তখন তাকে দোযখের পোষাক দেয়া হয় এবং দোযখের দিকের দরজা খুলে দেয়া হয়, পরিণামে দোযখের তাপ তার কবরে প্রবেশ করতে থাকে এবং তার কবর সংকীর্ণ করা হয়। (নাউজুবিল্লাহ)

এই হাদীস দ্বারা মোমেন ও কাফেরের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়, ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক হওয়া যায়।[১]

قَالَ ادْخُلُوا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
فِي النَّارِ ۭ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا
جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۭ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝٣٨
وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝٣٩ ع

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮০৪-০৬

তরজমা

(৩৮) আল্লাহ পাক বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে সব মানব দানব গত হয়েছে তোমরাও তাদের সাথে দোযখে যাও। যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অন্য দলকে লা'নত করবে। অবশেষে তারা সকলেই যখন তাতে একত্রিত হবে, তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এরাইতো আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ পাক বলবেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে, তবে তোমরা জাননা।

(৩৯) আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ কৃতকর্মেরই শাস্তি ভোগ করতে থাক।

তফসীরুল কোরআন

কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ংকর হবে, কেউ কারো থাকবে না, কারো প্রতি কোন প্রকার দরদ-সহানভূতি প্রকাশ করা সম্ভব হবে না, এমনকি একান্ত আপনজনকে দেখলেও একজন আরেকজন থেকে পলায়নপর হবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ.

(যেদিন ভাই ভাইকে দেখলে পলায়ন করবে) সেই চরম বিপজ্জনক মুহূর্তে আল্লাহ পাক নির্দেশ দেবেন, তোমাদের পূর্বে যে সব মানুষ ও জ্বীন গত হয়েছে তোমরাও তাদের সাথে দোযখে চলে যাও এবং নিজ নিজ কীর্তিকলাপের শাস্তি ভোগ কর। তখন দোযখীরা একে অন্যকে লা'নত দেবে, পৌত্তলিকরা অন্য পৌত্তলিকদেরকে, ইহুদীরা অন্য ইহুদীদেরকে এবং খৃষ্টানরা অন্য খৃষ্টানদেরকে, অগ্নিপূজকরা অন্য অগ্নিপূজককে এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্ট দল অন্য পথভ্রষ্ট দলকে লা'নত দিতে থাকবে এবং তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে একদল অন্যদলের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ.

যারা ছিল দুনিয়াতে ভাই ভাই, সেদিন তারা হবে পরস্পর পরস্পরের শত্রু, তবে পরহেযগারগণ (তাদের এ অবস্থা হবে না)।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ভক্ত অনুরক্তরা তাদের পুরোহিতদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের লা'নত হোক, তোমরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছ, সরল সঠিক পথ গ্রহণে বাধা দিয়েছ, নিজেরাতো ধ্বংস হয়েছে আমাদেরকেও ধ্বংস করেছ। আমাদের বিপদের জন্যে, তোমরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এভাবে যারা পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৭৩

নেতৃত্ব দিয়েছে, আল্লাহ পাকের নাফরমানী করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের অনুসারীরা তাদের প্রতি লা'নত দেবে।[১]

حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا.

এভাবে যখন একে একে সকল দল দোযখে একত্রিত হবে তখন পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলকে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! এদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন, কেননা, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী দল অর্থাৎ যারা পূর্বে দোযখে প্রবেশ করেছে আর পরবর্তী দল অর্থাৎ যারা পরে দোযখে প্রবেশ করেছে, অথবা এর অর্থ হল পূর্ববর্তী দল অর্থাৎ পুরোহিত আর পরবর্তী দল অর্থাৎ ভক্ত পূজারী।[২]

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ.

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে তবে তোমরা জাননা। এর কারণ এই, পূর্ববর্তীদের অপরাধ দ্বিগুণ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই কেননা তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে পরবর্তীদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, পরবর্তীদের অপরাধও দ্বিগুণ, তারাও পূর্ববতীদের থেকে কম যায় না। কেননা, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে আর পূর্ববর্তী লোকদের ভয়াবহ পরিণাম দেখেও কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। অতএব, উভয়ের জন্যেই রয়েছে দ্বিগুণ আযাব।

অথবা এর অর্থ হল এই যে, দোযখীদের নিকট নিজ নিজ স্তর হিসেবে বিভিন্ন সময় আযাব পরিবর্ধিত হতে থাকবে আর এভাবে তা দ্বিগুণ পর্যায়ে পৌঁছবে। আযাবের শুরুতে তারা এ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে না। এ অবস্থায় প্রথম পক্ষের প্রতি দ্বিগুণ আযাব হওয়ার কারণে দ্বিতীয় পক্ষের কোন লাভ হবে না। তাই তারা দ্বিতীয় পক্ষকে বলবে, কি লাভ হল তোমরাতো জিততে পারলে না, আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করতে পারলে না। আমরাও দ্বিগুণ আযাব ভোগ করছি। তোমরাও অনুরূপভাবে দ্বিগুণ আযাব ভোগ করছো। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا.

"যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং কাফের হয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে, আমি তাদের আযাব বৃদ্ধি করে দেব"।

আর অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ.

অর্থাৎ তারা নিজেদের বোঝার সঙ্গে সে সব লোকদের বোঝাও বহন করবে, যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে।

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ.

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০১
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৭৩

পুরোহিতরা তাদের অনুসারীদেরকে বলবে, যেভাবে আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম তোমরাও সেভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, এখন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ কর। এভাবে একের প্রতি অন্যের তরফ থেকে দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপ করবে। আর পরস্পরের এ দ্বন্দ্ব তাদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র আযাব হবে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

অর্থাৎ যদি তুমি দেখতে সে অবস্থা যখন এ জালেমরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। তখন তারা একে অন্যর প্রতি দোষারোপ করবে, তাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা সবল লোকদেরকে বলবে, সমস্ত দোষ তোমাদেরই যদি তোমরা তখন আমাদেরকে বাধা না দিতে তবে আমরা ঈমান লাভে ধন্য হতাম। তখন সবল লোকেরা জবাব দেবে আমরা কি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়েছিলাম? আমরা কি হেদায়েত গ্রহণের পথে বিঘ্ন ঘটিয়েছিলাম? তোমাদের সম্মুখে হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত ছিল কিন্তু তোমরা সে পথ গ্রহণ করোনি।[১]

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ.

অর্থাৎ তোমরা এবং আমরা সমান আযাব ভোগ করছি। যে নাফরমানীর কারণে এই শাস্তি হচ্ছে সেই নাফরমানীতে আমরা সমান অংশীদার ছিলাম এবং আযাবের ব্যাপারেও আমরা সমান রয়েছি। অতএব, আমাদের উপর তোমাদের কোন বিশেষ ফজিলত নেই। অর্থাৎ এমন নয় যে তোমাদের আযাব কম হয়েছে এবং আমাদের আযাব বেশী হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে فضل শব্দটি আযাব কম হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা যে পক্ষের আযাব কম হত সে পক্ষের ফজিলত প্রমাণিত হত। অথবা এর অর্থ হল দুনিয়ার জীবনে বিবেক-বুদ্ধিতে আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রাধান্য ছিল না।[২]

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল কুফর ও নাফরমানী পরিত্যাগের ব্যাপারে আমাদের উপর তোমাদের কোন ফজিলত ছিল না। অর্থাৎ আমরা যেমন আল্লাহর নাফরমানী করেছি, তাঁর অবাধ্য হয়েছি তোমরাও তা করেছ। অতএব, শাস্তিও আমাদের উভয় দলকেই ভোগ করতে হবে।[৩]

শাস্তি লাঘব হওয়ার ব্যাপারে তোমরা আমাদের চেয়ে ভাল অবস্থায় নেই অর্থাৎ তোমাদের শাস্তিও কম হবে না, আমাদের শাস্তিও কম হবে না।

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ.

"অতএব, তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে তোমরা শাস্তি ভোগ কর"। প্রশ্ন হল, একথাটি কার? ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. পুরোহিতদের সঙ্গে ভক্ত পূজারীদের যে বিতর্ক হবে তখন পুরোহিতরা তাদের ভক্তদেরকে বলবেঃ তোমাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপই তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১৭
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৭৪

২. অথবা একথাটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষিত হবে যে, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ কর। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রনিধাণযোগ্য তা হল আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপই শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রত্যেকেই তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে। এখানে কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

অর্থাৎ "আমি আমার বন্দাদের প্রতি জালেম নই"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

অর্থাৎ "তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ পাক কি করবেন? যদি তোমরা শোকর আদায় কর এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর"। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হল আখেরাতের আযাব থেকে নাজাত লাভের পন্থা।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ
وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং অহংকার করে তা থেকে বিমুখ হয় তাদের জন্যে আসমানের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত সূচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ না করে। আমি এভাবেই পাপিষ্ঠদের বদলা দিয়ে থাকি।

(৪১) তাদের শয্যা হবে দোযখের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও, এভাবেই আমি জালেমদেরকে বদলা দিয়ে থাকি।

(৪২) এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, অবশ্য আমিতো সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কারো উপর চাপাই না, তারাই হবে জান্নাতবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(৪৩) আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করে দেব, তাদের তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন, যদি আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়েত না করতেন তবে আমরা কিছুতেই পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে যে, তোমাদের আমলের বদৌলতে তোমরা এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

"নিশ্চয় যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং অহংকার করে তা থেকে বিমুখ হয়েছে তাদের জন্যে আসমানের দ্বার উম্মুক্ত হবে না আর তারা কোন দিন বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত সূচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ না করে"।

যারা অবাধ্য কাফের, যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, তাঁর প্রতি ঈমান আনেনা, জীবনে মরণে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের কোন স্থান নেই; তাদের রূহের জন্যে আসমানের দরজা খোলা হয় না। তাদের আত্মাকে ঘৃণা ভরে সিজ্জীনে ফেলা হয়, আর তারা কোন দিন বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ.

কোন অসম্ভব বিষয়ের অসম্ভবতা বোঝাতে ক্ষেত্র বিশেষে সর্বজনবিদিত কোন অসম্ভব কাজের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় যা দ্বারা সত্যিকার অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যেমন সূচের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে উটের মত বিরাট জন্তুর প্রবেশ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। একথা সর্বজনবিদিত, স্বীকৃত এবং চির সাব্যস্ত। তাই কাফেরদের জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব, অকল্পনীয় একথা বোঝাতে আলোচ্য আয়াতে এ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যে, যেভাবে সূচের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করতে করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন কাফের মুশরেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে চিরদিন দোযখেই থাকতে হবে। এটি আল্লাহ পাকের বিধান, এ বিধানের ঘোষণাই হয়েছে আলোচ্য আয়াতে আর এ ঘোষণার কোন পরিবর্তন হবে না।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ.

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেররা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তারা দোযখে প্রবেশ করবে, তাদের জন্যে রয়েছে নরক শয্যা। শুধু তাই নয়; নিচে এবং উপরে সব দিক থেকেই তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ.

(এভাবেই আমি জালেমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি) এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা মুশরেকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে। আর আলোচ্য আয়াতে জালেম শব্দটি কাফের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কেননা, কাফেররা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিই নিজেরা জুলুম করে এবং তার ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করে।[১]

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যখন কাফের মুশরেক বে-দ্বীনদের শাস্তির ঘোষণা করা হয় তখন তার পাশাপাশি ঈমানদার ও নেককার লোকদের পুরস্কারের কথাও বলা হয়।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের কঠিন কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা হয়েছে, তাই এ আয়াত থেকে ঈমানদার, নেককার লোকদের পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। এরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সেই ঈমান মোতাবেক নেক আমল করে তারা হবে জান্নাতবাসী, তাতে তারা চিরদিন থাকবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে জান্নাতের দরজা খোলা বা জান্নাতের যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া হয়ত অত্যন্ত কঠিনতর কাজ যা হয়ত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তারই জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেননা, অতএব যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাকের নবীর হেদায়েত মোতাবেক নেক আমল করে তারা জান্নাতবাসী হবে, আর এ কাজ কঠিন নয়। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার সাধ্য মোতাবেকই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। কাউকে তিনি তার শক্তির অতিরিক্ত কাজের নির্দেশ প্রদান করেন না। এটিই তাঁর অমোঘ বিধান। এটিই তাঁর চিরাচরিত নিয়ম।

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ.

পৃথিবীতে সাধারণতঃ ধন-সম্পদ নিয়ে মানুষের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-রেষারেষি হয়ে থাকে, এর পরিণামে এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সুখ-শান্তি অনেক সময়

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৭৮

অশান্তিতে পরিণত হয়। সুখ-সামগ্রী থাকে প্রচুর, কিন্তু পরস্পরের মন কষাকষির কারণে একটুকু শান্তি থাকে না। বর্তমান দুনিয়ায় এ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু বেহেশতের পবিত্র পরিবেশে মানুষের সুখ-সম্পদের ব্যাপারে এমন দুর্বলতা থাকবে না। আল্লাহ পাক মানুষের মনের এ দুর্বলতা দূরীভূত করবেন। মানব অন্তর এমন কলুষতা থেকে মুক্ত হবে তাই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মত বেহেস্তে কারও আনন্দ, শান্তি বিঘ্নিত হবে না তাই কবি বলেছেনঃ

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد = کسے را با کسے کارے نباشد.

বেহেশত এমন স্থান যেখানে কারো কোন কষ্ট হবে না, কারো কাছে কারো কোন কাজ থাকবে না, পরস্পরের মধ্যে কোন কারণেই রেষারেষি বা মনোমালিন্য হবে না। পার্থিব জীবনে অনেক নেককারদের মধ্যে মনোমালিন্য হতে দেখা যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বেহেশতে প্রবেশের পূর্বেই তা বেহেশতগামীদের মন থেকে দূরীভূত করে দেবেন, তাই প্রত্যেকেই কুলুষমুক্ত চিত্তে বেহেশতে গমন করবেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক একথাই ঘোষণা করেছেন। তখন বেহেশতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে শুধু প্রীতি এবং ভালবাসাই থাকবে। বিস্ময়কর বিষয় হবে এই, যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক বিশেষ কোন নেয়ামত দিয়ে থাকেন, আর অন্যকে সে নেয়ামত না দেয়া হয় তখন সে ব্যক্তির অন্তরে তার ভাইয়ের জন্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। অর্থাৎ হিংসা বা রেষারেষি সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে।

সাঈদ এবনে মনসুর, আবু নাঈম, এবনে আবি শাইবা, তেবরানী এবং এবনে মরদবিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি আশা করি আমি ও ওসমান (রাঃ) এবং তালহা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ) ঐ লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব অর্থাৎ দুনিয়াতে আমাদের পরস্পরের মনে যে কষ্ট আছে তা আখেরাতে দূরীভূত হয়ে যাবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনার ব্যাপারে এ মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর এ বাক্য দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের (وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ) ব্যাখ্যা করে এরশাদ করেছেনঃ মোমেনগণকে দোযখ থেকে বের করা হবে, এরপর দোযখ এবং জান্নাতের মধ্যস্থিত সেতুর উপর তাদেরকে রাখা হবে, পরস্পরের হক্ব আদায় করানো হবে। যখন তারা পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার, যাঁর হাতে রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ! দুনিয়াতে প্রত্যেকটি মানুষ তার বাড়ির পথ সম্পর্কে যেমন অবগত থাকে ঠিক তেমনি প্রত্যেক জান্নাতীই জান্নাতের পথ সম্পর্কে অবগত থাকবে। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেছেন, তাদের অবস্থা সেই লোকদের মত হবে যারা জুমআর নামাযের পর বাড়ি ফিরে এবং নিজের বাড়ির পথ ভোলেনা।

এবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পুলসেরাত পার হওয়ার সময় জান্নাতগামী লোকদেরকে বিলম্ব করানো হবে এবং পরস্পরের হক্ব আদায় করানো হবে। আর এমন অবস্থায় তারা জান্নাতে যাবে যে, তাদের কারো অন্তরে কোন রেষারেষি থাকবে না। ইমাম কুরতবী (রহঃ) লিখেছেন, এ অবস্থা তাদের হবে যাদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে না এবং যারা দোযখের শাস্তি ভোগের পর নাজাত পাবে, তাদেরকে পুলসিরাতের উপর বা তা অতিক্রম করার পর তাদের থেকে আর কোন হিসাব নেয়া হবে না; বরং সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করানো হবে।

আল্লামা এবনে হাজার (রহঃ) লিখেছেন, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে একথা এসেছে, মোমেনদেরকে দোযখ থেকে আলাদা করা হবে। এর অর্থ হল তাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করা হবে তথা তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে না, নিরাপদে পুলসেরাত পার হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে পরস্পর থেকে পরস্পরের যে বদলা দেয়া হবে তা কিভাবে হবে? কেননা, সেখানে দেরহাম দিনার বা টাকা পয়সা থাকবে না। এর জবাবে বলা যেতে পারে সেখানে নেক আমল এবং বদ আমলের মাধ্যমে লেনদেন হবে। এর পন্থা হবে এই, জালেমের যদি কোন নেক আমল থাকে তা মজলুমকে তার প্রতি জুলুমের বদলে দেয়া হবে। যদি জালেমের কোন নেক আমল না থাকে তবে মজলুমের গুনাহর বোঝা ইনসাফ মোতাবেক জালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুসলিম শরীফে এবং তিরমিজী শরীফের হাদীসে একথাও রয়েছে যে, যদি বদলা দেয়ার পূর্বেই কারো নেকী শেষ হয়ে যায় তবে মজলুমের গুনাহর বোঝা জালেমকে বহন করতে হবে। এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

জান্নাতীদের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করার তাৎপর্য

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, জান্নাতী মাত্রকে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করা হবে এবং পরস্পরকে পরস্পরের হক্ব আদায় করতে হবে। আল্লামা বগভী লিখেছেন, পরস্পরের রেষারেষি বা হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করা, পরস্পরের হক্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এতদ্ব্যতীতও হতে পারে। সুদ্দী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ জান্নাতীগণ যখন জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবেন তখন জান্নাতের ফটকের কাছে একটি বৃক্ষ দেখতে পাবেন। ঐ বৃক্ষের মূলে দু'টি ঝরণা থাকবে। যখন জান্নাতীগণ একটি ঝরণার পানি পান করবেন তখন তাদের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং রেষারেষির ভাব দূরীভূত হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআন এটিকেই "শারাবে তহুর" বলেছেন। যখন জান্নাতীগণ দ্বিতীয় ঝরনায় গোছল করবেন তখন তাদের চেহারা চমকদার এবং উজ্জ্বল হবে। এরপর আর কোন দিন তাদের চেহারা মলিন ও শুষ্ক দেখা যাবে না। আর চেহারার বর্ণও কোন দিন পরিবর্তন হবে না।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) দুটি কথা বলেছেনঃ (১) দুনিয়ার জীবনে মানুষের মনে কারো জন্যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কেননা শয়তান মানুষের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৪-০৫

মনে সর্বদা ওয়াস ওয়াসা দেয়ার কাজে সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ পাক বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে জান্নাতীদের মন থেকে সেই হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করবেন। (২) তিনি আরো বলেছেনঃ জান্নাতে বিভিন্ন মর্তবা থাকবে। নেককারদের মর্তবায় কম বেশি হবে। আল্লাহ পাক জান্নাতীদের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত করে দেবেন, এ কারণে একজন আরেকজনকে হিংসা করবে না।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতে দোযখীদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করবে, পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং একে অন্যের প্রতি লা'নত দেবে। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদের অবস্থা এই হবে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে অত্যন্ত প্রীতি ভালবাসার সম্পর্ক। জান্নাতে সকলেই থাকবে সন্তুষ্ট, কারো বিরুদ্ধে কারো কোন কথা থাকবেনা, কারো জন্যে থাকবেনা হিংসা-বিদ্বেষ। অথচ তাদের মর্তবায় পার্থক্য থাকবে কিন্তু তা কোন অবস্থাতেই হিংসা-বিদ্বেষের কারণ হবে না। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে যারা সত্য পথের অনুসারী, তাঁদের মধ্যেও মতের গরমিল হতে পারে এবং মনোমালিন্য ও বিরোধিতা থাকতে পারে। এ অবস্থা অস্বাভাবিক নয়।[২]

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, এতে একথা প্রমাণিত হয়, যদি কারো প্রতি হিংসা স্বভাবগত কারণে অনিচ্ছাকৃত হয় তবে তা বেহেশতে প্রবেশের পথে বাধা হবে না।[৩]

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ.

অর্থাৎ তাদের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়, যেভাবে আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের মনকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করবেন, ঠিক তেমনি তাদের প্রতি অনন্ত অসীম নেয়ামত ও রহমতের বারিধারা বর্ষিত হবে। তাই এ বাক্যাংশে এরশাদ হয়েছেঃ তাদের তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতে তাঁরা ধন্য হবেন। আর জান্নাতীগণ ঐ অবস্থায় আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হয়ে বলবেন–

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا.

আল্লাহ পাকের অগণিত শোকর যে, তিনি আমাদেরকে এখান পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে না পৌছাতেন তবে আমরা কখনও এখানে পৌছতে পারতাম না। এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য, মানুষ যত নেক কাজই করুক না কেন আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত তা সম্ভব নয়। এ সত্য বেহেশতবাসীরা উপলব্ধি করবেন এবং বলবেন, আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া মায়া এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের বরকতেই আমরা আজ এ সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছি। যদি আল্লাহ পাক দয়া না করতেন, যদি তিনি নবী রসূলগণকে প্রেরণ না করতেন তবে কি আমরা বেহেশত পর্যন্ত পৌছতে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৮০
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৩
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২২

পারতাম? কোথায় মাটির মানুষ আর কোথায় নূরানী জান্নাত। অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের, আমরা তাঁর মহান দরবারে শোকর আদায় করি।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন আমলের হেদায়েত করেছেন যার শুভ পরিণতি স্বরূপ আমরা জান্নাত লাভ করেছি।

لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ.

আর আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে তাঁর নবী রসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন, ফলে আমরা হেদায়েত লাভ করেছি। আম্বিয়ায়ে কেরাম জান্নাতের যে নেয়ামতের কথা বলেছিলেন তা স্বচক্ষে দেখার পরেই জান্নাতবাসীগণ একথা বলবেন।

বেহেশতবাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

আর জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হবে– তোমাদের নেক আমলের শুভ পরিণতি স্বরূপই তোমরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন ফেরেশতা এ ঘোষণা করবেন। কখন এ ঘোষণা করবেন? এ সম্পর্কে তফসীরকারদের দু'টি অভিমত রয়েছে–

১. জান্নাতবাসীগণ যখন দূর থেকে জান্নাত দেখবেন তখনই এ ঘোষণা হবে।

২. যখন জান্নাতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করবেন তখন এ ঘোষণা দেয়া হবে।

আল্লামা সয়ুতী (রহঃ) এ মত পছন্দ করেছেন, এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে– তোমাদের নেক আমলের কারণেই তোমাদেরকে জান্নাত দেয়া হলো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, জান্নাত প্রদানকে মিরাস শব্দ দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে, যেভাবে মিরাস বা উত্তরাধিকার কোন বিনিময় ব্যতীত পাওয়া যায় ঠিক এভাবে জান্নাতও শুধু আল্লাহ পাকের দান স্বরূপই পাওয়া যাবে। যদিও প্রকাশ্যে নেক আমল জান্নাত লাভের কারণ হবে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় জান্নাত শুধু আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কারণেই পাওয়া যাবে। কেননা নেক আমল আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত সম্ভব হয় না। অতএব, আল্লাহর দানেই জান্নাত লাভ হয়।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবে আগামীতে তোমরা সুস্থ থাকবে কখনো অসুস্থ হবে না, তোমরা জীবিত থাকবে কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না, তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না, তোমরা সুখে থাকবে কখনো দুঃখ পাবে না। এরপর তিনি এরশাদ করেনঃ এটিই হলো وَنُودُوا আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে দু'টি ঘর রয়েছে। একটি জান্নাতে আরেকটি দোযখে। যদি মৃত্যুর পর কেউ দোযখে যায় তবে জান্নাতবাসী তার জন্যে রক্ষিত জান্নাতের ঘরটির উত্তরাধিকারী হয়। আর এটিই হলো পবিত্র

কোরআনের এ আয়াতের (أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) অর্থ। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ أُورِثْتُمُوهَا তোমরা উত্তরাধিকারী হবে এ শব্দটির আরও একটি তাৎপর্য হল এই, তোমরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, এখান থেকে আর কেউ তোমাদেরকে বেদখল করবে না তবে তোমাদের আমলের কারণে নয়; বরং আল্লাহ পাকের রহমতেই তোমরা জান্নাত লাভ করেছ। জান্নাত হল তোমাদের পৈত্রিক আবাস, আজ আল্লাহ পাকের রহমতে তোমরা তার উত্তরাধিকারী হয়েছ। হাদীস শরীফে আছে, মানুষের কোন আমলই তাকে বেহেশতে প্রবেশ দান করতে পারে না, আল্লাহ পাকের রহমতই বেহেশতে প্রবেশের মূল কারণ হয়। মানুষের সত্য সাধনা, নেক আমল হল এর উপলক্ষ মাত্র। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য– "আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত আমিও বেহেশতে যেতে পারি না"। অতএব, বেহেশত লাভের মূল কারণ হল আল্লাহ পাকের রহমত। অবশ্য একথা সত্য যে, মানুষের সাধনা এবং নেক আমলের অনুপাতেই তার প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হয়।[১]

এ পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ সমীচিন মনে করি।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় পাঁচশ' বছর যাবত আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল ছিল। ঐ পাহাড়ের চারদিক লবণাক্ত পানি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। আল্লাহ পাক তার জন্যে পাহাড়ের অভ্যন্তরে সুপেয় পানির ঝরণা এবাং একটি আনারের গাছ সৃষ্টি করেন।

প্রতিদিন সে ব্যক্তি আনার ফল আহার করত এবং পানি পান করত আর পানি দিয়ে অজু করত। সে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট এই দোয়া করে– "হে আল্লাহ! আমার রুহ সেজদারত অবস্থায় কবজ করার ব্যবস্থা করো"।

আল্লাহ পাক তাঁর এ দোয়া কবুল করেন। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) বর্ণনা করেন, আমি আসমানে আসা যাওয়ার সময় তাকে সেজদারত দেখতাম। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে বলবেনঃ আমার এই বন্দাকে আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাও। ঐ ব্যক্তি বলবে না, বরং আমার আমলের বরকতে।

তখন নির্দেশ আসবেঃ আমার নেয়ামতের বিপরীতে তার কৃত আমল পরিমাপ কর। পরিমাপ করে দেখা যাবে পাঁচশ' বছরের এবাদত খতম হয়ে গেছে একটি চক্ষুর নেয়ামতের বিনিময়ে।

আল্লাহ পাক নির্দেশ দেবেনঃ আমার বন্দাকে দোযখে নিয়ে যাও। ফেরেশতারা তখন তাকে নিয়ে রওয়ানা হবে। কিছুদূর যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তি আরজ করবেঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাও। নির্দেশ আসবে তাকে ফিরিয়ে আন।

আল্লাহ পাকের নিকট ফিরিয়ে আনার পর তাকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করা হবে–

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৬
ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা-২০১

প্রশ্নঃ তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ হে আল্লাহ! আপনি।

প্রশ্নঃ এ কাজটা তোমার আমল, না আমার রহমতের বরকতে হয়েছে?

উত্তরঃ আপনার রহমতে।

প্রশ্নঃ তোমাকে পাঁচশ' বছর এবাদত করার শক্তি এবং তৌফিক কে দিয়েছে?

উত্তরঃ হে আল্লাহ! আপনি।

প্রশ্নঃ সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের উপর তোমাকে কে পৌঁছিয়েছেন? লবনাক্ত পানির মাঝে সুপেয় পানির ব্যবস্থা কে করেছেন? আনারের গাছ কে সৃষ্টি করেছেন? তোমার দরখাস্ত মোতাবেক সেজদার মধ্যে কে তোমার রূহ কবজ করার ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তরঃ হে পরওয়ারদেগার! আপনি। এরশাদ হবে এসব কিছু আমার রহমতে হয়েছে এবং আমার রহমতেই তোমাকে জান্নাতে দাখেল করছি।[১]

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ﴿۴۴﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿۴۵﴾
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ۚ
وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿۴۶﴾
وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا
تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۷﴾

১। রওজাতুস সালেহীন খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪

তরজমা

(৪৪) আর বেহেশতবাসীগণ দোযখীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে কথা দিয়েছিলেন তা আমরা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে হ্যাঁ, এমন সময় এক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে আল্লাহর লা'নত সেই জালেমদের উপর।

(৪৫) যারা আল্লাহর পথে বাধা দান করত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত আর তারা আখেরাতকে অস্বীকার করত।

(৪৬) আর তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনে নেবে এবং জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদেরকে জানাই সালাম, আরাফবাসীগণ এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, তবে আশা করে।

(৪৭) আর যখন দোযখীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাপীষ্ঠদের সঙ্গী করোনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নেককারদের সওয়াবের কথা তথা জান্নাতবাসীদের পুরস্কারের কথা এবং কাফেরদের শাস্তির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে জান্নাতবাসীদের জান্নাতে এবং দোযখীদের দোযখে প্রবেশ করার পর তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হবে আলোচ্য আয়াতে তার আলোচনা রয়েছে।

জান্নাতবাসী ও দোযখীদের মধ্যে কথাবার্তা

জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে চলে যাবেন এবং দোযখীদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখন জান্নাতবাসীগণ দোযখীদের সঙ্গে কথা বলবেন, সে কথার বিবরণই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

বস্তুতঃ ঈমানদারগণ সেদিন পরম সাফল্য লাভ করবেন আর যারা ইসলামের দুশমন, যারা কাফের, মুশরেক, বে-দ্বীন, আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ তারা হবে সেদিন চরম বিপদের সম্মুখীন। একথা প্রকাশ করাই হলো এ কথোপকথনের উদ্দেশ্য। বেহেশতবাসীগণ সেদিন দোযখীদেরকে কটাক্ষ করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ঈমান এবং নেক আমলের জন্যে যে সমস্ত নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য পেয়েছি, আমরা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করছি। আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে যে শাস্তি হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং নবী রসূলগণ যে সম্পর্কে তোমাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ?

তখনতো তোমরা এসব কথায় বিশ্বাস করোনি? এখন কি তোমাদের বিশ্বাস হয়েছে? তখন তারা বলবে হ্যাঁ যে আযাব সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাতেই আমরা

বর্তমানে গ্রেফতার হয়েছি। একথার একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক দিনে।

সেদিন সত্তর জন কাফের বদর রণাঙ্গণে নিহত হয়। তাদের মধ্যে আবু জেহেল সহ তথাকথিত নেতৃস্থানীয় কাফেরও ছিল। তাদেরকে এক গর্তে ফেলা হয়। ঐ গর্তের পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের এক একজনের নাম ধরে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, হে আবু জেহেল এবনে হেশাম, হে ওতবা এবনে রবীয়া, হে শাইবা এবনে রবীয়া, হে অমুক, হে অমুক–

هَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّىْ وَجَدْتُّ مَا وَعَدَنِى رَبِّىْ حَقًّا.

তোমাদের পরওয়ারদেগার তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? নিশ্চয় আমার সঙ্গে তিনি যে ওয়াদা করেছেন তা আমি সত্য পেয়েছি। সেদিন যেভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল্লাহ পাকের ঘোষণা ঘটনায় পরিণত হয়েছে কি-না, ঠিক তেমনি জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবেন এবং দোযখীরাও দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে তখন আল্লাহ পাকের কুদরত এবং রহমতে দোযখীদের সঙ্গে জান্নাতবাসীগণ একথা বলবেন। দোযখীরা তখন স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ পাকের ওয়াদা ছিল সত্য, আমরা দুনিয়ার জীবনে এসব কথা বিশ্বাস করিনি এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিনি, তাই আজ তার পরিণাম ভোগ করছি।

পবিত্র কোরআনের সূরা ছোয়াফ্যাতে বিস্তারিতভাবে দু' ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারা পরস্পর বন্ধু ছিল কিন্তু একজন ছিল মোমেন, আরেকজন ছিল কাফের। আখেরাতে মোমেন জান্নাতে এবং কাফের দোযখে যাবে। একে অন্যের অবস্থান দেখতে পাবে এবং উভয়ে কথা বলবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ. قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ.

জান্নাতী সাথী দোযখীকে দেখবে যে সে দোযখের মধ্যখানে রয়েছে। তখন বলবে, "হে হতভাগা! তুইতো চেয়েছিলি আমিও তোর মত ধ্বংস হই, যদি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান না হত আমিও তোর মত ধ্বংস হয়ে যেতাম"।[১]

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ.

যখন জান্নাতবাসী ও দোযখীদের মধ্যে এ কথাবার্তা হবে তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একজন ঘোষক এই ঘোষণা করবে, আল্লাহর লা'নত হোক সেই পাপীষ্ঠদের উপর, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখত, নিজেরাতো পথভ্রষ্ট ছিলই, অন্যদেরকেও

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯
তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৯
তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮১১

পথভ্রষ্ট করে, মানুষকে হেদায়েতের পথ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন-বিধানে দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় আর তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই করেনা। ইসলামী নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে তারা যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করে যাতে করে মানুষ দ্বীন ইসলাম গ্রহণে বিরত হয়। পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকত, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা ভাবতেও রাজী হতো না। ঐ ফেরেশতা উচ্চস্বরে যখন জালেমদের প্রতি লা'নত দেবে তখন তা সকলেই শ্রবণ করবে এবং তারা যে পাপীষ্ঠ, তারা যে জালেম তথা কাফের ও মুশরেক তা সকলে জানতে পারবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ.

"হেযাব" শব্দটির অর্থ পর্দা, আড়াল, অন্তরাল, বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের সামান্য ছিটে-ফোটাও যেন দোযখীরা না পায়, এমনিভাবে দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তির সামান্য আভাসও যেন বেহেশতের কাছে না পৌঁছায়, তার জন্যে একটি প্রাচীর বা অন্তরাল থাকবে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা হাদীদে এরশাদ হয়েছেঃ

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ الاية

অর্থাৎ বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে যা একটিকে আরেকটির কাছ থেকে আড়াল করে রাখবে। بَيْنَهُمَا (উভয়ের মাঝখানে) এর অর্থ বেহেশত এবং দোযখের মধ্যস্থলে থাকবে এই প্রাচীর, অথবা বেহেশতবাসী এবং দোযখবাসীর মধ্যস্থলে থাকবে এই প্রাচীর।[১]

এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, যখন জান্নাত এবং দোযখের মধ্যে প্রাচীর থাকবে তখন উভয় স্থানের অধিবাসীরা কথা বলবে কিভাবে অথবা একে অন্যকে দেখবে কিভাবে? কেননা, কথা বলার জন্যে বা দেখার জন্যে প্রাচীর অন্তরাল হয় না।

আজকের পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির কারণে পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকের সঙ্গে আরেক প্রান্তের লোকেরা মত বিনিময় করতে পারে এবং একে অন্যকে দেখতে পারে। অতএব, জান্নাত এবং দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে কথাবার্তা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ আখেরাতের জিন্দেগীর যে অবস্থা এবং পরিবেশ হবে সে সম্পর্কে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় সঠিক ধারণা করাও সম্ভব নয়, যতটুকু আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।

وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ

জান্নাত এবং দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীরকেই আরাফ বলা হয়। الاعراف শব্দটি عرفه এর বহুবচন, عرفه বলা হয় উঁচু জমীনকে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৮৬

বর্ণনা করেন, এটি একটি উঁচু স্থান যা জান্নাত এবং দোযখের মধ্যে অবস্থিত। কিছু লোককে সেখানে অপেক্ষমান রাখা হবে। সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আরাফ বলা হয় সে স্থানকে যেখানকার লোকেরা একে অন্যকে চিনবে। আরাফের অধিবাসী কারা? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত হোজায়ফা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম মত প্রকাশ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন যখন মানুষের নেক আমল এবং বদ আমল পরিমাপ করা হবে তখন যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারি হবে তারা বেহেশতে যাবে। আর যাদের বদ আমলের পাল্লা ভারি হবে তারা দোযখে যাবে। কিন্তু যাদের নেক আমল বদ আমল সমান সমান হবে তারা বেহেশতেও যাবে না দোযখেও যাবে না। তারা থাকবে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী আরাফে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) এবনে মরদবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আরাফবাসী সে সব লোক হবে যাদের নেক এবং বদ আমল সমান হবে। তাদের নেক আমল তাদেরকে দোযখে যেতে বাধা দেবে কিন্তু সেই নেক আমল এই পরিমাণে থাকবে না যে তারা বেহেশতে যেতে পারে।

এবনে জরীর এবং বায়হাকী হযরত তালহা (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আরাফ জান্নাত এবং দোযখের মধ্যবর্তী দেয়াল। আরাফের অধিবাসী তারা হবে, যাদের বড় বড় গুনাহ থাকবে, এজন্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে আরাফে রেখে দেবেন। চেহারার কৃষ্ণতায় দোযখীদেরকে এবং চেহারার ঔজ্জ্বল্যের জন্যে জান্নাতীদেরকে চেনা যাবে। জান্নাতবাসীকে দেখে তাদের জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্খা হবে কিন্তু দোযখকে দেখে তা থেকে আরাফবাসী পানাহ চাইবে। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ তাঁদের রচিত তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আরাফ হল জান্নাত এবং দোযখের মধ্যস্থিত একটি দেয়াল। আরাফবাসী হবে সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক সেখানে বসিয়ে দেবেন। এরপর যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করার ইচ্ছা করবেন তখন তাদেরকে সর্বপ্রথম একটি নদীর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে যার নাম হল নহরে হায়াত বা জীবন-নদী, যার দু' তীর স্বর্ণ দ্বারা বাঁধানো থাকবে আর মাটি হবে তার কস্তরী। ঐ নদীতে আরাফবাসীকে নিক্ষেপ করা হবে, তারা গোসল করে উঠলেই তাদের বর্ণ সঠিক রূপ ধারণ করবে এবং তাদের বক্ষে একটি ধবধবে সাদা চমকদার তিল প্রকাশ পাবে।

আল্লাহ পাক তখন তাদেরকে তলব করে জিজ্ঞাসা করবেন, এখন তোমাদের কি আকাঙ্খা? তখন তারা তাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করবে এবং তাদের সে আকাঙ্খা পূর্ণ করা হবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমরা যা চেয়েছ সবই তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৯

বরং তার চেয়েও সত্তর গুণ বেশী। এরপর তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। তাদের বক্ষের সেই চমকদার তিলটি তাদের পরিচয় বহন করবে, তাদেরকে জান্নাতের মিসকীন বলা হবে। আবুশ শেখ এবনে মুনকাদেরের সূত্রে একজন মোজানী ব্যক্তির বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরাফবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি এরশাদ করেনঃ তারা হল সে সব লোক, যারা পিতার অনুমতি ব্যতীত জেহাদে গিয়েছে এবং পিতার অবাধ্য অবস্থাতেই জেহাদে শহীদ হয়েছে। যেহেতু তারা তাদের পিতার অবাধ্য হয়েছিল এজন্যে তাদেরকে বেহেশতে যেতে দেয়া হবে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছে এজন্যে দোযখেও প্রেরণ করা হবে না।

তেবরানী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরাফবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি এরশাদ করেনঃ এরা সে সব লোক যারা তাদের পিতার অবাধ্য অবস্থায় আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করে। শাহাদতের কারণে তাদেরকে দোযখে প্রেরণ করা হবে না আর পিতার অবাধ্য হওয়ার কারণে জান্নাতেও পৌঁছানো হবে না। তাদের গোশ্ত এবং চর্বি গলে যাবে আর যখন আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের হিসাব নিকাশ শেষ করবেন, আরাফবাসী ব্যতীত আর কেউ তখন অবশিষ্ট থাকবেনা তখন আল্লাহ পাকের রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আরাফবাসী যে শুধু এসব লোকই হবে তা নয়; বরং এছাড়া আরো লোক থাকবে যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যাদের ভাল এবং মন্দ কাজ সমান সমান হবে তারাও আরাফবাসী হবে।

আবু দাউদ এবং এবনে জরীরের বর্ণনার উদ্ধৃতি রয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরাফবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, এরা আল্লাহর সে সব বন্দা হবে যাদের সিদ্ধান্ত সর্বশেষে হবে। সকলের হিসাব নিকাশ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ পাক তাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করবেনঃ তোমাদের নেকীর কারণে তোমরা দোযখ থেকে বেঁচে গিয়েছে কিন্তু নেকী কম হওয়ার কারণে জান্নাতে যেতে পারনি। এখন তোমরা মুক্ত, জান্নাতের যে কোন স্থানে ইচ্ছা ভ্রমণ করো। এবনে মরদবিয়া এবং আবুশ শেখ দু'টি সূত্রে হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সে সব লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাদের ভাল ও মন্দ আমল সমান সমান হবে। তখন তিনি এরশাদ করেন, তারাই হল আরাফবাসী, যারা জান্নাতে যেতে পারবে না কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্খা রাখবে।

وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ.

আরাফবাসীগণ যেহেতু জান্নাত এবং দোযখের মধ্যস্থলে থাকবে তাই তারা বেহেশত এবং দোযখবাসীকে দেখতে পাবে। বেহেশতবাসীকে দেখে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেঃ

"আসসালামু আলাইকুম" অর্থাৎ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক"। এই আরাফবাসী তখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না তবে বেহেশতে প্রবেশের আকাঙ্খা করবে। হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে আশা আকাঙ্খার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবেন, কেননা তাদের প্রতি দয়া করা আল্লাহ পাকের মর্জি হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের অন্তরে কোন আকাঙ্খা থাকবে না।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ.

আর যখন তাদের চোখ দোযখীদের দিকে ফেরানো হবে তখন তারা তাদের বিপদ লক্ষ্য করে বলবেঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এই জালেম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করোনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-ভঙ্গি দ্বারা বোঝা যায় যে, আরাফবাসীগণ আশা এবং ভয়ের মধ্যে থাকবে আর এ অবস্থা তাদের নেক আর বদ আমল সমান হওয়ার কারণেই হবে। পক্ষান্তরে আম্বিয়ায়ে কেরাম, শহীদগণ নেককারদের অবস্থা এমন হবে না, কেননা তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে তাদের কোন ভয় হবে না এবং দুশ্চিন্তাও থাকবে না।[১]

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا
يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمْ قَالُوا۟ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ
ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ وَنَادَىٰٓ
أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ ٱلَّذِينَ
ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ
نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১০-১১

তরজমা

(৪৮) আরাফের অধিবাসীগণ যে লোকদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দলবল এবং তোমাদের অহংকার কোন কাজেই আসল না।

(৪৯) এই কি তারা? যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহর রহমত তারা পাবে না। তাদেরকে বলা হবে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

(৫০) দোযখীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের উপর একটু পানি ঢেলে দিও, অথবা আল্লাহ পাক জীবিকা রূপে তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা থেকে কিছু দিও, তারা বলবে, আল্লাহ পাক উভয়টিকেই কাফেরদের জন্যে হারাম করেছেন।

(৫১) যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা মনে করেছে এবং তাদের পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল, তেমনি আমিও আজ তাদেরকে ভুলে থাকব।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحٰبِ النَّارِ.

(যখন আরাফবাসীর চোখ দোযখীদের দিকে ফেরানো হবে) তাই আলোচ্য আয়াতে আরাফবাসীগণ দোযখীদের সঙ্গে যে কথা বলবেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَادٰى أَصْحٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ.

অর্থাৎ আরাফবাসীগণ দোযখীদের মধ্যে যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দলবল, তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের অহংকার আজ তোমাদের কোন কাজে লাগল না। এ মহাবিপদের মুহূর্তে তোমাদের কোন উপকারেই আসল না।

يَعْرِفُوْنَهُمْ

মূলতঃ দোযখীদের চোখে-মুখে দোযখের জ্বালা-যন্ত্রণা এবং পরিচয় প্রকাশ পাবে এবং তাদেরকে চিনতে আদৌ কোন কষ্ট হবে না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ আরাফবাসীগণ তাদেরকে দেখেই চিনবে কেননা, যারা কোপগ্রস্ত তাদের চেহারায় তার চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে।

সাধারণতঃ মানুষ অর্থ-সম্পদ তথা ধনবল, জনবল বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কারণে অহংকার করে কিন্তু ধনবল জনবল এবং ক্ষমতা মানব জীবনে নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। জীবন

যখন ক্ষণস্থায়ী, জীবনের সামগ্রীও ক্ষণস্থায়ী অতএব, এসবের উপর ভিত্তি করে অহংকার করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম যখন দ্বীন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতেন তখন যাদের কাছে ধনবল বা জনবল থাকত তারা অহংকারী হয়ে দ্বীন ইসলামের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করত। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় মক্কাবাসীকে দ্বীন ইসলামের আহ্বান জানালেন তখনও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল, যারা ছিল ধন-সম্পদের অধিকারী অথবা নেতৃত্বের দাবীদার তারা সত্য ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো, দ্বীন ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, তাদের দলবল এবং অর্থ-সম্পদের কারণে তারা অহংকারী হল, যারা সমাজে দুর্বল শ্রেণী ছিল তাঁরাই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করলেন, যেমন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত সোহায়েব রুমী (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে দেখে বিদ্রুপ করত এবং বলত এ দুর্বল লোকেরাই কি আল্লাহর রহমত পাবে?

আরাফবাসীগণ তাই দোযখীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, যে দরিদ্র লোকেরা সেদিন দ্বীন ইসলাম কবুল করেছিল তোমরা তাদের সম্পর্কে শপথ করে বলতে যে, তারা কোনদিন আল্লাহর রহমত পাবে না। তদানীন্তন সমাজ জীবনে তারাই ছিল অবহেলিত, উপেক্ষিত। তাদের কাছে ধনবল, জনবল বলতে কিছুই ছিল না, কিন্তু আজ তারা ভাগ্যবান। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতে তাঁরা ধন্য, তাঁদেরকে বলা হয়েছেঃ

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.

তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে, তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই। অথচ হে দোযখবাসী! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কারণে, তোমাদের জনবলের গরিমায় তোমরা অহংকারী ছিলে, সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলে, তাই আজ তোমরা দোযখে নিক্ষিপ্ত এবং কোপগ্রস্ত।

আলোচ্য আয়াতে جمعكم শব্দটি সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সাহায্যকারী ও সমর্থকদের দল, অথবা তোমাদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ। কালবী (রঃ) লিখেছেন যে, আরাফবাসীগণ মক্কার ওলীদ এবনে মুগীরা এবং আবু জেহেল এবনে হেশাম সহ অন্যান্য কাফেরদের নাম ধরে ডাকবেন এবং এসব কথা বলবেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, একথাটি ফেরেশতাগণ আরাফবাসীদেরকে বলবে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পৌঁছে গেছে, দোযখীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে অতএব, হে আরাফবাসী! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই। আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আরাফবাসীগণ যখন দোযখীদের সঙ্গে কথা বলবেন তখন দোযখীরা জবাব দেবেঃ ঐ দুর্বল লোকেরা যদি জান্নাতে গমন করে থাকে তবে তোমাদের কি? তোমরাতো জান্নাতে যেতে পারবেনা। দোযখীরা শপথ করে বলবে, তোমরা অবশ্যই দোযখে আসবে '

একথা শ্রবণ করে পুলসেরাতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ দোযখীদেরকে বলবেঃ তোমরাই আরাফবাসীদের সম্পর্কে বলেছ তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে না।

এরপর আরাফবাসীর প্রতি ইঙ্গিত করে তারা বলবেন, তোমরা নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত মনে বেহেশতে চলে যাও। আল্লামা বগভী (রঃ) আতার (রঃ) সূত্রে আরো লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন আরাফবাসী চলে যাবে তখন দোযখীদের অন্তরেও একটু লোভ হবে, তারা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন জান্নাতে রয়েছে, আমাদেরকে তাদের সাথে কথা বলার এবং দেখা করার অনুমতি দান করুন, আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে অনুমতি দান করবেন। তখন তারা তাদের জান্নাতী আপনজনদের অবস্থা দেখতে পারবে এবং আল্লাহ পাকের যে অনন্ত অসীম নেয়ামত তারা ভোগ করছে তা-ও প্রত্যক্ষ করবে।

দোযখীরা তাদের জান্নাতী আপনজনদের চিনতে পারবে কিন্তু দোযখের শাস্তি ও পরিণামে তাদের চেহারা বিকৃত হওয়ার কারণে বেহেশতবাসীগণ তাদেরকে চিনতে পারবেন না। দুনিয়াতে যারা তাদের আপনজন ছিল; ঈমান ও নেক আমলের বরকতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে তারা আজ জান্নাতের অধিবাসী, আল্লাহ পাকের অনুমতি ক্রমে দোযখীরা জান্নাতীদের সঙ্গে কথা বলবে এবং পানাহারের ছিঁটে ফোটা দান করার জন্যে আবেদন করবে। সেই আবেদনের কথাই পরবর্তী আয়াত এরশাদ হয়েছেঃ

দোযখীদের আবেদন

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ.

দোযখীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে (নিজেদের আত্মীয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে) আবেদন করবে, আমাদের দিকে সামান্য পানি ফেলে দাও। (আমরা বড় তৃষ্ণার্ত) আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে রিয্ক দান করেছেন তা থেকে ছিঁটে ফোটা হলেও আমাদের দিকে নিক্ষেপ কর (আমরা বড় ক্ষুধার্ত)।

দোযখীদের এ আবেদনের জবাবে জান্নাতবাসীগণ বলবেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্যে দানা-পানি হারাম করে দিয়েছেন।)

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ জান্নাতীদের আপন আত্মীয়-স্বজন যেমন পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী যদি দোযখে যায় এমন আপনজনরাই তাদের বেহেশতবাসী আত্মীয়-স্বজনের নিকট দানা-পানির আবেদন করবে। আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে জান্নাতবাসীগণ জবাব দেবেন, দানা-পানি কাফেরদের জন্যে হারাম, তাই আমরা কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন্ জিনিসের সদকা উত্তম, তিনি বলেন, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সবচেয়ে উত্তম দান হল পানি। দেখ, দোযখীরা জান্নাতবাসীদের নিকট পানির জন্যে আবেদন করবে।

বর্ণিত আছে আবু তালেব যখন তার মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয় তখন কোরায়শ গোত্রের কিছু লোক তাঁকে বলে, তোমার ভ্রাতঃস্পুত্রের নিকট কারো মাধ্যমে অনুরোধ কর যেন তিনি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্যে বেহেশতের আঙ্গুর পাঠিয়ে দেন।

আবু তালেবের প্রেরিত ব্যক্তি যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়, তখন তাঁর খেদমতে হযরত আবুবকর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আবু তালেবের জন্যে বেহেশতের আঙ্গুরের আবেদন পেশ করা হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক জান্নাতের পানাহারের বস্তু কাফেরদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।[১]

এবনে আবিদ্দুনিয়া যায়েদ এবনে রাফীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করে বহুদিন ক্রন্দন করবে, তাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে, এরপর অশ্রুর বদলে রক্ত বের হতে থাকবে, দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবে, হে হতভাগার দল! তোমরা দুনিয়াতে ক্রন্দন করোনি আজ কার নিকট ফরিয়াদ করছো?

তখন তারা চিৎকার করে জান্নাতবাসী আত্মীয়-স্বজনকে ডাকবে, কেউ পিতাকে, কেউ মাতাকে, কেউ সন্তান-সন্ততিকে ডাকবে এবং বলবে, আমরা কবর থেকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বের হয়েছি। হাশরের ময়দানেও আমরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পিপাসাগ্রস্ত রয়েছি অতএব, আমাদের প্রতি সদয় হও, তোমাদেরকে প্রদত্ত পানি এবং আহার্য থেকে সামান্য পরিমাণ আমাদেরকেও দাও। (চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর) যন্ত্রণাকাতর দোযখীরা এভাবে মিনতি জানাতে থাকবে কিন্তু তাদেরকে কোন জবাব দেয়া হবে না। অবশেষে তাদেরকে উপরোক্ত জবাব দেয়া হবে যে, আমরা তোমাদেরকে কোন কিছু দান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কেননা, আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্যে বেহেশতের দানা-পানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

এর পরবর্তী আয়াতে এ কাফেরদের কিছু পরিচয় বর্ণিত হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ এ কাফেররাই তো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করেছে। যারা দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি বিদ্রুপ করেছে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে গেছে। দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে বেহেশতবাসীর চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ-শান্তির কথা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছে এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে উপেক্ষা করেছে, তাই তাদের এই পরিণাম। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬২

فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا.

আজ আমি তাদেরকে ভুলে থাকব যেমন তারা এদিন হাযির হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। আর যেহেতু তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছিল তাই আজ তাদের জন্যে হবে কঠিন কঠোর শাস্তি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ "আজ আমি তাদেরকে ভুলে থাকব"–এর অর্থ হল তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আর দুনিয়াতে তারা একথা ভুলে গিয়েছিল যে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে, এর তাৎপর্য হল এমন নেক আমল পরিত্যাগ করা, যা কেয়ামতের দিন উপকারী হবে।[১]

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ
تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ
غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

তরজমা

(৫২) আর আমি অবশ্যই তাদেরকে এমন কিতাব প্রদান করেছি যাতে পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি, আর যা মোমেনদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত।

(৫৩) তবে কি তারা তাঁর বক্তব্য প্রকৃত রূপে আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে? যেদিন তাঁর বক্তব্য আসল রূপে প্রকাশ পাবে যা তারা ইতিপূর্বে ভুলেছিল, তারা তখন বলতে থাকবে আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ সত্য কথাই নিয়ে এসেছিলেন, এখন কি তবে আমাদের জন্যে সুপারিশকারী কেউ আছে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হবে? যেন আমরা পূর্বে যা করতাম তা থেকে ভিন্নতর কিছু করতে পারি? তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছে, তাদের মিথ্যা রচনা সেদিন হারিয়ে যাবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জান্নাতবাসী এবং দোযখীদের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর আরাফে অবস্থানকারীদের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। এ তিনটি দলের মধ্যে যে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৩

কথাবার্তা হবে তারও আলোচনা রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের কথা রয়েছে।[১]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

আমি তোমাদেরকে এমন কিতাব প্রদান করেছি যার মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রয়েছে মোমেনদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত। যারা বুদ্ধিমান যারা ঈমানদার, তারা মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তারা নিজেদের বর্তমানকে সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করেছে। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও করেছে। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যাহত, যারা অপরিণামদর্শী তারা আল্লাহর কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং নিজেরা নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ

بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ

এর অর্থ হল আল্লাহ পাক মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে হালাল হারামকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আকীদা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

عَلٰى عِلْمٍ

অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের পথ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন, তাই মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন আর যা অকল্যাণকর তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্যে বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন এবং এ মহান গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে মানব জাতির কল্যাণের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা কাফেরদের এ ওজর-আপত্তি যে, আমরা বুঝতে পারিনি, জানতে পারিনি বা সত্যের সন্ধান পাইনি– এ ধরনের কথার পথ বন্ধ হয়ে গেল, আখেরাতে তাদের যে কঠোর কঠিন শাস্তি হবে এ ব্যাপারে তাদের আর কোন বক্তব্য থাকবে না। কেননা, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

"আমি যে পর্যন্ত রসূল প্রেরণ না করি সে পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে কোপগ্রস্ত করিনা"। অথচ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল আগমন করেছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে পরিপূর্ণ হেদায়েত এবং রহমত। কিন্তু যারা হতভাগা, তারা এ হেদায়েত কবুল করেনা এবং রহমতুললিল আলামীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুসারী হয় না।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৯৪
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৩

আলোচ্য আয়াতে هُدًى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লিখেছেনঃ হেদায়েত হল আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা। যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক স্তর রয়েছে তাই হেদায়েতেরও অনেক স্তর রয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম স্তর হল কুফর এবং শেরক থেকে নাজাত লাভ করা এবং তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং রেসালত ও আখেরাতে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। যারা হেদায়েতের এই স্তর পার হতে পারে তাদের দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায় যে ইতিপূর্বে দিশেহারা ছিল, সে যদি দিশারীর মাধ্যমে পথের সন্ধান পায় তবে বলা হবে যে সে হেদায়েত পেয়েছে। এজন্যে হেদায়েতের অন্বেষণ করতে হয় সর্বক্ষণ এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এ কারণেই সূরা ফাতেহায় আল্লাহ পাকের নিকট একটি দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

"হে আল্লাহ! আমাদরেকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত কর"।

সূরা ফাতেহা প্রত্যেক নামাযে অবশ্য পাঠ্য। এর অর্থ হল প্রত্যেককে প্রতি দিন বারে বারে আল্লাহ পাকের দরবারে হেদায়েতের জন্যে মিনতি জানাতে হয়। যেহেতু আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের অগণিত স্তর রয়েছে তাই বন্দাকে প্রত্যেক স্তরে পৌঁছার পর পরবর্তী স্তরের উন্নতি লাভের জন্যে আরজী পেশ করতে হয়। আর যে মকাম বা স্তরে সে থাকে তার উপরের স্তর সে লাভ করে। এ পর্যায়ে সর্বশেষ স্তর হল জান্নাতে পৌঁছা।

অতএব, আল্লাহ পাকের নৈকট্য অন্বেষণকারীকে দরবারে এলাহীতে হেদায়েতের জন্যে মুনাজাত করতে হয়।[১]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ.

যেহেতু এমন সুস্পষ্ট এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পরও এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মক্কার পৌত্তলিকরা ঈমান আনল না, তাই তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তারা কি শুধু তাদের পরিণাম দেখার অপেক্ষায় রয়েছে? যেদিন সেই পরিণাম উপস্থিত হবে সেদিনকে তারা এখন ভুলে আছে, সেদিন তারা বলবে আমাদের নিকট আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে নবী রসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস করিনি।

মূলতঃ পবিত্র কোরআনে কাফের মুশরেকদের জন্যে যে শাস্তির ঘোষণা রয়েছে সেই ঘোষণা মোতাবেক যখন তারা তাদের শাস্তি দেখবে তখন অনুতপ্ত হবে কিন্তু তাদের অনুতাপ বা বিলাপ কোন উপকারে আসবে না। অসহায়, নিরুপায় অবস্থায় তারা সুপারিশকারীর অনুসন্ধান করবে। কিন্তু তাদের জন্যে কেউ সুপারিশকারী হবে না। ঐ অবস্থায় অগত্যা তারা এই আবেদন করবে, যদি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেয়া হয় তবে অতীতের মত অন্যায় কাজ করব না; বরং সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করব।

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮০৯-১০

কিন্তু তাদের এ আবেদনে কর্ণপাত করা হবে না; বরং বলা হবে তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছে। তারা যে মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করতো এবং যে ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলত সবই তাদের হারিয়ে যাবে, তাদের উদ্ধারের কোন পথ উম্মুক্ত থাকবে না, তাদেরকে দুনিয়াতে ফেরতও পাঠানো হবে না, তাই তাদের শাস্তি হবে অবধারিত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে تَأْوِيْل শব্দের অর্থ হলো পবিত্র কোরআনে যে সব শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতে "তাবীল" শব্দটির অর্থ হল নেককারদের পুরস্কার এবং বদকারদের শাস্তি।

يَوْمَ يَأْتِىْ تَأْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ.

অর্থাৎ যেদিন তাদের পরিণাম দেখা যাবে– সেদিন মৃত্যুর দিন, অথবা কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষ সারা জীবনের সাধনার শুভ পরিণতি অথবা শাস্তি দেখতে পাবে।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও নাফরমান হয়ে জীবন-যাপন করে তারা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের সর্বনাশের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী হবে, তারা সেই কঠিন বিপদের মুহূর্তে কোন সুপারিশকারী বা সাহায্যকারী পাবে না এবং পুনরায় পৃথিবীতে এসে সৎ কাজের অঙ্গীকার করলে তার অনুমতি পাবে না, বরং চিরদিন তাদেরকে কঠোর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

(তাদের মিথ্যা রচনা তখন হারিয়ে যাবে।)

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, দুনিয়াতে কাফের মুশরেকরা হাতে বানানো মূর্তির পূজা করতো এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সামনেই মাথা নিচু করতো, কিন্তু এসব মূর্তি তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। অথবা এর অর্থ হল তারা যে বাতিল ধর্মে বিশ্বাস করতো সেই ধর্ম তাদের জন্যে উপকারী হবে না। ইমাম রাজী (রঃ) আরও বলেছেনঃ এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা দুনিয়াতে এ অবস্থায় ছিল যে, ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে পারতো। এজন্যেই তারা এ আবেদন করবে যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে আসার সুযোগ দেয়া হয় তবে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে। যদি দুনিয়াতে ঈমান আনয়নের শক্তি তাদের না থাকতো তবে দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে আসার আকাঙ্খা করতো না'।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُغْشِي الَّيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۗ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ
بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾ اُدْعُوا
رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

তরজমা

(৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকই, যিনি আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠান করেন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জ যা তাঁর তাবেদার, এসব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। মনে রেখো, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ প্রদান করা তাঁরই কাজ। তিনি যে মহামহিম, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক।

(৫৫) তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কাকুতি-মিনতি সহকারে গোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(৫৬) শান্তি স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। আর তাঁকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।

(৫৭) তিনিই সৃষ্টির পূর্বে সুখবর বহনকারী সমীরণ প্রেরণ করেন, শেষ পর্যন্ত সেই বাতাস দুর্বহ মেঘমালা বয়ে আনে। তখন তাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালনা করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, এরপর তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি, এভাবেই মৃতদেরকেও বের করব যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আখেরাতের পুরস্কার এবং শাস্তির বিবরণ ছিল। মুশরেকরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করতো না। আলোচ্য আয়াত সমূহে বিশ্ব সৃষ্টির কথা উল্লেখিত হয়েছে যা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব নিদর্শন বহন করে এবং তিনি যে বিশ্ব মানবের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনিই যে মানুষের রিয্কদাতা একথার বহু জ্বলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে এবং এরপর আল্লাহ পাক একথাও এরশাদ করেছেনঃ যেভাবে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত শুষ্ক জমীনকে তিনি সঞ্জীবিত করেন, এভাবে মৃত মানুষকে পুনঃ জীবন দান করবেন এবং কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে তাঁর মহান দরবারে হাযির করবেন।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআনের মূল বক্তব্য চারটি তৌহীদ, নবুওয়্যত, আখেরাত এবং তকদীর। আর একথা সত্য তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং তাঁর অনন্ত অসীম কুদরতের প্রতি বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। তাই আলোচ্য আয়াতে তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে কয়েকটি দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রাত ও দিনের পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁরই, আর আদেশ প্রদানের অধিকারও শুধু তাঁরই। অতএব, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হল মহান আল্লাহ পাকের দরবারে বিনয় প্রকাশ করা, কাকুতি-মিনতি করা আর দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি না করা।[২]

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ.

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকই যিনি মাত্র ছয় দিনে সমগ্র আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন"।

তফসীরকারগণ আলোচনা করেছেন, যে ছয়দিনের কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে এর দ্বারা কি দুনিয়ার ছয়দিনের সমান সময়ের কথা বলা হয়েছে?

অথবা আখেরাতের ছয়দিনের সময়ে আসমান জমীন তৈরী করেছেন? কেননা আখেরাতের এক দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রহঃ) লিখেছেনঃ এ দিনগুলো যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে– আমাদের পরিচিত সূর্যের পরিক্রমার ফল নয় কেননা, তখন সূর্যের অস্তিত্বই ছিল না অতএব, এ দিনগুলো পৃথিবীর দিনগুলোর সমান নয়; বরং অদৃশ্য জগতের দিন। তিনি একথাও লিখেছেন, এ বিষয়ে তফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে তবে আখেরাতের দিন হওয়াই অধিকতর সঠিক মনে হয়।[৩]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৯৪
৩। ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা-২০৩

সৃষ্টির জন্যে ছয় দিনের প্রয়োজন কেন হলো?

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আসমান জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে ছয় দিনের প্রয়োজন কেন হল? কেননা, আল্লাহ পাক এক মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছেঃ

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.

অর্থাৎ "চোখের পলকের সমান সময়ের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকর হয়" আর অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"যখন আল্লাহ পাক কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি শুধু বলেন, হও তখন তা হয়ে যায়", এমন অবস্থায় আসমান জমীন সৃষ্টির জন্যে ছয় দিনের প্রয়োজন হয় কি কারণে? হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী ও পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করা আল্লাহ পাকের পক্ষে অসম্ভবও নয়, কঠিনও নয়, কিন্তু মানব জাতিকে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় পরিচালনার জন্যে পর্যায়ক্রমে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যেই ছয় দিন সময় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ চিন্তা চর্চা করা এবং ধীরে ধীরে কাজ করা আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে, আর তড়িঘড়ি করা শয়তানের তরফ থেকে।

এর তাৎপর্য হল তড়িঘড়ি করে কোন কাজ করলে সে কাজের ভাল-মন্দ চিন্তা করার সময় হয় না, ফলে কাজ বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে অনুতপ্ত হতে হয়, আর যে কাজ চিন্তা-চর্চার মাধ্যমে ধীর গতিতে করা হয় তাতে বরকত হয়। তফসীরকারগণ বলেছেন, আসমান জমিন একই সঙ্গে তৈরী করা হয়নি; বরং সর্বপ্রথম তার ধাতু তৈরী হয়েছে, এরপর তা বিভিন্ন আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অবশেষে বর্তমান রূপলাভ করেছে। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির এ ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষি, বৃক্ষ-তরুলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করেন। তখন তা পর্যায়েক্রমে তৈরী করেন। কিন্তু যদি তিনি একেবারে একই সময়ে কোন কিছু তৈরী করতে ইচ্ছা করেন তখন তা একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়, এটি শুধু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জির ব্যাপার।

আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বে রাত দিন কিভাবে পরিচিত হয়েছে

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়, সূর্যের পরিক্রমার মাধ্যমেই দিন এবং রাত অস্তিত্ব লাভ করে, আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র সূর্য কিছুই ছিল না তখন ছয়দিনের গণনা কিভাবে হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে কোন কোন তফসীরকারগণ বলেছেনঃ দুনিয়াতে ছয় দিনে যে সময় অতিবাহিত হয় এত সময় আসমান জমিন সৃষ্টিতে ব্যয় হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন যে, যেভাবে সূর্যোদয় ও অস্ত গমনের সময়কে পৃথিবীতে দিন বলা হয় ঠিক এভাবেই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে হয়তো আল্লাহ পাক দিন ও রাত নির্ধারণের অন্য কোন চিহ্ন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

যেমন, জান্নাতে দিন ও রাত সূর্য পরিক্রমার মাধ্যমে নির্দৃষ্ট হবেনা, এতে একথা জানা যায় যে, ছয়দিনে আল্লাহ্ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তা দুনিয়ার ছয়দিন নয়; বরং তার চেয়ে বেশীও হতে পারে।

যেমন, আখেরাতের দিন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই এরশাদ হয়েছে যে, সেখানে একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।

ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে ছয়দিনের যে কথা রয়েছে তার অর্থ হল আখেরাতের ছয়দিন। যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসেরও (রাঃ) এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক আসমান এবং জমিন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ রোববার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত, জুমআর দিন সৃষ্টির কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে আর সেদিনই হযরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করেছেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ ছয়দিন সম্পর্কে উভয় অভিমতই ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ এ ছয়দিন দুনিয়ার হিসেবেও হতে পারে, আখেরাতের হিসেবেও হতে পারে।[২]

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

অর্থাৎ "আসমান জমিন সৃষ্টির পর আল্লাহ পাক আরশে সমাসীন হন"। আরশ হল সিংহাসন আর "ইসতাওয়া" অর্থ হল সমাসীন হওয়া তথা অধিষ্ঠান করা, এর সত্যিকার তাৎপর্য কি তা বুঝবার ক্ষমতা মানুষের নেই। সংক্ষেপে একথার উপর বিশ্বাস করা প্রয়োজনীয় যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ পাক যা বুঝিয়েছেন তা হক্ব বা সত্য, নিজের তরফ থেকে এর কোন অর্থ বা তাৎপর্য বর্ণনা করা অনুচিত। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি এ বাক্যটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, এরপর বললেন "ইসতাওয়া" শব্দের অর্থ জানি কিন্তু এর সত্যিকার রূপ, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য কি, তা মানুষের বিবেক বুদ্ধির উর্দ্ধে, এর উপর ঈমান আনয়ন মানুষের কর্তব্য। তবে এর আকৃতি প্রকৃতি বা রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বেদআত।

কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসব প্রশ্ন করেননি। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ), ইমাম আওজায়ী (রহঃ), লাইস এবনে সাদ (রহঃ), সুফিয়ান এবনে উয়াইনা (রহঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রহঃ) প্রমুখ তত্ত্ববিদগণ বলেছেন, যে সমস্ত আয়াত আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বা এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কোন প্রকার ব্যাখ্যা ব্যতীতই ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য।[৩]

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, মানুষের কার্যক্রম বা গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, আল্লাহ্ পাকের কার্যাবলী ও গুণাবলীর বিবরণ দানেও সাধারণতঃ সে ভাষাই পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন পৃষ্ঠা-১৮১৮-১৯
২। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৪
৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৫

তার একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। حي অর্থ জীবিত। এ শব্দটি যেমন মানব জাতির ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের শানেও এ শব্দই ব্যবহৃত হয়। سمع অর্থ শ্রবণ করা, এ শব্দটিও অনুরূপভাবে মানুষের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের ব্যাপারেও এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু শব্দ এক হলে কি হবে, উভয়ের অর্থে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সৃষ্টির দেখা আর স্রষ্টার দেখা এক নয় এবং এক হতেও পারে না।

যখন কোন মানুষ সম্পর্কে আমরা বলি সে শ্রবণ করে, তখন একথা উপলব্ধি করি যে তার নিকট শ্রবণের উপকরণ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে যখন এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় যে, سميع তিনি সর্বশ্রোতা, এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর নিকট শ্রবণের উপকরণ রয়েছে, কেননা ليس كمثله شيء কোন কিছুই তাঁর ন্যায় নয়, তাঁর মহান সত্ত্বা সর্বপ্রকার সাদৃশ্যের উর্দ্ধে। মানব বিবেক তাঁর দৃষ্টান্ত সম্পর্কে কোন কল্পনাও করতে পারে না, তিনি কল্পনাতীত। শুধুমাত্র এতটুকু বিশ্বাস রাখা আমাদের কর্তব্য যে, তিনি সর্ব গুণে গুণান্বিত, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। কিন্তু কিভাবে দেখেন বা কিভাবে শোনেন এ সম্পর্কে মানুষ কোন ধারণা করতে পারে না। "আল্লাহ পাক আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন"-এর তাৎপর্য আমরা শুধু এতটুকুই বুঝতে পারি যে তিনি অপ্রতিহত, একচ্ছত্র আধিপত্য এবং অদ্বিতীয় পরাক্রম সহ আরশ তথা সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেছেন।

তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর ক্ষমতার বাইরে কেউ যেতে পারে না, তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর, তাঁর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং অটুট। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর আধিপত্য-ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সার্বভৌম। নিখিল বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। আর এ ক্ষমতা চির বিদ্যমান, যা বর্ণনাতীত এবং কল্পনাতীত। তাই তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠানের স্বরূপ কি অথবা এর উপকরণ কি, মানুষের পক্ষে সে সম্পর্কে ধারণা করাও সম্ভব নয়। মানুষের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। তাই এক্ষেত্রে গবেষণা করারও কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আরশের আভিধানিক অর্থ সিংহাসন, আর আরশ আল্লাহ পাকের এক মহান সৃষ্টি, আল্লাহ পাকের কুদরতের এক বিস্ময়কর নমুনা। আরশ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।[২]

يُغْشِى الَّيْلَ.

অর্থাৎ-রাতের অন্ধকার দিনের আলোকে অথবা দিনের আলো রাতের অন্ধকারকে ঢেকে রাখে, এভাবেই রাত ও দিন পরস্পরকে ধাওয়া করতে থাকে। এর তাৎপর্য হল রাত শেষ হওয়ার পূর্বেই দিন চলে আসে আর দিন বিদায় হওয়ার পূর্বেই রাতের আগমন ঘটে। রাত এবং দিনের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে ফাঁক থাকেনা। ঠিক এভাবেই অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার এবং শেরক ও কুফরের ঘন অন্ধকারে যখন সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন রূহানী জগতের সূর্যের আলোক আভা বিশ্ববাসীকে আলোকিত করতে আসে। আর যে

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২০৩
২। এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩০-৩২

পর্যন্ত নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য উদিত না হবে সে পর্যন্ত চন্দ্র তারকারাজী রাতের আঁধারে আলো পরিবেশন করে থাকে। কী সূর্য! কী চন্দ্র! কী নক্ষত্রপুঞ্জ! সবই এক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর নিয়ম-কানুনের বরখেলাফ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ.

মনে রেখ, সৃষ্টি করা এবং আদেশ দেয়া একমাত্র আল্লাহ পাকেরই কাজ। তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই আদেশ দাতা, তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই, তিনি মহিমান্বিত, বরকত সমৃদ্ধ, তিনি যেভাবে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা আদেশ করেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনা।

সুফীগণের মতে আরশ, সমস্ত আসমান জমিন এবং আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে এবং জমিনের উপরিভাগে যা কিছু রয়েছে এবং জমীনের অভ্যন্তরে যত খনিজ দ্রব্য রয়েছে সবই الخلق এর অন্তর্ভুক্ত আর الامر দ্বারা উদ্দেশ্য হল রূহ তথা আত্মা। আল্লাহ পাক এই সবকে এক শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে এগুলোকে আলমে আরওয়াহ বলা হয়। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, সুফিয়ান এবনে উয়াইনা বলেছেন যে, الخلق এবং الامر এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, দু'টিকে এক বলা সঠিক নয়। সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টির পরে তাকে আদেশ প্রদান করা আল্লাহ পাকেরই কাজ, আর কারো নয়।

تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

বরকতময় আল্লাহ পাক, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক। মাহাত্ম এবং শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আল্লাহ পাকের জন্যেই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির অর্থ বলেছেন, আল্লাহ পাকই সব কিছুতে বরকত এনে দিয়েছেন। আর হাসান বসরী বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই আসে বরকত। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের জিকরের মাধ্যমেই বরকত অর্জিত হয়। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে تَبٰرَكَ শব্দটির অর্থ হল বরকত। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাক চির বিদ্যমান। সর্বদা আছেন, সর্বদা থাকবেন।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً.

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের মাহাত্ম, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যখন আল্লাহ পাক সব কিছুর অধিকর্তা, তিনিই নেয়ামতদাতা তখন বিপদাপদে তোমরা তাঁকেই ডাক। নিজের প্রয়োজনের আয়োজনের জন্যে তাঁর নিকট আরজী পেশ কর। এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর মহান দরবারে মুনাজাত করার আদেশ দিয়েছেন, তবে তার সঙ্গে দু'টি শর্ত রয়েছেঃ

১. মুনাজাতকারীকে অবশ্যই অত্যন্ত বিনীতভাবে কাকুতি-মিনতি পেশ করতে হবে।

২. চুপি চুপি তথা অনুচ্চস্বরে দোয়া করতে হবে। মনকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট নিজের আরজী পেশ করা শুধু মূর্খতাই নয়, বরং বঞ্চিত হওয়ার কারণও হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ.

অর্থাৎ ডাক তোমাদের প্রতিপালককে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের প্রয়োজনে তোমরা শুধু তাঁরই মহান দরবারে বিনীতভাবে আরজী পেশ কর। আর দোয়া হতে হবে অতি সংগোপনে। এ দু'টি আদব রক্ষা করার মাধ্যমে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, চুপি চুপি দোয়া করা আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় এবং পছন্দনীয় এবং আল্লাহর ওলীদের এটিই আদর্শ। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, উচ্চস্বরের স্থলে নিম্নস্বরে দোয়া করার মধ্যে ৭০টি মর্তবার পার্থক্য রয়েছে। আমাদের সলফে সালেহীনের অভ্যাস ছিল, তাঁরা আল্লাহর মহান দরবারে অধিকাংশ সময় দোয়ায় মশগুল থাকতেন এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর কেউ শ্রবণ করত না। কেননা তাঁদের দোয়া হত তাঁদের মধ্যে এবং তাঁদের প্রতিপালকের মধ্যে। এমনকি কোন কোন বুযুর্গ পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করতেন কিন্তু অন্যরা তার খবর পেত না এবং অনেকে সারা রাত নামাযে দন্ডায়মান অবস্থায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্যরা সে সম্পর্কে অবগত হতো না।

জিকর তিন প্রকার

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, জিকর তিন প্রকার-

১. উচ্চস্বরে চিৎকার করে জিকর করা, বিশেষ সময় ব্যতীত এ পন্থা ওলামায়ে কেরাম মকরূহ বলেছেন, তবে যেমন আযান দেয়া অথবা হজ্জের লাব্বাইক পাঠ করা এসব ক্ষেত্রে মকরূহ নয়। চিশতিয়া তরীকার বুজুর্গগণ সালেকের প্রথম পর্যায়ে উচ্চস্বরে জিকর বা জিকরে জেহরীর অনুমতি দান করেন। এর উদ্দেশ্য হল শয়তানকে পলায়নে বাধ্য করা, গাফলত দূর করা, মনে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি করা প্রভৃতি। কিন্তু এর দ্বারা যেন রিয়াকারী না হয় তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য যেন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য।

২. চুপে চুপে রসনা দ্বারা জিকর করা। তিরমিযী এবং এবনে মাজাহ শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বদা যেন আল্লাহর জিকরে তোমার রসনা সিক্ত থাকে। ইমাম আহমদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হয় সবচেয়ে উত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হল এই যে, পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় যেন তোমার রসনা আল্লাহর জিকরে সিক্ত থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের কিছু ফেরেশতা আছেন যাদের কাজ হল আল্লাহর জিকরে মশগুল লোকদের অনুসন্ধান করা। যখন তারা কোন লোককে আল্লাহর জিকরে মশগুল পান তখন একে অন্যকে ডাক দিয়ে বলেন এখানে আস! তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ জিকরের মজলিসে জমিন থেকে দুনিয়ার

নিকটবর্তী আসমান পর্যন্ত দন্ডায়মান হন। আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, তবুও ঐ ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার বন্দারা কি বলছিল? ফেরেশতাগণ জবাব দেন, তারা তোমার পবিত্রতা এবং তোমার হাম্‌দ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিল (অর্থাৎ সোবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার পাঠ করছিল) তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন; আমার বন্দারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতাগণ বললেনঃ না। তখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেনঃ যদি তারা আমাকে দেখতো তবে কি অবস্থা হতো? ফেরেশতাগণ আরজ করেনঃ যদি তারা তোমাকে দেখতো তবে আরো বেশী এবাদত করতো এবং তোমার মাহাত্ম বর্ণনা করতো।

আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি চায়? ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, তারা জান্নাতের জন্য আবেদন করছিলো। আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, না। তখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন, যদি তারা জান্নাত দেখত তবে তাদের কি অবস্থা হতো? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, যদি তারা জান্নাত দেখত তবে তাদের জান্নাতের আগ্রহ এবং আকাঙ্খা আরো বেশী হতো। আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন, তারা কোন্ বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়? ফেরেশতাগণ জবাব দেন, দোযখ থেকে। আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি দোযখ দেখেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, হে পরওয়ারদেগার! তারা দোযখ দেখেনি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, যদি তারা দোযখ দেখত, তবে তাদের কি অবস্থা হতো? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তাহলে তারা দোযখকে আরো ভয় পেত এবং আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হতো। তখন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের সকলকে মাফ করে দিয়েছি। ফেরেশতাদের মধ্যে একজন আরজ করেন, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যে জিকরের উদ্দেশ্যে মজলিশে আসেনি অন্য কাজে এসে জিকরের মজলিসে বসেছিল, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, জিকরে মশগুল লোকদের সঙ্গে যে উপবিষ্ট হয় সে মাহরূম হবে না।[১]

(বোখারী, মুসলিম)

জিকিরে খফীর ফজিলত

আর তৃতীয় প্রকার জিকর হলো শুধু মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করা, এখানে রসনা কাজ করে না, তবে কলব তথা মানব অন্তর আল্লাহ্ পাকের জিকরে সম্পূর্ণ মশগুল থাকে। এ জিকরকে জিকরে খফী বা গোপন জিকর বলা হয়। মানুষের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারাও তা শ্রবণ করতে পারে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সেই গোপন জিকর যা আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারাও শ্রবণ করেনা তার মর্তবা জিকরে জলী বা প্রকাশ্য জিকর থেকে ৭০ হাজার গুণ অধিকতর। যখন কেয়ামতের দিন আসবে তখন আল্লাহ্ পাক হিসাবের জন্যে সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাগণ মানুষের আমলনামা নিয়ে হাযির হবে। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন দেখ, এই বন্দার কোন আমল অবশিষ্ট রয়নি

১। জিকর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআনের ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫-৪২

তো? তখন ফেরেশতাগণ আরজ করবেনঃ যা কিছু আমরা শ্রবণ করেছি এবং দেখেছি সবই লিপিবদ্ধ করেছি, কোন কথা বাদ দেইনি, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ এর এমন একটি নেকী আছে যা তোমরা জাননা, আমি তোমাদেরকে বলছি তা হলো জিকরে খফী বা গোপন জিকর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ জিকর কোন সময়ই বন্ধ হয় না, এতে কোন সময় গাফলতও আসেনা অর্থাৎ সর্বদা এ জিকর জারী থাকে।

সীমালঙ্ঘন না করার তাগিদ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সীমালঙ্ঘন অত্যন্ত অপ্রিয় কাজ। যারা দোয়া বা মুনাজাতে সীমালঙ্ঘন করে তথা দরবারের আদব রক্ষা করেনা, অযথা অবান্তর এবং অনর্থক কাজের জন্যে দোয়া করে এতে সীমালঙ্ঘন করা হয়, এটি আল্লাহ পাকের মহান দরবারের মান মর্যাদা বিরুদ্ধ কাজ। যারা এমন কাজ করে তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে সীমালঙ্ঘনকারী বলা হয়েছে। যেমন এমন কাজের জন্যে দোয়া করা যা কোনভাবেই সম্ভব নয় যেমন কেউ যদি দোয়া করে তাকে নবীর মর্যাদা প্রদানের জন্যে, অথবা তাকে আসমানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিংবা মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে পৌঁছাবার জন্যে, এ সমস্ত অবান্তর দোয়া আল্লাহ পাকের নিকট অপ্রিয়, অপছন্দনীয়। এ পর্যায়ে আল্লামা বগভী (রঃ) আবু নেয়ামার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মগফল (রাঃ) তাঁর পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে শ্রবণ করেনঃ হে আল্লাহ! আমি দোয়া করি আমি যখন জান্নাতে যাব আমাকে জান্নাতের ডান দিকের সাদা ইমারত দান করেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ পাকের দরবারে জান্নাতের জন্যে দোয়া কর এবং দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মিনতি জানাও। আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি ভবিষ্যতে এই উম্মতের কিছু লোক পবিত্রতা অর্জনে এবং দোয়ার ব্যাপারে (সুন্নতের) সীমালঙ্ঘন করবে। (এবনে মাজা, এবনে হাব্বান)

আবু ইয়ালা হযরত সাদ (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অদূর ভবিষ্যতে কিছু লোক এমন হবে যারা দোয়ার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে, মানুষের জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের আরজী পেশ করি আর যে কথা ও কাজ জান্নাতের নিকট পৌঁছায় তার তৌফিক চাই। আর দোযখ থেকে এবং এমন কথা ও কাজ থেকে যা দোযখে নিয়ে যায় তা থেকেও পানাহ চাই।

আতীয়্যা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে الْمُعْتَدِينَ শব্দ দ্বারা সে সব লোকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের জন্যে বদদোয়া করে। যেমন যদি কেউ একথা বলে হে আল্লাহ, অমুকের প্রতি লা'নত দিও। এমন বদদোয়া সাধারণত রাফেজীদেরকে করতে দেখা যায়। তারা সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বায়ত সম্পর্কে এমন কথা বলে।

এবনে জোরায়েয (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে সীমালঙ্ঘন করার তাৎপর্য হলো চিৎকার করে দোয়া করা অথচ এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমরা নিজেদের জন্যে নম্রতার পথ অবলম্বন কর। যিনি শ্রবণ করেন না এমন সত্ত্বাকে তোমরা ডাক না, আর যিনি অনুপস্থিত তাকেও তোমরা ডাক না। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখছেন, আলোচ্য আয়াতে যে সীমালঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করা। এর দ্বারা উল্লিখিত সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এমন দোয়া করা যে দোয়ায় গুনাহের কথা থাকে বা পরস্পরের সম্পর্ক ছেদের বিষয় থাকে, এসবই এর অন্ত র্ভুক্ত। আর এমন কথা বলা যে, আমি দোয়া করেছি কিন্তু আমার দোয়া কবুল হয়নি। অথবা এমন কথা বলা যে, "আমি দোয়া করেছি, আমার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে"। অথবা আল্লাহ পাকের দরবারে এমন নাম নিয়ে দোয়া করা যা শরীয়ত বিরোধী যেমন ভগবান, ইশ্বর, এসবই সীমালঙ্ঘন করার অন্তর্ভুক্ত। যারা সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না।[১]

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا.

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাককে কিভাবে ডাকতে হবে তার শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনের তাগিদ করে এ পর্যায়ে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টি হওয়ার পর উৎপাত এবং অশান্তি সৃষ্টি করোনা। অর্থাৎ আল্লাহ পাক পয়গম্বর প্রেরণের মাধ্যমে মানব জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার হেদায়েত করেছেন। আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন। দোয়ার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করার তাগিদ করেছেন। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করার পথ নির্দেশ করেছেন। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

তোমরা পাপাচার ও বিদ্রোহ করে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির ব্যাপারে নিঃশঙ্ক থেকোনা।

আতীয়্যা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করোনা। অন্যথায় আল্লাহ পাক বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন, তোমাদের পাপাচারের কারণে ফসলাদি ধ্বংস করে দেবেন। এভাবে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হবে।

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

এবং তোমরা আল্লাহকে ডাক, সভয়ে এবং আশান্বিত মনে, নিশ্চয় আল্লাহর রহমত মোমেনদের অতি নিকটবর্তী। আলোচ্য আয়াতে আশাকে ভয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং দোয়া কবুল হওয়ার উপকরণ হল নেক আমল, এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক অতীব দয়াবান, তিনি করুণাময়, তিনি সাধারণত কারো দোয়া ফেরত দেন না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৯-২০

কিন্তু মানুষের পাপাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই কোন কোন সময় দোয়া কবুল হয় না। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত

তিনি একবার দৃষ্টান্ত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে, ক্লান্ত অবস্থায় সে আসমানের দিকে হাত তুলে দোয়া করে, হে আমার প্রতিপালক! বলে ডাকে কিন্তু অবস্থা এই যে, তার পানাহার হারাম সম্পদ থেকে হয়, তার পোশাকও হারাম সম্পদ থেকে হয় এমনকি তার লালন-পালনও হারাম সম্পদ থেকে হয়, এমন ব্যক্তির দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে! (মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বন্দার দোয়া সর্বদাই কবুল হয় যদি সে কোন পাপ কার্যের জন্যে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্যে দোয়া না করে আর সে দোয়ার জন্যে তাড়াহুড়া না করে, জিজ্ঞাসা করা হল, তাড়াহুড়া করার তাৎপর্য কি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) সে যদি বলে আমার মনে হয় দোয়া কবুল হবে না আর এ ধারণার বশীভূত হয়ে সে দোয়া ছেড়ে দেয়। এ অবস্থা হল দোয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালম্মাম এরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করার সময় এই একীন রাখ যে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের দোয়া কবুল করবেন, আল্লাহ পাক সেই বন্দার দোয়া কবুল করেন না যার মন গাফেল থাকে।

অতএব, দোয়ার সময় দোয়ার প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে হয়। সভয়ে, বিনীতভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি-মিনতি পেশ করতে হয় এবং এই বিশ্বাস রাখতে হয় যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই দোয়া কবুল করবেন। এতদ্ব্যতীত দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে হালাল রিয্ক পূর্বশর্ত। পানাহার হারাম হলে, পোশাক হারাম হলে আর দোয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে দোয়া কবুল হয় না।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ.

(তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি প্রেরণ করেন সুখবর বহনকারী সমীরণ বৃষ্টির পূর্বে।)

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আকাশ মন্ডলীতে আল্লাহ পাকের যে ক্ষমতা, অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব রয়েছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে পৃথিবীর সামুদ্রিক ভাগে এবং স্থলে, অন্তরীক্ষে তথা নিখিল বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ পাকের সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বায়ু মন্ডলকে পরিচালনা করেন বৃষ্টিপাতের পূর্বে এবং এরপর মেঘমালাকে পরিভ্রমণ করান। এরপর আল্লাহ পাকের হুকুমে বৃষ্টি হয়, তারই ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে রকমারী তরি-তরকারী, ফল-ফলারী সৃজিত হয়। এসব কিছুইতো পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন, একথা বুদ্ধিমান মাত্রই উপলব্ধি করে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, তিনি এরশাদ

করেছেনঃ বাতাস হল আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত শান্তি। এই বাতাস রহমতকেও নিয়ে আসে, আযাবকেও আনে এজন্যে বাতাসকে মন্দ বলোনা এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট বাতাসের কল্যাণ কামনা কর এবং তার অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্ কাছে পানাহ্ চাও। (বোখারী)

حَتّٰى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ.

অর্থাৎ যখন বাতাস মেঘমালাকে বহন করে তখন আমি তাদেরকে কোন মৃত শুষ্ক জমিনের দিকে প্রেরণ করি। এরপর বৃষ্টিপাত করি এবং ঐ পানি দ্বারা জমিনে রকমারী ফল-ফলারী উৎপাদন করি। যেভাবে বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত শুষ্ক জমিন পুনরুজ্জীবন লাভ করে, আল্লাহ্ পাক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত জমিনে জীবন শ্যামলিমা সঞ্চার করেন, ঠিক তেমনি মানব জাতির মৃত্যুর পরও তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত এবং পুনরুত্থিত করবেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থাৎ যেভাবে মৃত এবং শুষ্ক জমিনকে আমি বারিপাতের মাধ্যমে সঞ্জীবিত করি, ঠিক তেমনি মৃতদেরকেও জীবিত করাবো, হয়ত তোমরা সত্য উপলব্ধি করবে এবং নসিহত হাসিল করবে।

نُخْرِجُ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ মৃতদেরকে কবর থেকে বের করবো। আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন সর্বপ্রথম শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সমস্ত মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। আল্লাহ্ পাক আরশের নিম্নদেশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন, যার নাম হবে আবে হায়াত। এ বৃষ্টির ফলে যেভাবে জমিনে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় কবরের মধ্যে মানুষের অবস্থাও তাই হবে। যখন মানুষের দেহ পরিপূর্ণ হবে তখন সেই দেহগুলোর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হবে। এরপর মানুষ নিদ্রিত হবে। যখন তারা কবর থেকে বের হবে তখন তাদের মাথা এবং চোখে নিদ্রার ভাব থাকবে এবং তারা আক্ষেপ করে বলবে, কে আমাদের ঘুম ভাঙাল!

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ দু'বার যে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তন্মধ্যে চল্লিশের সময় অতিবাহিত হবে। এরপর লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, চল্লিশ দিনের সময় হবে? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ঃ আমি তা স্বীকার করিনা। তখন লোকেরা বললো, তাহলে ৪০ বছরের পার্থক্য হবে? তিনি বলেন, আমি তাও বলি না (কেননা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চল্লিশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন বছর, মাস, দিন নির্ণয় করেননি)। এরপর আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে বারি বর্ষণ করবেন, ফলে উদ্ভিদ যেভাবে উৎপন্ন হয় সেভাবে মানুষ পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। মানুষের সবই শেষ হয়ে যায়, শুধু একটা হাড় থেকে যায় যার সাথে কেয়ামতের দিন তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জড়িত করা হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মৃত্যু দু' প্রকার। এক প্রকার মৃত ব্যক্তিরা কেয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবন লাভ করে পুনরুত্থান করবে। আর দ্বিতীয় প্রকার হল অজ্ঞতার মৃত্যু। তাদের অজ্ঞতা মূর্খতা দূরীভূত করে নবজীবন দান করার লক্ষ্যে জ্ঞানের আলো এবং হেদায়েতের সঞ্জিবনী শক্তি নিয়ে আগমন করেছেন যুগে যুগে নবী রসূলগণ।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ
لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾
قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ
يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৫৮) আর উৎকৃষ্ট ভূমির তরুলতা জন্মায় তার প্রতিপালকের আদেশক্রমে এবং নিকৃষ্ট জমিতে নিকৃষ্ট উৎপাদনই হয়, এভাবেই আমি কৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে বিভিন্নভাবে নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করে থাকি।

(৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছি। তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মহা দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি।

(৬০) তার জাতির প্রধানরা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

(৬১) তিনি বলেন, হে আমার জাতি! আমি আদৌ বিভ্রান্ত নই, আমিতো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি।

(৬২) আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। আর আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জাননা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বর্ণনা রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা সর্বত্র বর্ষিত হয়। কিন্তু বৃষ্টি বর্ষণ এক হলেও জমির মধ্যে তারতম্য এবং পার্থক্য থাকায় ফল উৎপাদনেও পার্থক্য দেখা দেয়। উত্তম জমিনে উত্তম চাষ হয়। আর নিকৃষ্ট জমিতে কিছুই হয় না। বারি বর্ষণের ব্যাপারে কার্পণ্য নেই। কিন্তু জমির যোগ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে তারতম্য ও পার্থক্য দেখা দেয়।

আল্লাহ পাক পরম করুণাময়, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক, তাঁর দয়া মায়ার কোন সীমা নেই, পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ পাক মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মানব জাতিকে মূর্খতা, অজ্ঞানতা এবং পথভ্রষ্টতার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখবেন, একথা কল্পনাও করা যায় না। এজন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ পাক যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব সমূহ, অবশেষে আবির্ভাব হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবং নাযিল হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেক লোক হেদায়েত লাভ করলো না, বঞ্চিত হল সরল সঠিক পথ থেকে, এর কারণ কি?

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা এ প্রশ্নেরই জবাব দেয়া হয়েছে। যেভাবে উত্তম জমিতে বারি বর্ষণের ফলে ফল ফলারী উৎপন্ন হয় আর নোনা মাটিতে বারি বর্ষণ হলেও কাঁটাবন ব্যতীত আর কিছুই গজায় না। ঠিক এমনিভাবে যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কদর করে, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তাদের জন্মগত গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের কারণেই হেদায়েত লাভের সুযোগ পায় এবং তাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় ও মহব্বত নেই, যারা বাস্তববাদী পরিণামদর্শী নয়, তারা নবীর আগমনের কারণে উপকৃত হয় না এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত হেদায়েত কবুল করেনা। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যে হেদায়েত এবং এলম দান করে আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হল অনেক বৃষ্টির ন্যায়। সেই বৃষ্টি যদি উত্তম জমির উপর বর্ষিত হয় তবে এই জমি বৃষ্টিকে কবুল করে ফেলে, সেই জমিতে সজীবতা আসে এবং অনেক ফল-ফলারী উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ বৃষ্টি যদি কোন নোনা জমির উপর বর্ষিত হয় তবে জমি তাকে রেখে দেয়, পান করতে পারে না এবং সেজন্যে ঐ জমি সজীব হয় না। জীব-জন্তুকে সে পানি পান করানো হয়। আর তৃতীয় একটি স্থান এমন রয়েছে যা ময়দানে রূপান্তরিত হয়, বর্ষিত পানিকে সে রেখে দিতে পারে না, যেন অন্যরা তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আর নিজেও পান করতে পারে না যে তার দ্বারা ঐ জমিতে ফল ফলারী উৎপন্ন হবে। আর এটিই দৃষ্টান্ত হল সে সব লোকদের, যারা কিছু দ্বীনি উপলব্ধি রাখে এবং আমার প্রদত্ত হেদায়েত দ্বারা উপকৃত হয়, নিজেও শেখে অন্যকেও শেখায়। পক্ষান্তরে

এতে সে সব লোকের দৃষ্টান্তও রয়েছে, যারা আমার আহ্বানের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনা এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত হেদায়েতও কবুল করেনা।[১]

বস্তুতঃ আসমানী হেদায়েত এসেছে, আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন এবং আসমানী গ্রন্থের অবতরণের মাধ্যমে যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্যেই এসেছে। কিন্তু যেভাবে বৃষ্টির মাধ্যমে সব জমি উপকৃত হয় না, বরং উত্তম জমিতে উত্তম ফসল উৎপাদিত হয় এবং নিকৃষ্ট জমিতে শুধু কাঁটাবন হতে দেখা যায়, ঠিক তেমনি যারা জন্মগত ভাবে নেক, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও মহব্বত থাকে তারা রূহানী বারিপাত দ্বারা উপকৃত হয়, সরল পথের সন্ধান পায়, তাদের জীবন সাফল্যমন্ডিত হয়। পক্ষান্তরে যারা কঠিন অন্তর বিশিষ্ট লোক হয় তারা রূহানী বারিপাতের মাধ্যমে হেদায়েত লাভ করে না। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ.

"এভাবেই আমি তাদের জন্যে আয়াত সমূহকে বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করে থাকি, যারা শোকর গুজার হয় তথা যারা আল্লাহ পাকের মহান বাণীর কদর করে, যারা এই বাণীকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তাদের জন্যেই আয়াত সমূহ উপকারী হয়"।

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনকে উৎকৃষ্ট জমি দ্বারা এবং কাফেরকে নিকৃষ্ট জমি দ্বারা বুঝিয়েছেন এবং পবিত্র কোরআনের নাযিল হওয়াকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বৃষ্টিপাতের দ্বারা। উত্তম জমিতে বৃষ্টিপাত হলে যেমন ফল ফুল উৎপাদিত হয়, ঠিক তেমনি পবিত্র ও উত্তম রূহ যখন পবিত্র কোরআনের আলোকে আলোকিত হয় তখন সে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করে এবং তার মধ্যে চরিত্র মাধুর্যের উত্তম নমুনা লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, নিকৃষ্ট আত্মার এ অবস্থা নয়। যখন কোরআনের আলো তার নিকট পৌঁছে সে তা গ্রহণ করে না, তার মধ্যে মা'রেফাতে এলাহীর কোন গুণ সৃষ্টি হয় না।[২]

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ.

"নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছি"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ করা হয়েছে। এরপর সৃষ্টির প্রথম দিন আলমে আরওয়াহে সমগ্র মানব জাতি থেকে আল্লাহ পাক যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ আয়াত থেকে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিবরণ শুরু হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-এর পরই হযরত নূহ (আঃ) সর্বপ্রথম নবী। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে শেরক ও কুফরের ঘন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৪
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১১৪

অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মোতাবেক হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততিগণ কয়েক যুগ পর্যন্ত তৌহিদের উপর কায়েম ছিল, কিন্তু এরপর তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা শুরু হয়, তারা মূর্তিপূজা শুরু করে, পৌত্তলিকতা ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পরে, তখন আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত নূহকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তিনি মানুষকে তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করার আহ্বান জানান, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তা'লিম দেন। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর ব্যাপারে পথ-নির্দেশনা দিতে থাকেন। কিন্তু তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র কয়েকজন লোক ব্যতীত কেউ হেদায়েত গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি এবং আত্মসংশোধনে প্রস্তুত হয়নি, শুধু তাই নয়; বরং তাঁকে তারা মন্দ বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। এ সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত হেদায়েতের চেষ্টার পর তিনি যখন তাদের হেদায়েত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের সম্পর্কে বদদোয়া করে বললেনঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا.

(হে পরওয়ারদেগার! একটি কাফেরকেও ধরার বুকে রেখোনা) আল্লাহ পাকের দরবারে হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়া কবুল হয় এবং প্রলয়ংকরী বন্যা এসে তাদেরকে চিরতরে শেষ করে দেয়। পবিত্র কোরআনের সূরা নূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছেঃ

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কার পৌত্তলিকরা যে অন্যায় আচরণ করছিল তা যে নতুন কিছু নয়; বরং যুগে যুগে অন্যান্য নবীগণের সঙ্গেও আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমানরা এমন অন্যায় আচরণ করেছে। এতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে।

২. আম্বিয়ায়ে কেরামের দুশমনদের পরিণাম সর্বদাই শোচনীয় হয়েছে, দুনিয়াতে তারা অপমানিত হয়েছে এবং আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

৩. এ আয়াত সমূহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিলও বটে। কেননা, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন অথচ পূর্বকালের নবী রসূলগণের ঘটনাবলী তিনি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তা একথারই দলিল যে তিনি সত্য নবী, তাঁর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়। যদি তিনি সত্য নবী না হতেন, তবে তিনি হাজার হাজার বছর পূর্বের ঘটনাবলী সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না।

৪. এ আয়াত সমূহ দ্বারা একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, যেভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৌহীদ বা একত্ববাদ, রেসালত এবং কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনয়নের শিক্ষা দিয়েছিলেন ঠিক এভাবে পূর্বকালের নবী রসূলগণও তাঁদের নিজ নিজ

উম্মতকে এ শিক্ষাই দিতেন। যারা এ শিক্ষা গ্রহণ করেনি তারা তার ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করেছে।

৫. পূর্ববর্তী আয়াতে বনী আদমকে খেতাব করে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمُ الاٰيَةَ

এ আয়াতের ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহ পাক নবীগণের ঘটনাবলী এরশাদ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত নূহ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়্যত লাভ করেন। সাড়ে ৯০০শ' বছর আল্লাহর দ্বীনের তবলীগ করতে থাকেন। যখন বন্যা রূপে গযব আসে তখন হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো এবং তাঁর বানানো তরীতে যারা আরোহণ করেছিলো শুধু তারাই বেঁচে গিয়েছিল আর সকল কাফেরের সলিল সমাধি হয়েছিল। নূহ (আঃ)-এর যুগের এ বন্যার পর হযরত নূহ (আঃ) ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[১]

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির নিকট পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করি।

হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশ পরিচয়

নূহ এবনে লামেক অথবা লমক, এবনে মোতামাওলেখ, অথবা মোতাওয়াশ্যেখ এবনে খানুখ অথবা আখনুখ,

তাঁর মাতার নাম হলো আওফাহ অথবা ফিনুস বিনতে বরালিক এবনে কাতশোলেখ।

আখনুখের ইসলামী নামই হযরত ইদ্রিস ছিল। তিনিই প্রথম নবী ছিলেন যিনি কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করার পন্থা আবিষ্কার করেন। আখনুখ এবনে মাহলীল অথবা মাহালায়েল, আর মাহালিলের পিতা ছিল কিনন। আর কিনন এর পিতা ছিল নুষ অথবা মানেষ, আর মানেষের পিতা ছিলেন হযরত শীষ (আঃ) এবনে হযরত আদম (আঃ)। মোসতাদরাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, নূহ (আঃ) থেকে আদম (আঃ) পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় দশজনের তফাত রয়েছে। তেবরানী হযরত আবু যর (রাঃ)-এর সূত্রে একথা লিখেছেন।

নামকরণ

আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম ছিল "সকন" বা শাকের অথবা "ইয়াশকর"।

হযরত আদম (আঃ)-এর পর হযরত নূহ (আঃ) মানব জাতির উপর বিরাট এবং বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনিই ছিলেন সকলের আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্র। এজন্যে তাঁর নাম হয়েছে "সকন"।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) "এতকানে" মোসতাদরাকের সূত্রে লিখেছেনঃ নূহ (আঃ)-এর নাম ছিল আবদুল গাফ্ফার। যেহেতু তিনি তাঁর জাতির জন্যে অনেক ক্রন্দন করেছেন, তাই

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৪৬
তফসীরে কুরতবী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪, ৬৫

নূহ খেতাবে ভূষিত হন। অথবা কেয়ামতের দিনের ভয়ে তিনি সর্বদা ক্রন্দনরত থাকতেন, এজন্যে নূহ বলা হয়।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত নূহ (আঃ) একটি কুৎসিত কুকুর দেখে বলেছিলেন, "জানাম আকলিমা", কুকুরটি অত্যন্ত মন্দ। আল্লাহ পাক কুকুরটিকে বাকশক্তি দান করলেন, কুকুরটি বলল, আমার এ দোষ আমার নিজের সৃষ্ট, না স্রষ্টার তরফ থেকে? কুকুরের একথা শুনে হযরত নূহ (আঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান ফিরে আসল তখন তিনি অনেক ক্রন্দন করেছিলেন। আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ হযরত নূহ (আঃ) কোন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত কুকুর দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, "খবীছ, দূর হ"। এরপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী আসল যে, তুমি কুকুরের প্রতি দোষারোপ করেছ না আমার প্রতি?

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির জন্যে বদদোয়া করেছিলেন, পরিণামে তদানীন্তন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি, সবাই ধ্বংস হয়েছিল, এজন্যে তিনি অনেক ক্রন্দন করেছিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি একথা বলে ক্রন্দন করতেন যে, আমি আমার পুত্র কেনানকে রক্ষা করার নিমিত্ত আল্লাহ পাকের দরবারে কেন কথা বলেছিলাম। যাহোক, বিভিন্ন অবস্থায় অধিক ক্রন্দনের কারণেই তাঁকে 'নূহ' বলা হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ হযরত আদম (আঃ)-এর পর দশটি যুগ অতিবাহিত হলে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ শুরু হয় আর তখনই মূর্তিপূজার যুগও শুরু হয়। বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকাল করেন তখন তাদের ভক্তরা তাদের কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং ভক্তরা আল্লাহর ওলীদের ছবি তাতে রেখে দেয় যাতে করে তারা তাদের জন্যে স্মারণিক হয়ে থাকেন এবং নিজেদেরকে তারা তাঁদের ন্যায় তৈরী করার জন্যে চেষ্টা করতে পারে। কিছুদিন পর তারা সেই ছবিগুলোকে মূর্তিতে রূপান্তরিত করে, আরো কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকেরা ঐ মূর্তিগুলোরই পূজা শুরু করে এবং ঐ ওলী আল্লাহগণের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করা হয়। যেমন "দূর সুয়া", "ইয়াগুস", "ইয়াউক", "নসর" প্রভৃতি।

এভাবে যখন মূর্তিপূজার প্রথা প্রচলিত হল তখন আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী করার শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, তোমরা যদি একথার প্রতি বিশ্বাস না কর তবে এর পরিণামে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের তথাকথিত নেতারা তাঁকে বলল, মনে হয় তুমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছ, আমাদেরকে আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে চাও। হযরত নূহ (আঃ) বললেনঃ আমার বিভ্রান্তির কোন প্রশ্নই উত্থিত হয়না। আমি যে আল্লাহ পাকের রসূল, আমি তাঁর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাই, আমি তোমাদের কল্যাণকামী, আমি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে এমন কিছু জানি যা তোমরা জাননা অতএব, আমার কথায় বিশ্বাস কর, এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভাষায় হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেছে, তাতে তাঁর রাগান্বিত হওয়ার কথা কিন্তু তিনি তাদের উস্কানীমূলক কথা-বার্তার জবাবে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাষায় তাদেরকে সত্য কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ.

হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই, তবে কথা শুধু এতটুকু যে, আমি পূর্ব পুরুষের গোমরাহী এবং মূর্খতার অনুসারী নই; বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের রসূল, তাঁর তরফ থেকে তোমাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছি, আমি তাঁর কথাই তোমাদের নিকট পৌঁছাই, আর এমন কথা বলি যাতে রয়েছে তোমাদের সার্বিক কল্যাণ, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দেই, তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে অবগত নও, তাই আমি এ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করি, আমার ভয় হয় যে কেয়ামতের কঠিন দিনে তোমরা আল্লাহ পাকের ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন হবে আর আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কথা জানি যা তোমরা আদৌ জাননা, অতএব সাবধান হও।

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنٰهُ
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۚ قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ
سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ
لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

তরজমা

(৬৩) তোমরা কি এজন্যে অবাক হও যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে উপদেশ এসেছে যেন সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরা সাবধান হও এবং হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

(৬৪) তবুও তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে, আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে যারা তরীতে ছিল রক্ষা করি, আর যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

(৬৫) আর আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করি, সে বলেছিল হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই, তোমরা কি ভয় কর না?

(৬৬) তার জাতির কাফের প্রধানরা বলে, আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি আর তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

(৬৭) সে বলল, হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নই কিন্তু নিশ্চয় আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের রসূল।

তফসীরুল কোরআন

হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল তা পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছেঃ

إِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

(নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি) এর তাৎপর্য হলো, হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁর নবুওয়্যতের দাবীকে বিভ্রান্তি বলে মনে করেছে। আল্লাহ্ পাক কোন রসূল প্রেরণ করবেন একথাও তারা অসম্ভব মনে করত। দ্বিতীয়তঃ তারা এ ধারণাও করত যে, আমাদের বিবেক বুদ্ধির বিচারে যা ভাল মনে হয় তা আমরা করব, আর যা মন্দ মনে হয় তা বর্জন করব। আর যে কাজে ভাল বা মন্দ কিছুই থাকবে না তা করার জন্যে যদি আমাদেরকে বাধ্য হতে হয় তবে তা করব। আর যদি বাধ্যবাধকতা না থাকে তবে সে কাজও বর্জন করব। এমন অবস্থায় রসূল প্রেরণের কোন প্রয়োজনই নেই।

তৃতীয়তঃ যদি রসূল প্রেরণ করতেই হয় তবে উত্তম হল ফেরেশতা প্রেরণ করা কেননা, সাধারণতঃ মানুষ তাদেরকে ভয় করে এবং তারা মিথ্যাবাদিতা থেকে পবিত্র, তাই একজন মানুষকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করায় হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় বিস্ময় প্রকাশ করে, তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ.

তোমরা কি আশ্চর্যন্বিত হচ্ছো যে, তোমাদের প্রতিপালকের বাণী তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির নিকট এসেছে যেন সে তোমাদেরকে সাবধান করে। আর তার সাবধানতার কারণে তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, ভীত সন্ত্রস্ত হও, যাতে করে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। একথার তাৎপর্য হল এই, এ বিষয়ে তোমাদের বিস্ময় রয়েছে? যে, আল্লাহ্ পাক একজন মানুষকে রসূল বানিয়ে প্রেরণ করবেন কেননা,

আল্লাহ পাক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের জন্যে মনোনীত করতে পারেন। এতে কারো কিছু বলার থাকে না।

এতদ্ব্যতীত একথাটিও বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, রেসালত ও নবুওয়্যতের উদ্দেশ্য মানুষের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে, ফেরেশতাদের দ্বারা নয়। কেননা, রেসালতের উদ্দেশ্য হল মানুষকে আল্লাহ পাকের এবাদতের জন্যে তৈরী করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত রাখা। আর এ উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে যখন কোন মানুষ আল্লাহ পাকের আনুগত্যের সুন্দর নমুনা পেশ করে।

পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের এ দাওয়াত নিয়ে কোন ফেরেশতা আসে যে মানবিক দুর্বলতা থেকে পবিত্র, যার আহার নিদ্রার কোন প্রয়োজন নেই, তখন মানুষ বলবে, আমরাতো ফেরেশতা নই, আমরাতো মানুষ, তাই রসূল মানুষের মধ্যে থেকেই হতে হবে। আর একথা এজন্যে বলা হয়েছে যে, কাফেররা এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করত যে, একজন মানুষ আল্লাহর রসূল হয়ে এসেছেন এবং তারা বলত, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্যে কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতে পারতেন।

আলোচ্য আয়াতে ذكر শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল রেসালত। তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে তাঁর খেলাফতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে দিয়ে সম্মান সূচক সেজদা প্রদানের মাধ্যমে হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি যদি আদম সন্তানদের মধ্য থেকে কোন লোককে নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত করেন এবং তাঁকে অসাধারণ জ্ঞান দান করেন, তবে তা আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নয়।

لِيُنْذِرَكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহর নবী যেন কুফর, শেরক এবং সকল নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন।

وَلِتَتَّقُوْا

আর তোমরা যেন সতর্কতা অবলম্বন কর, পাপাচারের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হও এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হও।

وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

যদি তোমরা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে হয়ত তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে। এখানে একথা উল্লেখ্য, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন রহমত লাভের অনিবার্য কারণ নয় কেননা, রহমত হলো নিতান্ত আল্লাহ পাকের মেহেরবানী, তাঁর দয়া। কেউ তাকওয়া পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করলেই, রহমত নাযিল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় না। এজন্যে কোন পরহেযগার ব্যক্তিকে তার পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ্য করে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, বরং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভীত সন্ত্রস্ত থাকা উচিত।

আবু নাঈম হযরত আলী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাঈলের একজন নবীর নিকট আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমার উম্মতের মধ্যে যারা নেককার পরহেযগার লোক রয়েছে তাদেরকে জানিয়ে দাও তারা যেন নিজেদের আমলের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। কেয়ামতের দিন হিসাবের সময় আমি যাকে আযাব দেয়ার ইচ্ছা করবো তাকে আযাব দেব, আর তোমার উম্মতের পাপী লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা যেন নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে না দেয়। অর্থাৎ তাদের পাপাচারের কারণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য মনে করে আল্লাহর রহমত থেকে যেন নিরাশ না হয়, কেননা আমি বড় বড় পাপী লোকদেরকেও মাফ করে দেব।[১]

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ....

আর তারা নূহকে মিথ্যাজ্ঞান করলো, তখন আমি প্রলয়ংকরী বন্যা প্রেরণ করলাম, নূহ (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে তরীতে আরোহণ করিয়ে নাজাত দিলাম এবং যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করলো তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। বস্তুতঃ তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের এ ঘটনা সূরা নূহ এবং সূরা হুদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে, হযরত যায়েদ এবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে তখন তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সংখ্যায়ও তারা ছিল অনেক।

বর্তমান ইরাকে তারা বাস করতো। আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান হলো এই, যখন কোন জাতি আল্লাহর নাফরমান হয় আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। এ অবকাশের কারণে তাদের নাফরমানী আরো বৃদ্ধি পায় এবং একদিকে তাদের শক্তি সামর্থ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে থাকে, তার পাশাপাশি তাদের পাপাচারও চরম পর্যায়ে পৌছে। তখন তারা ক্ষমতায় মদ মত্ত এবং সম্পদ ও ঐশ্বর্যের আধিক্যের কারণে উম্মাদ হয়ে যায়। এ সময় হঠাৎ আল্লাহ পাকের আযাব আসে এবং তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর তরীতে কত লোক আরোহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। আল্লামা এবনে কাসীর এবনে আবি হাতেমের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে ৮০ জন লোক ছিল, তন্মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল জোরহাম, সে আরবী ভাষায় কথা বলতো।[২]

এ পর্যায়ে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, ৮০ জনের মধ্যে ৪০ জন পুরুষ ছিল, আর ৪০ জন ছিল মহিলা। তুফানের পর তারা "মোসেল" নামক স্থানে আবাদ হয়েছিল। যে বস্তি তে তারা আবাদ হয়েছিল তা "সামানুন" নামে খ্যাতি লাভ করে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৭
২। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬৮

আলোচ্য আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, পূর্বকালের নবীগণের দাওয়াত এবং আকীদা একই ছিল, তাঁরা তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাতেন।

দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা এ সত্য প্রকাশ করা হলো যে, কত বিস্ময়করভাবে আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণকে সাহায্য করেছেন। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেও অবাধ্য কাফেররা আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পায়নি।

তৃতীয়ত, এ ঘটনার বিবরণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ পাকের নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করা মূলতঃ আল্লাহর আযাবকে নিজেদের জন্যে আহ্বান করারই নামান্তর। যেভাবে পূর্বকালের উম্মতেরা আল্লাহর অবাধ্য নাফরমান হওয়ার কারণে কোপগ্রস্ত হয়েছে ঠিক এভাবে এ উম্মতের লোকেরাও যদি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবীর মহান আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে তবে শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا.

এবং আমি আ'দ গোত্রের নিকট তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করি। আদ হলো হযরত নূহ (আঃ)-এর পৌত্র ইরমের বংশধর।

বংশ পরিচয়

আদ এবনে আওস এবনে ইরাম এবনে সাম এবনে নূহ। হযরত হুদ (আঃ) বংশগত দিক থেকে আদের ভাই। কোরআনে করীমে কোথাও আদে উলা বলা হয়েছে, আর কোথাও বলা হয়েছে "ইরামা যাতিল ইমাদ"।

এর দ্বারা জানা যায় আদ সম্প্রদায়কে ইরামও বলা হয়। আর আদে উলার মোকাবেলায় আদে সানী বা দ্বিতীয় আদও রয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আদের দাদার নাম হলো ইরাম। আর তার এক পুত্র আওসের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে আদ, যাকে আদে উলা বলা হয়।

বর্ণিত আছে যে, আদ সম্প্রদায়ের প্রতি যখন আযাব এসেছিল তখন তাদের একটি প্রতিনিধি দল মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ছিল। তারা আযাব থেকে নাজাত পেয়েছিল।[১]

আদ জাতির ঘটনা

মোহাম্মদ এবনে এছহাক লিখেছেনঃ আম্মান এবং হাযরা মাওতের মধ্যস্থলে অবস্থিত 'আহকাফ' নামক স্থানে আদ জাতি বসবাস করত। আল্লাহ পাক তাদেরকে শারীরিক শক্তি দান করেছিলেন, কিন্তু তারা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, চারিপার্শ্বের লোকদের ওপর জুলুম অত্যাচার করে, তাদের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় তাদেরই প্রতিবেশীরা। আদ জাতি ছিল মূর্তিপূজক, ছোদা, সামুদ, হাবা নামক তাদের তিনটি মূর্তি ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন হযরত হুদ (আঃ)-কে। হযরত হুদ (আঃ) একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও চরিত্র মাধুর্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান ছিলেন। তিনি তাদেরকে তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে

১। নেকাতুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৮৪৫

বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানান এবং আদেশ দেন যেন তারা কারো প্রতি জুলুম না করে। তিনি এছাড়া আর কোন কথা তাদেরকে বলেননি।

কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাঁর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে? তারা আকাশচুম্বি ইমারত নির্মাণ করে এবং অনেক কারখানা তৈরী করে এবং তাদেরকে প্রদত্ত শক্তি দ্বারা সর্বত্র ক্ষমতা বিস্তার করে। তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ পাক তিন বছর তাদের প্রতি বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। পরিণামে তারা অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়। তদানীন্তন কালে এই নিয়ম ছিল যখনই কোন মহাবিপদ দেখা দিত তখন (মুশরেক হওয়া সত্ত্বেও) তারা আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করত। কী মুশরেক, কী মুসলিম, সকলেই পবিত্র কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে হাযির হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করত। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সে যুগে আমালেকা গোত্র বাস করত। তারা আমলিক এবনে লাদের এবনে সাম এবনে নূহের বংশধর ছিল। তাদের নেতা ছিল মাআবিয়া এবনে বকর। তার মায়ের নাম ছিল কালদা বিনতুল খায়র। আর সে ছিল আদ সম্প্রদায়ের মহিলা।

অতএব, আমালেকা গোত্রের নেতা মাআবিয়া এবনে বকরের নানার খানদান ছিল আদ জাতি। তাদের এ আত্মীয়তার কারণেই মাআবিয়ার মেহমান হয় আদ জাতির প্রতিনিধি দল এবনে উনস্ এবং একিম এবনে হাজাল, আতীল এবনে জেদ এবং মারসাদ এবন সাদ (এ ব্যক্তি গোপনে মোমেন ছিল) এবং মাআবিয়া এবনে বকরের মামা যাইসামা এবনে যাছির, নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে মক্কায় আসে। এদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। এরা সকলেই মাআবিয়া এবনে বকরের মেহমান হয়। একমাস তারা মক্কায় অবস্থান করে। তারা সেখানে মদ্যপান করত এবং গান শুনত। এভাবে দু' মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। কেননা এক মাস পথে ব্যয় হয়েছে আর এক মাস তারা অবস্থান করলো। মাআবিয়া এবনে বকর বলল, এরা এসেছিলো আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করতে। কিন্তু এখানে এসে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়েছে। অথচ আমার নানার বাড়ীর লোকেরা বিপদগ্রস্ত রয়েছে। আমি তাদেরকে বের করে দিতেও লজ্জাবোধ করি। যদি আমি একথা বলি তোমরা যে কাজে এসেছ সে কাজে মশগুল হও তাহলে তারা বুঝবে যে, আমি তাদের মেহমানদারী করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

অথচ ওদিকে তাদের বাড়ি-ঘরে লোকেরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করছে। একথা শ্রবণ করে মাআবিয়া এবনে বকরের যে বাঁদীরা গান গাইত তারা বলল, আপনার বক্তব্যটি আপনি গানের ভাষায় বলুন আমরা তা সুর ধরে গাইব। সেই গান শ্রবণ করে হয়ত তারা সত্য উপলব্ধি করবে। অবশেষে মাআবিয়া এবনে বকর যে কবিতাটি রচনা করল তার মর্ম হলো 'হে কিল, হাইসম ওঠে, হয়তো আল্লাহ পাক আমাদেরকে বৃষ্টিপাত দ্বারা ধন্য করবেন। যে বৃষ্টি দ্বারা আদ জাতি তৃপ্তি লাভ করবে। তাদের অবস্থা তো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পিপাসার কারণে তারা যে কথাও বলতে পারেনা, বৃদ্ধ বা শিশুদের বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। মহিলাদের অবস্থা পূর্বে যদিও কিছু ভালো ছিল, কিন্তু এখন তারাও বিপদগ্রস্ত। আদ জাতির লোকদেরকে খাওয়ার জন্যে চতুঃস্পদ জন্তুগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আর আদ জাতির তীরের আশঙ্কা তাদের নেই। তোমরা তো এখানে আনন্দে রয়েছ কিন্তু হে আদ জাতির প্রতিনিধিরা! তোমাদের জন্যে নেই কোন শান্তি এবং

খোশ আমদেদ'। বাঁদীদের কণ্ঠে যখন এ কবিতা তারা শ্রবণ করল তখন তাদের হুশ ফিরে আসল, তারা পরস্পর বলতে লাগল তোমাদেরকে তোমাদের সম্প্রদায় দূর্ভিক্ষের বিপদ দূরীভূত করার জন্যে দোয়া করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিল। কিন্তু তোমরা এখানে এসে বিলম্ব করেছ। এখন হরম শরীফে চল এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া কর।

মারসাদ এবনে সাদ যিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের দোয়ায় বৃষ্টি হবে না। তবে তোমরা যদি নবীর আদেশ মেনে চল এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তওবা কর তবে বৃষ্টি হবে। ঐ সময় মারসাদ তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা তাদের নিকট প্রকাশ করল এবং তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করল যার মর্ম হচ্ছে, আদ জাতি তাদের পয়গম্বরের অবাধ্য হয়েছে, পরিণামে তারা তৃষ্ণার্ত হয়েছে, আসমান একটি ফোটা বৃষ্টিও তাদের প্রতি বর্ষণ করে না।

তাদের একটি মূর্তি আছে তাকে সামুদ বলা হয়। তার সামনে রয়েছে ছোদা এবং হাবা নামক মূর্তি।

আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন। আমি সরল পথ দেখেছি। অন্ধত্ব দূরীভূত হয়েছে।

হুদের যিনি মা'বুদ, তিনি আমারও মা'বুদ। আমি আল্লাহর প্রতিই ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট রয়েছে আমার আশা।

প্রতিনিধি দলের লোকেরা মাআবিয়া এবনে বকরকে বলল, মারসাদকে আমাদের সাথে হরম শরীফে যেতে দিওনা কিন্তু মারসাদ মাআবিয়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং প্রতিনিধি দলের দোয়া করার পূর্বেই তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। যে বিপদ দূর করার প্রয়োজনে তারা দোয়া করতে এসেছিলো, তারা যদি দোয়া করত তবে তারা আরো বড় বিপদে পড়ত, কিন্তু তাদের দোয়া করার পূর্বেই মারসাদ পৌঁছে যায়, একদিকে প্রতিনিধি দল দোয়া করতে দন্ডায়মান হয়, অন্যদিকে মারসাদ ভিন্ন ভাবে দোয়া শুরু করে এই বলে, হে আল্লাহ! আমার আরজী আমার জন্যে পুরো করো। আর প্রতিনিধি দলের লোকেরা যে দোয়া করে তাতে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করোনা। এ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিল কিল এবনে উনস, তাই প্রতিনিধি দল দোয়া করল, হে আল্লাহ! কিলের দোয়া কবুল করো এবং আমাদের আরজী তার দোয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করো। এ দোয়ার সময় প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা লোকমান এবনে আদ ভিন্ন রইল, যখন প্রতিনিধি দল দোয়া শেষ করে তখন সে এই বলে দোয়া শুরু করেঃ এলাহী! আমি তোমার নিকট আমার ফরিয়াদ নিয়ে একা এসেছি, আমার দোয়া কবুল কর। একথা বলে সে তার বয়স বৃদ্ধির জন্যে দোয়া করলো। কীল এবনে উনজ বললোঃ এলাহী! যদি হুদ সত্য হয় তবে আমাদেরকে পানি দিয়ে তৃপ্তি দাও। আমরা তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি। এ দোয়ার কারণে তিন বর্ণের মেঘমালা দেখা দিল-সাদা, লাল, কালো। তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলো, নিজের ও জাতির জন্য যে কোন একটি নির্বাচন কর। তখন কীল বললো, আমি "কালো মেঘমালা" নির্বাচন করলাম কেননা, "কালো মেঘমালা" থেকে অনেক বৃষ্টি হয়। ঘোষক ঘোষণা করল তুমি ছাই পছন্দ করেছ, আদ জাতির কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। এরপর কালো বর্ণের মেঘমালা যাকে তারা পছন্দ করেছিল তা আদ জাতির দিকে রওয়ানা হল। যখন তাদের বস্তির উপর কালো মেঘ দেখা গেল তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলল, এবার অবশ্যই বৃষ্টি হবে। কিন্তু

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল বরং এটি হল আযাব যা তোমরা চেয়েছিলে। এ আযাব তার প্রতিপালকের আদেশক্রমে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। মাহদর নাম্নী একজন মহিলা ঐ মেঘমালার অভ্যন্তরে বিপজ্জনক তুফান দেখল এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর যখন চেতনা ফিরে আসল তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি কি দেখেছিলে? সে বলল, আমি অগ্নি শিখা দেখেছিলাম। যাকে কিছু লোক টেনে আনছিল।

আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে এই তুফান আদ জাতির উপর সাত রাত আট দিন অব্যাহত ছিল। ঐ তুফান তাদের সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল, আদ জাতির কেউ রক্ষা পায়নি; শুধু হযরত হুদ (আঃ) এবং তাঁর মোমেন সাথীগণকে আল্লাহ পাক এই আযাব থেকে নাজাত দিয়েছেন। তারা যে ঘরে ছিলেন সে ঘরেও তুফান প্রবেশ করত কিন্তু তা আরামদায়ক বাতাসে রূপান্তরিত হতো যা তাদের আনন্দ এবং শান্তির কারণ হতো। এদিকে আদ জাতির প্রতিনিধি দল হরম শরীফে দোয়া করার পর মাআবিয়া এবনে বকরের নিকট অবস্থান করল। আদ জাতির ধ্বংসের তিনদিন পর উষ্ট্রে আরোহণকারী এক ব্যক্তি তাদের নিকট এ ঘটনার বিবরণ পেশ করল। তারা জিজ্ঞাসা করল, যখন তুমি রওয়ানা হয়েছ তখন হুদ এবং তাঁর সাথীগণ কোথায় ছিল? সে বলল, তাদেরকে আমি সমুদ্রের তীরে রেখে এসেছি, লোকেরা তার কথায় সন্দিহান হল। কিন্তু হারমালা বিনতে বকর বললেন, মক্কার প্রতিপালকের শপথ! সে সত্য বলেছে।

বর্ণনাকারীগণ লিখেছেন, মারসাদ এবনে সাদ, লোকমান এবনে আদ এবং কীল এবনে উনজের দোয়া সমূহ কবুল হয়েছিল। তাদেরকে বলা হযেছিল যে, তোমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর। তবে তোমরা কি চাইবে তা ঠিক কর। মনে রেখ! মৃত্যু অবশ্যই আসবে, চিরস্থায়ী জীবন কারোই নয়। তাই মারসাদ দোয়া করলেন, এলাহী! আমাকে সততা এবং নেকী দান কর, তার দোয়া কবুল হয়েছে। লোকমান বললঃ এলাহী! আমাকে সুদীর্ঘ বয়স দান কর। জিজ্ঞাসা করা হলো কত বয়স চাও? লোকমান বলেছে, সাতটি শকুনের বয়স। লোকমান এ ব্যবস্থা করেছিল যে, শকুনের একটি নর শাবক ডিম থেকে বের হওয়ার পরই নিজের কাছে রেখে দিত। যখন তার পূর্ণ বয়সে মৃত্যু হত তখন দ্বিতীয় শাবক সে ধরে নিয়ে আসত। এভাবে পরপর সাতটি শাবক সে লালন-পালন করে, প্রত্যেকটির বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সর্বশেষ শকুনটির নাম ছিল লোবাদ। যখন লোবাদ মরে গেল, তখন লোকমানেরও মৃত্যু হল।

কীল বলেছিল, আমার জাতির যে অবস্থা হয় আমারও যেন সে অবস্থা হয়। গায়বী আওয়াজ আসল, তাদের তকদীরে ধ্বংস লিপিবদ্ধ আছে, কীল বলল, আমার তাতে আপত্তি নেই, জাতি ধ্বংস হওয়ার পর আমার জীবিত থাকার কোন প্রয়োজন নেই, তাই যে আযাবে আদ জাতি ধ্বংস হয়েছে সে আযাবে কীলও ধ্বংস হয়।

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ পাক আদ জাতির জন্যে বৃষ্টি ব্যতীত তুফান প্রেরণ করেছিলেন, যখন তারা দেখলো যে উটগুলোকে তাদের পৃষ্ঠের বোঝা সহ তুফান আসমান জমিনের মধ্যখানে নিয়ে যাচ্ছে তখন তারা পালিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করল। কিন্তু তুফান তাদেরকে ঘরেই পাকড়াও করল এবং ধ্বংস করল ও লাশগুলোকে বাইরে ফেলে দিল। এরপর আল্লাহ পাক কৃষ্ণ বর্ণের কিছু পাখি প্রেরণ করলেন, ঐ পাখিগুলো লাশগুলোকে উঠিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল।

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তুফান আদ জাতিকে বালুর নীচে ফেলে দিল, সাত রাত আট দিন পর্যন্ত তারা হাহাকার, আর্তনাদ করে ধ্বংস হল। এরপর তুফান তাদেরকে সমুদ্রে ফেলে দিল। সাধারণতঃ বাতাস একটি পরিমিত বেগে চলে। কিন্তু সেদিন তুফানের বায়ু প্রবাহ কত দ্রুত চলেছিল সে সম্পর্কে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না।

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ أَوَعَجِبْتُمْ
أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ط
وَاذْكُرُوْٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ
فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ج فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾
قَالُوْٓا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
اٰبَآؤُنَا ج فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬৮) আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেশ দানকারী।

(৬৯) তোমরা কি অবাক হও যে, তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে তোমাদেরই একজনের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে উপদেশবাণী এসেছে এবং স্মরণ কর যে, আল্লাহ পাক নূহের জাতির পরে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক আয়তন বৃদ্ধি করেছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের দান সমূহের কথা স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

(৭০) তুমি কি আমাদের নিকট এজন্যে এসেছ যেন আমরা শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যাদের এবাদত করতো তাদের বর্জন করি? তবে তুমি যে জিনিসের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

তফসীরুল কোরআন

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেনঃ আমি তোমাদের কল্যাণকামী, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। এভাবে আমি নবুওয়্যতের গুরু দায়িত্ব পালন করছি। তোমাদের উন্নতি অগ্রগতি তথা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তোমাদের নাজাতের জন্যে তোমাদেরকে সরল সঠিক পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছি, তোমরা এজন্যে অবাক হচ্ছো? যে, তোমাদেরই একজনের নিকট তোমাদের ভয়

প্রদর্শনের লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের বাণী এসেছে, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর মহান বাণী পৌঁছাবার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, এটি তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জির ব্যাপার।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ

তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর সেই নেয়ামতকে যে, আল্লাহ পাক নূহ (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করার পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের দৈহিক আয়তন বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত স্মরণ কর তথা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর কেননা, আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে স্মরণ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শোকর আদায় করা যায়। আর শোকর গুজারীর মাধ্যমেই মানুষ জীবন-সাধনায় সাফল্য অর্জন করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, কালবী এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেনঃ আদ জাতির লোকদের সবচেয়ে বেশী দৈর্ঘ ১০০ হাত এবং কম ৭০ হাত হতো। আবু হামজা ইয়ামানী বলেছেন, এরা সাধারণতঃ সত্তর হাত লম্বা হতো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তরফ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা আশি হাত লম্বা হতো।[১]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই, হযরত হুদ (আঃ)-এর সম্পর্কে কাফেররা অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেছে কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাদেরকে জবাব দিয়েছেন যেন তারা হেদায়েতের দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ পাক হুদ (আঃ)-এর সাথে তাদের কথোপকথনের উদ্ধৃতি দিয়ে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিনম্র ভাষায় পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে হয়। কলহ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ সম্ভব হয় না।

এ আয়াতের তফসীরে হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রহঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দৈহিক শক্তিও আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামত এবং আল্লাহ পাকের কোন নেয়ামতকে ক্ষুদ্র মনে করা উচিত নয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ.

তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, কেননা আল্লাহ পাকের নেয়ামত স্মরণ করার মাধ্যমেই মানব মন তাঁর শোকর গুজারীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ.

তারা বললো, হে হুদ! তুমি কি এজন্যেই এসেছ যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর বন্দেগী করি? না, আমরা এতে প্রস্তুত নই। অতএব, কথার প্রয়োজন কি?

তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, যদি সে আযাবের কথা সত্য হয় তবে তা নিয়ে আসলেই তো হয়, আযাব আসতে বিলম্ব কেন?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩০

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের এবং মূর্তি-পূজা বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। আদ জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করছিল, যে মূর্তিগুলোর তারা পূজা করছিল তারা যে প্রাণহীন পাথর, এগুলো কারো কোন প্রকার উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারেনা অতএব, তাদের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

কিন্তু হুদ (আঃ)-এর এ যুক্তিপূর্ণ কথার জবাবে হতভাগারা যা বলল তা আরও বেদনাদায়ক, "আমরা বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করব না, তুমি এজন্যে যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, সে আযাব নিয়ে আস"।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ তারা একথা এজন্যে বলেছে যে, তারা হযরত হুদ (আঃ)-কে সত্যবাদী মনে করতো না, তারা মনে করতো আমরা পৃথিবীতে সর্বাধিক শক্তিশালী, আমাদেরকে পরাজিত করতে পারে এমন ক্ষমতা কার? তাই তারা বললোঃ

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ.

অর্থাৎ যে আযাবের ধমকি দিচ্ছ তা নিয়ে আস, তারা ভেবেছিল আযাব যখন আসবেনা, তখন হযরত হুদ (আঃ) মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবেন।[১]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ পূর্বকালে যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের কোন নবীর উপদেশ শ্রবণ করতো এবং অকাট্য দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে কোন জবাব দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না তখন তারা বলতো, "ঠিক আছে, যে আযাবের ভয় দেখাও সে আযাব এনে দেখাও। আমরাও দেখি তা, কেমন"?[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৫৯
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪০

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ط
أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا
نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ ع
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ط قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط
هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ
اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

তরজমা

(৭১) হুদ (আঃ) বললেনঃ তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আযাব এবং আক্রোশ আপতিত হয়ে গেছে, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? এমন কতগুলো নাম নিয়ে যা তোমরা ও তোমাদের বাপ দাদারা সৃষ্টি করেছ, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

(৭২) এরপর আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে আমার রহমতে রক্ষা করি এবং যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করত এবং যারা মোমেন ছিলনা, আমি তাদের শেকড় কেটে দেই (তাদের মূলোৎপাটন করি)।

(৭৩) এবং সামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি, সে বলেছিল হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই, তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এসে গেছে, আল্লাহ্ পাকের এ উষ্ট্রীই তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন অতএব, তাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর জমিনে তাকে চরে ফিরে খেতে দাও। তাকে কোন প্রকার কষ্ট দিওনা। (যদি তা কর) তবে মারাত্মক শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আদ জাতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার বিবরণ ছিল, তারা যে শুধু হযরত হুদ (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তাই নয়, বরং তারা বলেছে, হে হুদ! তুমি আমাদেরকে আযাবের যে ভয় দেখাচ্ছ সে আযাব এখনই এনে দেখাও, আলোচ্য আয়াতে তাদের এ ধৃষ্টতার জবাব রয়েছে। হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের জন্যে যে আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে তা এসেই গেছে মনে কর অর্থাৎ আযাবের জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো? অথচ অনতিবিলম্বে তোমাদের উপর সে আযাব আপতিত হবে।

أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا

তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদার রাখা কয়েকটি নাম আঁকড়ে ধরে আছ, এগুলো তোমাদের বাতিল উপাস্যদের নাম। এ অক্ষম জড় পদার্থ মূর্তিগুলোকে তোমরা উপাস্য মনে কর, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বন্দেগী না করে তোমরা তোমাদেরই হাতে বানানো মূর্তিগুলোর সম্মুখে মাথা নত কর। তোমাদের স্ব-কপোকল্পিত দেবতাদের পক্ষে কোন দলিল প্রমাণ নেই, অথচ তোমরা এ বাতিল উপাস্যদের ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, কিন্তু আল্লাহ পাক তোমাদের দাবীর সমর্থনে কোন সনদ বা দলিল নাযিল করেননি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আদ জাতি আল্লাহ পাককে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মনে করত কিন্তু তারা উপাসনার ক্ষেত্রে দেব-দেবীকেও শরীক বলে বিশ্বাস করত, তাদের ধারণা ছিল যে, কোন কোন সৃষ্টি আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করতে পারে তাই ঐ সৃষ্টিগুলোকে তারা উপাসনার যোগ্য মনে করত। হযরত হুদ (আঃ) তাদের এ মনগড়া কথার বাতুলতা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে, এসব কথার কোন দলিল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসেনি, কোন সৃষ্টিই মানুষের এবাদতের যোগ্য হতে পারেনা অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি, অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের এ দৌরাত্ম এবং ধৃষ্টতার মূলোৎপাটন করবেন।

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

এরপর সত্যিই আল্লাহর আযাব তাদের প্রতি আপতিত হল এবং দুর্ধর্ষ আদ জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি নাজাত দিলাম হুদ (আঃ) এবং তার সঙ্গী মোমেনদেরকে। আর নিপাত করলাম আদ জাতির অবাধ্য কাফেরদেরকে যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল এবং যারা ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল।

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا.

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত হুদ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াতে হযরত সালেহ (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে। তাঁকে আল্লাহ পাক

সামূদ জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলেন। হযরত সালেহ (আঃ) ছিলেন তাদেরই স্ব-গোত্রীয় ভাই।

সামুদ জাতির পরিচয়

সামুদ এবনে আসের এবনে এরাম এবনে সাম এবনে নূহ (আঃ)। এ গোত্রটি সামুদ নামে পরিচিত হয়েছে।

ثَمَدَ الْمَآءُ

অর্থাৎ পানি কম হয়েছে, আর এ গোত্র এই নামে পরিচিত হয়েছে। সামুদ সম্প্রদায় আদ জাতির পরে আসে। তারা মদীনা শরীফ এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করতো।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবম হিজরীতে যখন তাবুকের যুদ্ধে তশরীফ নেন তখন সামুদ সম্প্রদায়ের এলাকা অতিক্রম করেন। কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। লোকেরা তাদের কূপ থেকে পানি তোলে। যখন প্রিয়নবী সাল্লালাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি আদেশ দিলেন, যতখানি পানি তাদের কূপ থেকে নেয়া হয়েছে সব ফেলে দাও। এরপর তিনি সেখান থেকে রওনা হন। আর সেই কূপের নিকট অবস্থান করেন যে কূপ থেকে হযরত সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রি পানি পান করতো। তিনি সেই কূপ থেকে পানি পান করার জন্যে আদেশ দেন।

সামুদ সম্প্রদায় অত্যন্ত অবস্থা সম্পন্ন ছিল। আল্লাহ পাক তাদেরকে অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিলেন কিন্তু এ হতভাগা সম্প্রদায় মূর্তি-পূজা করতো এবং অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হত। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের পথে আসার আহ্বান জানালেন, কিন্তু তারা ঈমান আনয়নের এ আহ্বানে সাড়া দিল না, বরং তারা তাঁর নিকট কোন অলৌকিক প্রমাণ প্রদর্শনের দাবী জানাল।

তারা তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইল এবং বললোঃ যদি তুমি এই পাথর থেকে একটি উষ্ট্রি বের করে আনতে পার তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো। হযরত সালেহ (আঃ) নামায আদায় করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন, হঠাৎ দেখা গেল পাথর থেকে বের হয়ে আসছে একটি উষ্ট্রি এবং তার পেটে যে বাচ্চা ছিল তাকে নড়াচড়া করতেও দেখা গেল। এ অলৌকিক ঘটনা দেখে কিছু লোক ঈমান আনল এবং অধিকাংশ লোকই কাফের রয়ে গেল। কিছু দিন পর উষ্ট্রিটির একটি বাচ্চাও জন্ম নিল। হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বললেন, এবার তোমরা ঈমান আন, কেননা তোমরা অলৌকিক প্রমাণ যা চেয়েছ তা পেয়েছ। হযরত সালেহ (আঃ) বললেনঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ.

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই"।

আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বরূপ এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর মোজেযা হিসেবে যে উষ্ট্রিটি পাথর থেকে বের হয়ে আসল তার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বললেনঃ

قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ.

নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসা এ উষ্ট্রিটি তোমাদের জন্যে এক বিশেষ নিদর্শন। অতএব, তাকে আল্লাহর জমিনে ঘুরে ফিরে খেতে দাও আর কোন অবস্থাতেই তার কোন ক্ষতি করোনা। যদি তা কর তবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। আলোচ্য আয়াতে بَيِّنَةٌ শব্দটির অর্থ হল সুস্পষ্ট দলিল যা মোজেযা হিসাবে নবীর নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ।

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ এটি আল্লাহ পাকের উক্তি। একথার অর্থ হল সাধারণতঃ যেভাবে উষ্ট্রির জন্ম হয় সে ব্যবস্থা ব্যতীত আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ যে উষ্ট্রিকে তিনি পয়দা করেছেন, এটি হল সেই উষ্ট্রি। অতএব, তার একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবে, চরবে, খাবে তোমরা তাকে কোনভাবেই কষ্ট দেবে না।

যদি তা কর তবে কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। বর্ণিত আছে যে, ঐ উষ্ট্রিটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, দেখতেও ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। তাকে দেখেই অন্য জন্তুরা পালিয়ে যেত। তার পানি পান করার জন্যে একটি দিন নিদৃষ্ট ছিল। ঐ দিন আর কোন জন্তু পানি পান করতো না। এ উষ্ট্রীটি ছিল আল্লাহ পাকের কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। তাই কোন উষ্ট্রীর পেট থেকে নয়; বরং পাথরের পেট থেকে বের হয়ে এসেছে। মা উষ্ট্রির পেট এবং পাথর আল্লাহ পাকের দরবারে সমান। যে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে একটি ডিম থেকে মুরগির ছানা বের করেন, তিনি যদি পাথর থেকে উষ্ট্রি বের করেন তা আশ্চর্যের কিছু নয়। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। এ বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে জুন্দা এবনে আমর নামক সামুদ সম্প্রদায়য়ের অন্যতম নেতা এবং তার সাথীগণ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে। হযরত সালেহ (আঃ) অন্যদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আহ্বান জানালেন কিন্তু তারা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ
فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ
الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا
مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

তরজমা

(৭৪) এবং স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আদ জাতির পরে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং পৃথিবীতে এভাবে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা নরম মাটিতে মহল তৈরী করছো এবং পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছো। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের দানকে স্মরণ কর আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।

(৭৫) তার জাতির অহংকারী প্রধানরা তাদের সম্প্রদায়ের যে সব লোককে দুর্বল মনে করা হতো, অথচ তারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে বললোঃ তোমরা কি মনে কর যে সালেহ্ তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্য সত্যই প্রেরিত? তারা বলল, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, আমরা তাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক হযরত সালেহ (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন এবং তারা আল্লাহ্ পাকের যে অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করছিল তা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে সামুদ জাতি! তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাক আদ জাতিকে ধ্বংস করার পর তাদের স্থলে আবাদ করেছেন, তোমাদেরকে পৃথিবীতে তিনি কর্তৃত্ব দান করেছেন, নরম মাটিতে তোমরা মহল তৈরী কর। পাহাড় কেটে তাতে গৃহ নির্মাণ কর। অতএব, এসব নেয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে প্রধানতম কর্তব্য হলো এক আল্লাহর বন্দেগী করা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। বর্ণিত

আছে, সামুদ জাতি গরম কালে ইটের তৈরী বাড়ীতে থাকত আর শীতকালে পাহাড় কেটে তাতে গৃহ নির্মাণ করে বাস করত। হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করার, তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি না করার শিক্ষা দিলেন, কিন্তু এ হতভাগারা আল্লাহর নবীর এ শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। বর্ণিত আছে যে, সামুদ জাতি তদানীন্তন পৃথিবীতে স্থাপত্য শিল্পে দক্ষতার জন্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলো।

فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ.

আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যটি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। তাদেরকে যে সব নেয়ামতের কথা স্মরণ করার তা'লিম দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে স্থাপত্য শিল্পে তাদের দক্ষতা অন্যতম। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার এ পার্থিব জীবনের উন্নতি–অগ্রগতির লক্ষ্যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করা হয় তাও আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতএব, এর জন্যেও আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা বলেছেন যে, কাফেররাও আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ভোগ করে থাকে, যেমন ঈমাম কুরতবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ

وهذا يدل على ان الكفار منعم عليهم

অর্থাৎ-এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেররাও আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ভোগ করে থাকে।

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

অর্থাৎ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। মানুষ যখন সম্প্রদশালী হয়, আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করে তখন সাধারণতঃ আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়। এমন অবস্থায় সর্বপ্রথম পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা ভুলে যায়, এ জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে– একথা ক্ষণিকের জন্যেও মনে রাখেনা। পরিণামে আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত জীবন বিধান তথা শরীয়তের বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, পাপাচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা এবং নিজের বন্দেগীর কথা ভুলে গিয়ে যা ইচ্ছা তা করে, মানুষের হক্ব নষ্ট করে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতার অবমাননা করতেও দ্বিধাবোধ করেনা।

পবিত্র কোরআন এসব কিছুকে "ফাসাদ ফিল আরদ" তথা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা বলে আখ্যায়িত করেছে এবং এমন অন্যায় কাজ পরিহার করার তাগিদ করেছে।[১]

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল–

১. আকীদা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম একই কথা বলেছেন। আর তা হল তৌহীদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁর সাথে কোন

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪১

কিছুকে শরীক না করা এবং এক আল্লাহর বন্দেগী করা। যারা এ সত্যকে গ্রহণ করবে না এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের আহ্বানে সাড়ে দেবেনা তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা।

২. পূর্বকালের উম্মতরা যখনই কোন নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে তখন তারা কোপগ্রস্ত হয়েছে। আসমানী আযাব তাদের উপর আপতিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এসব জাতির শিক্ষনীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আত্মরক্ষার জন্যে সচেষ্ট হয়। মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি এবং হযরত হুদ (আঃ)-এর জাতির কথা আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এসব জাতি আল্লাহর নাফরমানীর কারণে ধ্বংস হয়েছে শুধু তাই নয়; বরং আখেরাতেও তারা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

৩. এ আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নেয়ামত কাফেররাও ভোগ করে থাকে। যেমন আলোচ্য আয়াত সমূহে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আদ এবং সামুদ জাতির জন্যে আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছেন, তারা সেকালে আকাশচুম্বি ইমারত সমূহ নির্মাণ করেছিল এবং স্থাপত্য কলায় তারা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

৪. এতে একথাও জানা যায় আকাশচুম্বি ইমারত নির্মাণ করাও আল্লাহর নেয়ামত তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এ কাজ অবৈধ নয়। কিন্তু আল্লাহর নবীগণ এসব কাজ পছন্দ করেননি এজন্যে যে, এর কারণে মানুষ গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়। দুনিয়াদারীর এ গোলক ধাঁধায় পড়ে ভুলে যায় স্বয়ং স্রষ্টা এবং পালনকর্তা আল্লাহ পাককে, ভুলে যায় সে তার ভবিষ্যতের কথা, পরিণতির কথা, "অবশেষে একদিন তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরতরে, আপন বলতে কেউ তার সঙ্গে যাবেনা"-এ কঠোর বাস্তবতাকেও সে ভুলে যায়। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের আনন্দ-সামগ্রীর অন্বেষণে মত্ত মুগ্ধ মাতোয়ারা হয়ে থাকে। আর এ অবস্থাই হয়েছিল আদ এবং সামুদ জাতির।[১]

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ

হযরত সালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অহংকারী প্রধানরা সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের উপহাস করতো এবং বলতো যারা ভাগ্যবান, বুদ্ধিমান, তারা যে সত্য বুঝতে পারল না তোমরা এরই মধ্যে সব বুঝে ফেলেছ! তোমরা কি সত্য সত্যই একথা মনে কর যে, সালেহ আল্লাহর নবী? তারা বললেন, এখানে মনে করার কি আছে, আমরা এ সত্য বিশ্বাস করেছি এবং একীন করেছি যে, তিনি আল্লাহর নবী, তিনি যা বলেন সত্য বলেন এবং তিনি আল্লাহর তরফ থেকে সত্যবাণী নিয়ে এসেছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত সালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের দু'দলের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে তার বিবরণ রয়েছে এ আয়াতে এবং প্রত্যেকটি দলের এক একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। কাফেরদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তারা ছিল অহংকারী, গর্ব, অহংকার এবং ঔদ্ধ্যত্য ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। এটি তাদেরই

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৫৬

কাজ ছিল যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়। আর মোমেনদের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা হল এই যে, তাদেরকে দুর্বল মনে করা হত। এটা তাদের প্রকৃত অবস্থা নয় এবং তাদের ত্রুটিও নয়; বরং যারা তাদেরকে দুর্বল মনে করে তাদেরই ত্রুটি। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, এ অহংকারী প্রধানরা মোমেনদেরকে জিজ্ঞাসা করলো– যারা ছিল সমাজে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোক, তোমরা কি সত্য সত্যই সালেহকে নবী মনে কর! তারা বললেন, মনে করার কোন কথা নেই, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা সম্পূর্ণ এক্বীন করেছি যে, তিনি আল্লাহর সত্য নবী। তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা-ও সত্য।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ
كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ
قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

তরজমা

(৭৬) অহংকারী লোকেরা বললো, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করি না।

(৭৭) এরপর তারা সেই উষ্ট্রীকে বধ করে এবং তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করে আর বলে, 'হে সালেহ! তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখাও তা নিয়ে আস, যদি তুমি সত্য নবী হও'।

(৭৮) অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প আক্রমণ করে এবং তারা প্রভাত কালে নিজ নিজ ঘরে অধঃমুখে পতিত অবস্থায় মরে থাকে।

(৭৯) এরপর সালেহ তাদের থেকে ফিরে চলে যান এবং বলেন, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে নসিহত করেছি। কিন্তু তোমরা তোমাদের কল্যাণকামীদের পছন্দ কর না'।

(৮০) এবং লূতকেও আমি প্রেরণ করেছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমরা এমন ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হও যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করে নাই।

(৮১) তোমরাতো কাম-তৃপ্তির জন্যে নারীর স্থলে নরের নিকট গমন কর। তোমরাতো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

তফসীরুল কোরআন

সামুদ জাতির মধ্যে যারা দাম্ভিক এবং অহংকারী ছিল তারা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, তোমরা যারা সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছ, তোমরা জেনে রেখ আমরা তাঁকে অবিশ্বাস করি। তারা যে শুধু আল্লাহর নবী হযরত সালেহ (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছে তাই নয়, বরং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অলৌকিকভাবে প্রেরিত উষ্ট্রীটিকেও হত্যা করেছ। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ.

এরপর তারা উষ্ট্রীটিকে বধ করে এবং তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করে, তারা আল্লাহর নিদর্শন উষ্ট্রীকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখিয়ে ছিলেন, সেই আযাবকে ত্বরান্বিত করার দাবী জানায়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যদিও কাজার এবনে সালফ নামক এক দূবৃত্ত উষ্ট্রীকে হত্যা করে, কিন্তু সমগ্র জাতি এ মন্দ কাজে রাজী ছিল তাই সকলেই হত্যা করেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজার নামক লোকটির চোখ ছিল নীল বর্ণের আর তার দেহের বর্ণ ছিল লাল যেমন ফেরাউন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে (রাঃ) বলেছিলেন, পূর্বকালের সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি ছিল সালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রীর হত্যাকারী। আর ভবিষ্যতে যত লোক আসবে তন্মধ্যে সবচেয়ে মন্দ সে ব্যক্তি, যে তোমার হত্যাকারী হবে।[১]

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.

এরপর ভূমিকম্প তাদেরকে আক্রমণ করলো এবং তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে মরে রইল। এভাবে সামুদ জাতি তার নাফরমানীর কারণে চিরতরে ধ্বংস হল।

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي.

এরপর সালেহ (আঃ) তাদের থেকে ফিরে চলে গেলেন এবং বললেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের কথা শ্রবণ করোনি। অতএব, এখন তার শোচনীয় পরিণাম ভোগ কর।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৭

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে প্রশ্ন হতে পারে ভূমিকম্পের কারণে সামুদ জাতি ধ্বংস হওয়ার পর হযরত সালেহ (আঃ) তাদের সাথে কিভাবে কথা বললেন?

এর জবাব হচ্ছে এই, মৃতদের সঙ্গে কথা বলা যায়। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদেরকে একটি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে কাফেরদের নাম ধরে এভাবে ডাক দিলেনঃ হে আবু জেহেল এবনে হেশাম! হে উমাইয়া এবনে খালফ! হে ওতবা এবনে রবীয়া! হে শায়বা এবন রবীয়া! যদি তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে নিতে তবে আজ তা তোমাদের জন্যে আনন্দের কারণ হত, আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন তোমরা কি তা সত্য পেয়েছ? আল্লাহ পাক আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। তোমরা নিজেদের নবীর জন্যে মন্দ গোত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়েছ, তোমরা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ, অন্যরা আমাকে সত্য মনে করেছে, তোমরা আমার সঙ্গে লড়াই করেছ, অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে, হে মন্দ লোকদের দল! আল্লাহ পাক আমার তরফ থেকে তোমাদের শাস্তি বিধান করেছেন। আমি আমানতদার ছিলাম কিন্তু তোমরা আমাকে খেয়ানতকারী বলেছ, আমি সত্যবাদী ছিলাম, তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ।

ঐ মুহূর্তে হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি মৃত্যুর তিন দিন পর তাদেরকে ডাক দিচ্ছেন, আপনি কিভাবে প্রাণহীন লাশগুলোর সঙ্গে কথা বলছেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমরা আমার কথা তাদের থেকে অধিকতর শ্রবণ করছো না, আমি এখন যা কিছু তাদের সাথে বলছি তারা সবই শ্রবণ করছে, কিন্তু জবাব দিতে সক্ষম হচ্ছে না। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃতদের সঙ্গেও কথা বলা যায়। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়া হয়, এমনকি সে তার আত্মীয়-স্বজনের চলাফেরার শব্দ পর্যন্ত শ্রবণ করে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত সালেহ (আঃ) মৃত লোকদের সঙ্গে এজন্যে কথা বলেছেন, যেন অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

সামুদ জাতির ইতিকথা

মোহাম্মদ এবনে এসহাক, ওহাব এবনে মোনাব্বেহ, এবনে জরীর এবং হাকেম বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আমর এবনে খারেজা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আদ জাতিকে ধ্বংস করা হল তখন সামুদ জাতি তাদের বস্তিতে আবাদ হল। এরা বেশ উন্নতি করেছিল। তাদের বয়স হত অনেক সুদীর্ঘ। তারা কাঁচা পাকা ইটের বাড়ী নির্মাণ করতো। সে বাড়ী ধূলিস্যাত হয়ে যেত। কিন্তু বাড়ীর মালিক জীবিত থাকত। অবশেষে তারা পাহাড় কেটে গর্তের মধ্যে বাড়ী নির্মাণ করতো। তারা অনেক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলো, অবশেষে নিজেরাই ধ্বংস ডেকে আনল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করতে লাগল। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য তাঁর নবী হযরত সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ

করলেন। সামুদ ছিল আরব জাতি। সালেহ (আঃ) বংশের দিক থেকে মধ্যম অবস্থার হলেও চরিত্র মাধুর্যের কারণে তাঁর মর্তবা ছিল সর্বোচ্চে। সালেহ (আঃ) রেসালত লাভের সময় যুবক ছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। আর এ অবস্থায় তাঁর চুল দাঁড়ি সাদা হয়েছে কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত কেউ তাঁর অনুসারী হয়নি। আর সামান্য সংখ্যক এমন লোক, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত অর্থাৎ তারা ছিল দরিদ্র কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত সালেহ (আঃ) দৃঢ়তার সঙ্গে তবলিগের কাজ অব্যাহত রাখেন এবং আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতে থাকেন। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, এমন কোন নিদর্শন পেশ কর, যার দ্বারা তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। হযরত সালেহ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেমন নিদর্শন চাও? তারা বললো, আগামীকাল আমাদের বার্ষিক মেলার দিন, এ দিনে সকলে তার মূর্তি নিয়ে মেলায় হাযির হয়। তুমিও ঐ মেলায় আস, তুমি তোমার মা'বুদের নিকট দোয়া কর, আমরা আমাদের উপাস্যদের নিকট দোয়া করবো। যদি তোমার দোয়া কবুল হয় তবে আমরা তোমার সঙ্গী হয়ে যাব। আর যদি আমাদের দোয়া কবুল হয় তবে তুমি আমাদের সাথী হবে। হযরত সালেহ (আঃ) তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। পরদিন অন্যদের মত হযরত সালেহ (আঃ) মেলায় গমন করলেন।

তারা তাদের মূর্তিদের নিকট আকাঙ্খা পেশ করল যেন হযরত সালেহ (আঃ)-এর দোয়া কবুল না হয়। এরপর সামুদ জাতির নেতা জুন্দা এবনে আমর এবনে আওয়াজ হযরত সালেহ (আঃ)-কে বলল, এ পাথরের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে আন। যদি তুমি তা করতে পার তবে আমরা তোমাদেরকে সত্যবাদী মনে করব এবং তোমার প্রতি ঈমান আনব।

হযরত সালেহ (আঃ) তাদের থেকে ঈমান আনয়নের সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। এরপর দন্ডায়মান হয়ে তিনি দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন। হঠাৎ ঐ পাথরের ভেতর থেকে একটি শব্দ শ্রুত হল যা সাধারণতঃ উষ্ট্রীর বাচ্চা হওয়ার সময় হয়। এরপর পাথরটি ফেটে গেল এবং তার ভেতর থেকে সামুদ জাতির ফরমায়েশ মোতাবেক একটি লম্বা চওড়া উষ্ট্রী বের হয়ে আসল। কিছুক্ষণ পর তার একটি বাচ্চাও হল। এসব বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে জুন্দা এবনে আমর এবনে আওয়াজ এবং তার গোত্রের লোকেরা মুসলমান হল। আর সামুদ জাতির অন্যান্য নেতারাও ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করল। কিন্তু জাওয়াব এবনে আমর, হোবাব, মুজাবের এবং দোবার নামক ব্যক্তিরা তাদেরকে বাধা দিল। এরাও সামুদ জাতির নেতৃস্থানীয় লোক ছিল।

হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন এ উষ্ট্রী সম্পর্কে তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করলেন। তিনি বললেনঃ এ উষ্ট্রীটি একদিন কূপে পানি পান করবে, সেদিন তোমাদের কোন উষ্ট্রী পানি পাবেনা। অন্যদিন তোমাদের উষ্ট্রী পানি পান করবে। এভাবে কিছুদিন উষ্ট্রীটি জমিনে ঘোরাফেরা করতো, পানি পান করতো, তার বাচ্চাটিও সঙ্গে থাকত, সে যেদিন পানি পান করত সেদিন সমস্ত পানি নিঃশেষ করে ফেলতো, এক ফোঁটা পানিও থাকতো না এবং সে তখন এভাবে দন্ডায়মান হতো যে, লোকেরা যার ইচ্ছা যত ইচ্ছা তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ করে তার দুধ নিয়ে যেত। এভাবে অনেক দিন চলল।

গ্রীষ্মকালে সে পাহাড়ের পাদদেশে আসত তখন তাকে দেখে ভয়ে অন্য জন্তুরা পলায়ন করত। এভাবে যেহেতু অন্য চতুঃষ্পদ জন্তু কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হতো তাই তাদের মালিকদের মন বিগড়ে গেল। তারা এ উষ্ট্রীকে হত্যা করে তাদের চতুঃষ্পদ জন্তুগুলোর পথ পরিষ্কার করার ইচ্ছা করল। অনেক আলাপ আলোচনার পর তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা

করার ব্যাপারে একমত হল। তখন কাজার এবনে সালফ নামক এক ব্যক্তি এ অন্যায় কাজের জন্যে প্রস্তুত হল। আর তার সঙ্গী হল মাসদা নামের আরেক ব্যক্তি। এরা উষ্ট্রীর প্রত্যাবর্তনের পথে ওঁত পেতে রইল। যখন উষ্ট্রীটি মাসদা নামক ব্যক্তির পার্শ্ব অতিক্রম করছিল তখন সে তার উপর তীর নিক্ষেপ করল যা উষ্ট্রীর উরুতে বিদ্ধ হল। এরপর কাজার এবনে সালফ এসে তার উপর তরবারি দিয়ে আঘাত করল। উষ্ট্রী তখন একটি চিৎকার দিল। কাযার তার বক্ষে বর্ষা দিয়ে আঘাত করল। এভাবে উষ্ট্রীকে বধ করা হল। তার গোশ্ত বন্টন করা হল, উষ্ট্রীর বাচ্চাটি মায়ের এ অবস্থা দেখে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করল। ঐ পাহাড়টির নাম ছিল সওর অথবা ফাজা।

হযরত সালেহ (আঃ) অকুস্থলে যখন আগমন করলেন তখন লোকেরা বলল, হে আল্লাহর নবী! আমাদের কোন দোষ নেই, অমুক অমুক ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করেছে, হযরত সালেহ (আঃ) বললেনঃ তোমরা উষ্ট্রীর বাচ্চাটির খোঁজ কর, যদি তাকে পাওয়া যায় তবে হয়ত তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে পার, সকলে তখন উষ্ট্রীর বাচ্চার খোঁজে বের হয়ে গেল। তাকে পাহাড়ের উপরে দেখা গেল, কিন্তু ধরা গেলনা কেননা, আল্লাহ পাক পাহাড়টিকে এত উঁচু করে দিয়েছিলেন যে তার চূড়া পর্যন্ত যাওয়া কোন পাখির পক্ষেও সম্ভব ছিলনা।

বর্ণিত আছে, উষ্ট্রীর বাচ্চাটি যখন হযরত সালেহ (আঃ)-কে দেখল তখন সে কাঁদতে লাগল, তার দু' চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল, এরপর সে তিনটি চিৎকার দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় পাথর বিদীর্ণ হল। বাচ্চাটি তাতে প্রবেশ করল। হযরত সালেহ (আঃ) তখন বললেন, উষ্ট্রীর বাচ্চাটির প্রতিটি চিৎকারের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে এক একদিনের অবকাশ। অর্থাৎ তোমরা আর মাত্র তিন দিন তোমাদের ঘরে থাকতে পারবে। আল্লাহর আযাবের এ সতর্কবাণী ভুল হতে পারেনা। হযরত সালেহ (আঃ) লোকদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ পাকের নিদর্শনের সম্মান রক্ষা করোনি অতএব, এখন শাস্তি এবং প্রতিশোধের জন্যে প্রস্তুত হও। লোকেরা তাঁর কথার প্রতি বিদ্রুপ করল এবং বলল, এ আযাব কবে আসবে? এবং তার আলামত কি হবে?

বুধবার দিন তারা উষ্ট্রী হত্যা করেছিল। তাই হযরত সালেহ (আঃ) বলেছিলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার দিন ভোরে দেখবে তোমাদের চেহারা হলুদ হয়ে গেছে এবং শুক্রবার সকালে দেখবে তোমাদের চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করেছে। আর শনিবার সকালে দেখবে তোমাদের চেহারা কাল হয়ে গেছে। এরপর রোববার সকালে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হবে।

এসব কথা শ্রবণ করে যে ৯ জন উষ্ট্রীর হত্যাকাণ্ডে শরীক হয়েছিল তারা বলল, চল আমরা সালেহকেও শেষ করে দেই, যদি তার কথা সত্য হয় যে, আগামী রোববার আযাব নিপতিত হবে তবে তার পূর্বেই তাকে হত্যা করব। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তাকেও উষ্ট্রীর কাছেই পাঠিয়ে দেব। এ পরামর্শের পর তারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার জন্যে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছল। কিন্তু ফেরেশতারা পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। যখন তাদের সাথীরা দেখল যে অনেক বিলম্ব হওয়ার পরও তারা প্রত্যাবর্তন করছে না তখন তারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর বাড়ীতে আসল, দেখল, তাদের লোকজন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তখন তারা বলল, হে সালেহ! তুমি আমাদের লোকদেরকে হত্যা করেছ, একথা বলেই তারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু তাদের অন্য সাথীরা বলল যে তোমরা তাঁকে হত্যা করতে পারবে না, কেননা সে বলেছে, তিন দিন পর তোমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব আপতিত হবে। যদি

সে সত্যবাদী হয তবে তোমরা তাকে হত্যা করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালককে আরো রাগান্বিত করবে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তোমাদের ইচ্ছা যে কোন সময় কার্যকর করা সম্ভব হবে।

একথা শ্রবণ করে লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে সবার চেহারা হলুদ হয়ে গেল। কি ছোট কি বড়, কি নারী কি পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবারই চেহারা হলুদ, এ আলামত দেখার পর তারা উপলব্ধি করল যে, আযাব অবশ্যই আসবে এবং হযরত সালেহ (আঃ) যা বলেছেন তা সত্য প্রমাণিত হল। তখন তারা আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করার স্থলে হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার জন্যে বের হয়ে পড়ল। হযরত সালেহ (আঃ) তখন বনী গনম গোত্রের নেতা তাকাব্বুলের বাড়ীতে গমন করলেন। সে যদিও মুশরেক ছিল কিন্তু তাঁকে গোপন করে রাখল, উত্তেজিত কাফেররা তাঁকে আর খুঁজে পেলনা, এর পরদিন সকালে হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করতে লাগলো এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর ঠিকানা বলার জন্যে তাদেরকে বাধ্য করল। মোমেনদের মধ্যে সাদা এবন হরম নামে এক ব্যক্তি ছিল যে হযরত সালেহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনার ঠিকানা জানার জন্যে দুশমনরা আমাদেরকে উৎপীড়ন করছে। আমরা কি আপনার ঠিকানা বলে দেব?

তিনি বললেন, হ্যাঁ বলতে পারো। তিনি আমার নিকটেই আছেন তবে তোমরা তাঁকে পাবেনা। সে ব্যক্তি তাঁর অনুমতিক্রমে তার ঠিকানা বলে দিল। তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসল। তারা যে আযাবে গ্রেপ্তার হয়েছিল তার কারণে তারা কিছু করতে পারলনা; বরং একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ভীত হতে লাগল। এরই মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেল, সকলেই চিৎকার শুরু করল, নির্দিষ্ট সময়ের একটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। পর দিন সকালে দেখা গেল সবার চেহারা রক্ত লাল হয়ে গেছে। মনে হয় কেউ যেন তাদের চেহারায় রক্ত মেখে দিয়েছে। এভাবে ক্রন্দণরত অবস্থায় সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং নির্দিষ্ট তিনদিনের দু'দিনই অতিবাহিত হল।

তৃতীয় দিন সকালে দেখা গেল তাদের চেহারা সম্পূর্ণ কালো হয়ে গেছে। এ দৃশ্য দেখে তারা আরো হাহাকার আর্তনাদ করল। হযরত সালেহ (আঃ) মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। ফিলিস্তিনের মরুভূমিতে এসে অবস্থান করলেন।

রোববার সকালে লোকেরা কাফন পরিধান করল। মুর্দাদের জন্যে যে খুশবু ব্যবহৃত হয় তা-ও ব্যবহার করল। একবার আসমানের দিকে পুনরায় জমিনের দিকে দেখতে লাগল, আযাব কোন্ দিক থেকে আসে। যখন দিনের বেশ সময় অতিবাহিত হল তখন হঠাৎ ভূমিকম্প এসে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। আসমানের দিক থেকে এত বিকট আওয়াজ হল যে, সকলের কলিজা ফেটে গেল এবং সকলেই তাদের নিজের ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। শুধু একটি পঙ্গু মেয়ে বেঁচে গেল। তার নাম ছিল জরিয়া বিনতে সালফ। মেয়েটি কাফের ছিল। তার অন্তরে হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি শত্রুতা ছিল। ভূমিকম্পের আযাব দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার পঙ্গুত্ব ঘুঁচে গেল, সে দ্রুতবেগে পলায়ন করে "ওয়াদিউল কোরা" পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং আযাবের যে অবস্থা দেখেছিল ওয়াদিউল কোরার অধিবাসীদেরকে তা জানিয়ে দিল। এরপর সে পানি চাইল, পানি পান করা মাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট এই ওহী প্রেরণ করেছিলেন যে, তোমার জাতি অচিরেই উষ্ট্রীকে হত্যা করবে। হযরত সালেহ (আঃ) সে কথা তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন। তারা বললোঃ আমরা এমন কাজ কোন

অবস্থাতেই করতে পারিনা। হযরত সালেহ (আঃ) বললেন, আগামী মাসে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে সে-ই উষ্ট্রী হত্যা করবে আর তারই কারণে নেমে আসবে তোমাদের ধ্বংস। তারা বললো, এ মাসে যত ছেলে জন্মগ্রহণ করবে আমরা তাদেরকে হত্যা করবো। ঐ মাসে দশটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে নয়টিকে তারা হত্যা করেছিল। নীল চক্ষু বিশিষ্ট লাল বর্ণের একটি ছেলে বেঁচে গেল। এই ছেলেটি অতি তাড়াতাড়ি বড় হতে লাগলো। যাদের ছেলে হত্যা করা হয়েছিল তারা বলতে লাগলো, যদি আমাদের ছেলেরা বেঁচে থাকত তবে এর মতই বড় হত। এসব চিন্তা করে তারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি রাগান্বিত হল এবং তারা বললো, এ ব্যক্তির কারণেই আমাদের ছেলেরা নিহত হয়েছে।

অতএব, চল আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সকলকে হত্যা করি। এরপর তারা এ পরামর্শ করলো, চল আমরা ভ্রমণে চলে যাই। আমরা বস্তির বাইরে গমন করে গর্তে আত্মগোপন করে থাকি, লোকেরা মনে করবে আমরা সফরে চলে গেছি, রাত্রি কালে যখন সালেহ (আঃ) মসজিদে গমন করবেন, তখন আমরা তাকে হত্যা করবো। এরপর পুনরায় গর্তে চলে যাব। সকালে আমরা বাড়ী ফিরবো। আমরা বলবো আমরাতো ঘটনার সময় বস্তিতে ছিলাম না, লোকেরাও মেনে নেবে যে, আমরা এ ঘটনার সাথে জড়িত নই। হযরত সালেহ (আঃ) রাত্রে বস্তিতে ঘুমাতেন না, তিনি রাত্রি যাপন করতেন মসজিদে, যাকে সালেহের মসজিদ বলা হত এবং সকালে এসে তাঁর জাতিকে তিনি ওয়াজ নসিহত করতেন। যাহোক, যারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো তারা বস্তির বাইরে প্রবেশ করে। আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে গর্তটি তাদের উপর ভেঙে পড়লো, তারা সেখানেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আল্লাহ পাক তাই এরশাদ করেছেন–

فَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

কিছু লোক যারা এ সম্পর্কে অবগত ছিল তারা গিয়ে দেখল ঐ লোকগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তখন তারা বস্তিতে এসে চিৎকার শুরু করলো যে, সালেহ ঐ ছেলেদেরকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদের আপনজনদেরকেও সে হত্যা করেছে। তখন সামুদ জাতি উষ্ট্রীকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়।

সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন, কাজার নামক শিশুটি যখন বেঁচে গেল তখন দেখা গেল সে অতি দ্রুত বড় হচ্ছে। অন্য বাচ্চারা এক সপ্তাহে যত খানি বড় হয় সে একদিনে ততখানি বড় হত। সে একমাসে এতখানি বড় হত যতখানি অন্য বাচ্চারা এক বছরে বড় হত। সে যখন পরিণত বয়সে পৌঁছে তখন সে অন্য লোকদের সাথে মদ্যপানে বসে। মদ তৈরীর জন্যে পানির প্রয়োজন হয় কিন্তু যেহেতু এ দিনটি ছিল উষ্ট্রীর পানি পান করার দিন তাই পানি পাওয়া গেল না। তখন তারা বললো, আমরা দুধ দিয়ে কি করবো, আমাদের পানির প্রয়োজন, যা ঐ উষ্ট্রীটি পান করে ফেললো। কাজার বললো, আমি কি তোমাদের জন্যে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করবো? লোকেরা বললো, হ্যা অবশ্যই, তখন তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করে।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের সফরে ছিলেন, তখন তিনি "হাজার" নামক স্থানে অবস্থান করেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন কেউ যেন এখানকার কূপ থেকে পানি পান না করে এবং কোন জন্তুকেও যেন পানি পান না করানো হয়। লোকেরা আরজ করলো, আমরা রুটি বানানোর জন্য আটায় এ পানি ব্যবহার করেছি। তখন তিনি এরশাদ করলেন, ঐ আটা এবং পানি ফেলে দাও।

আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, "হাজার" নামক স্থানের

কূপ থেকে যে পানি নেয়া হয়েছে তা ফেলে দাও। যে আটায় ঐ পানি ব্যবহার হয়েছে সে আটা উষ্ট্রগুলোকে খেতে দাও। আর তোমরা সেই কূপের পানি গ্রহণ কর যে কূপ থেকে উষ্ট্রী পানি পান করতো।

আল্লামা বগভী আবু যোবায়েরের সূত্রে হযরত যাবের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন তাবুকের যুদ্ধের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাজার নামক স্থান অতিক্রম করেন, তখন সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন ঐ বস্তিতে না যায় এবং সেখানকার পানিও যেন পান না করে। আর ঐ কোপগ্রস্ত লোকদের এলাকা অতিক্রম করার সময় তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অতিক্রম করবে। যেন তোমাদের উপর তেমন আযাব না আসে যেমন তাদের উপর এসেছিল। তোমরা কখনও রসূলের নিকট মোজেযা দাবী করবে না। এরা ছিল সালেহ (আঃ)-এর জাতি। তারা তাদের রসূলের নিকট মোজেযা দাবী করেছিল, আল্লাহ পাক একটি উষ্ট্রী বের করে দিয়েছিলেন, যা ঐ পাহাড়ী পথ দিয়ে পানির নিকট গমন করতো। আর পানি পান করার পর এ পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতো। ঐ লোকগুলো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করে। আল্লাহ পাক তাদের সকলকে ধ্বংস করেন। শুধু একজন লোক বেঁচে গেল যাকে আবু রেগাল বলা হত। এ ব্যক্তিই ছিল সাকীফ গোত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। সে তখন হরম শরীফের ভেতরে ছিল, তাই আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে গেল আর হরম শরীফ থেকে বের হওয়ার পর তার উপর সে আযাব আপতিত হয় যা অন্যদের জন্য এসেছিলো। লোকটি সেখানেই দাফন হয়ে যায়। দাফন হওয়ার সময় তার হাতে স্বর্ণ নির্মিত একটি লাঠি ছিল। ঐ লাঠিটিও তার সঙ্গেই মাটিতে মিশে যায়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আবু রেগালের কবর দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা তলোয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে স্বর্ণের সেই লাঠিটি বের করেছিলেন। সামুদ জাতির যেসব লোক হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। তিনি তাদের নিয়ে হাজারা মাউত গমন করেন। সেখানে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আর এজন্যেই স্থানটির নাম "হাজারা মাউত" হয়। মূলতঃ এ শব্দটি ছিল হাজারা মাউতুন, অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। আর তাই সংক্ষেপে এখন হাজরা মাউত হয়েছে। লোকেরা একটি বস্তি আবাদ করে, তার নাম সওরা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত সালেহ (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে মক্কা শরীফে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫৮ বছর। তিনি বিশ বছর কাল তাঁর জাতির মধ্যে অতিবাহিত করেন।[১]

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ.

("আর আমি লুতকে প্রেরণ করি। যখন তিনি তার জাতিকে বলেনঃ তোমরা এমন মন্দ, ঘৃণ্য এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত হও যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ করেনি, তোমরা কামনার তাড়নায় মেয়েদের স্থলে পুরুষের পেছনে ছোট। তোমরা নিতান্ত সীমালঙ্ঘনকারী"।)

এটি এ পর্যায়ের চতুর্থ ঘটনা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৯-৪৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৬

হযরত লুত (আঃ) হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ভ্রাতঃস্পুত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হিজরত করে ইরাক থেকে সিরিয়া এসেছিলেন, আল্লাহ পাক হযরত লুত (আঃ)-কে সদুম নামক শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্যে পয়গম্বর মনোনীত করেন। তদানীন্তন কালে এলাকায় পাঁচটি শহর আবাদ ছিল।

(১) সদুম (২) ওমুরাহ (৩) আদমাহ (৪) সবুবিম (৫) বালে অথবা সোগের। সদুম ঐ এলাকার রাজধানী ছিল। হযরত লুত (আঃ) নবুওয়্যত লাভের পর সদুম শহরে বাস করেন।[১] এলাকাটি ছিল অত্যন্ত উন্নত। বাগ-বাগিচা ছিল অনেক। ফলফুলের ছিল বিপুল সমাবেশ।

সাধারণতঃ মানুষ যখন পানাহারে তৃপ্তি লাভ করে, কোন প্রকার অভাব-অনটন না দেখে, তখন নিজেকে শুধু যে অহেতুক কাজে নিয়োজিত করে তাই নয়, বরং অন্যায় অনাচার অশ্লীল এবং অসামাজিক কাজেও লিপ্ত হয়। সদুমবাসী অত্যন্ত ঘৃণ্য, নিন্দনীয় অশ্লীল এবং অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতো। তারা কামাচারের উদ্দেশ্যে মেয়েদের স্থলে ছেলেদের নিকট গমন করতো, এর চেয়ে বড় মানবতা বিরোধী কাজ আর কি হতে পারে! আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা সভ্যতা ও মানবতার সকল সীমালঙ্ঘন করেছে, ইবলিস শয়তানই তাদেরকে এমন মন্দ কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। পৃথিবীতে ইতিপূর্বে এমন অন্যায় অশ্লীল কাজ আর কেউ করেনি। তাই হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে এ জঘন্য অন্যায় কাজ পরিহার করার তাগিদ করেন।

কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেনি; বরং তারা ঔদ্ধ্যত্ব প্রকাশ করেছে।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ
قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ
وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۭ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾
وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۭ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ قَدْ جَاۗءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَاۗءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۭ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

১। তফসীরে নেকাতুল কোরআন খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৬২

তরজমা

(৮২) তার জাতি উত্তরে শুধু একথাই বললো, এদেরকে বস্তি থেকে বহিষ্কার কর। এরা এমন লোক, যারা বড় পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়।

(৮৩) এরপর আমি তাকে এবং তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করি, তার স্ত্রী ছিল শুধু পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(৮৪) তাদের উপর আমি প্রস্তর বর্ষণ করি, অতএব পাপিষ্ঠদের কি পরিণাম হয়েছিল তা লক্ষ্য করে দেখ।

(৮৫) আর আমি মাদীয়ানবাসীদের নিকট তাদেরই ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করি। তিনি বলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ এবং ওজন ঠিকভাবে দিও, মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিওনা। আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি সৃষ্টি করোনা। তোমাদের জন্যে এটি উত্তম, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও'।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতা, তাদের প্রতি তাঁর উপদেশ এবং অন্যায় অশ্লীল কাজ পরিহার করার নির্দেশের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবের বর্ণনা রয়েছে। হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে তাদের নাফরমানী এবং ঘৃণ্য নিন্দনীয় আচরণ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলে তারা তার কোন কৈফিয়ত বা সদুত্তর দিতে অক্ষম হয়। তাই তারা আরো বেশী অবাধ্য হয়ে তাঁর সাথে শত্রুতা শুরু করে। এমনকি, হযরত লুত (আঃ) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে নগরী থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ.

"তারা বলে, লুত এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও"। কেননা, তারা পবিত্র, পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়। আমাদেরকেও অশ্লীল, অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়। অতএব, তাদেরকে অপবিত্র পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দাও।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ হযরত লুত (আঃ)-এর এ হতভাগ্য সম্প্রদায় তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করে বলেছেঃ

اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ.

এরা অত্যন্ত পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন লোক, যেহেতু আমরা যা করি তা তারা করেনা এবং তা পছন্দও করেনা। অতএব, আমাদের সাথে বসবাস করার তাদের কি প্রয়োজন? আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন মুজাহেদ (রঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)।[১]

১। তফসীরে এবন কাসীর (উর্দু) খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৭৮

فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

আমি লুত এবং তার স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিজনকে নাজাত দিলাম। তার স্ত্রী কোপগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন তাঁর নছিহত মানল না এবং আরো অবাধ্য হলো তখন আল্লাহ পাকের আযাব তাদের প্রতি আপতিত হল। 'সদুম' নামক শহরটিকে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) উপরের দিকে তুলে নিক্ষেপ করলেন। এরপর তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করা হল। ফলে আল্লাহর অবাধ্য নাফরমানদের দল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাদের এলাকাটি বর্তমান জর্ডানে অবস্থিত। তাদের বস্তিটি একটি নদীর মত হয়ে আছে যাকে "বাহরে মাইয়েত" বা মৃত সাগর বলা হয়। যার পানি অত্যন্ত বিষাক্ত। আল্লাহর গজবের কারণে কোন প্রাণী সেখানে বাঁচেনা, বাঁচতে পারে না।

إِلَّا امْرَأَتَهٗ

হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী ব্যতীত তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণ এবং যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন সকলকেই আল্লাহ পাক রক্ষা করেছেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিল মুনাফেক, তার অন্তরে ছিল কুফর ও নেফাক। তাই সে কোপগ্রস্ত হয়েছে।

وَأَهْلَهٗ

অর্থাৎ তাঁর মোমেন সাথীগণ অথবা তাঁর কন্যাদ্বয়। আল্লাহ পাক হযরত লুত (আঃ)-কে পূর্বেই এ আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন।

হযরত লুত (আঃ) রাতের প্রথম প্রহরে ঐ এলাকা থেকে বের হয়ে আসলেন। এরপর ভোরেই অপরাধীদের উপর শাস্তি নেমে আসে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا.

আমি তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করি, পাপিষ্ঠদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা লক্ষ্য কর।

লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কথা

মোহাম্মদ এবনে এসহাক বর্ণনা করেন যে, সদুমবাসীর অনেক বাগ-বাগিচা ছিল, তাতে অনেক সুস্বাদু ফল ধরতো, সেকালে এমনটি আর কোথাও ছিলনা, তাই বিভিন্ন এলাকার লোক এসে তাদের বাগানের ফল ছিঁড়ে নিতো, বাধা দিলেও বাধা মানতো না, ইবলিস শয়তান তাদেরকে এ পরামর্শ দেয় যারা তোমাদের বাগানের ফল নিতে আসে, তোমরা তাদের সাথে মন্দ ঘৃণ্য অশ্লীল কাজ কর, তাহলে তারা আর আসবেনা, এভাবে তোমাদের বাগানের হেফাজত হবে। সদুমবাসী এ কু-কর্মে লিপ্ত হতে অস্বীকৃতি জানায়।

কিন্তু যখন চোর ডাকাতরা ফল চুরি অব্যাহত রাখলো, সদুমবাসী বাগানে আগত ছেলেদের চুল ধরে ঐ মন্দ কাজ শুরু করে দিল, অবশেষে এ অশ্লীল, অসামাজিক কাজে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

এভাবে তারা কোপগ্রস্ত হয়। জমিনে তাদেরকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়, আর আসমান থেকে তাদের প্রতি প্রস্তব বর্ষণ করা হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. এ ঘটনায় একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ঈমান এবং নেক আমলের গুরুত্ব সর্বাধিক। পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্যের জন্য ঈমান ও নেক আমল পূর্ব শর্ত। আর ঈমান ও নেক আমলের অভাব হলে শুধু আত্মীয়তা উপকারী হয় না। হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রীর ঈমানের অভাব ছিল বলেই তাকে শাস্তি ভোগ করে ধ্বংস হতে হয়েছে। নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তার প্রতি দয়া করা হয়নি। হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্রের অবস্থাও তাই, এখানেও ঈমানেরই অভাব, তাই সে হয়েছে কোপগ্রস্ত। আর অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর পিতার ব্যাপারে, সে শুধু মূর্তি পূজক ছিলনা; বরং ছিল মূর্তির নির্মাতা, তাই তারও শাস্তি হয়েছে। পবিত্র কোরআন এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেছেঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

"সময়ের শপথ! নিশ্চয় সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে যারা ঈমান আনে এবং ঈমান মোতাবেক নেক আমল করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়"।

২. মানুষ যখন পাপ কার্যে লিপ্ত হয় তখন তার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে না, পাপ প্রবৃত্তি তাকে অন্ধ করে তোলে তখন সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে জুলুম-অত্যাচার করে। পাপ পংকিলতায়, অন্যায় অশ্লীল ও অসমাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই পরিণাম চিন্তা করে কাজ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য। পাপিষ্ঠদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছিল, তা লক্ষ্য কর।

হযরত লুত (আঃ)-এর যুগের এ জঘন্য অপরাধীদের প্রতি আল্লাহ পাকের যে আযাব হয়েছে তার বিবরণ পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আরও বিস্তারিতভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

আর মাদীয়ানবাসীর নিকট আমি তাদেরই ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করি। তিনি বলেন, "হে আমার জাতি! এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নেই"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির অন্যায় আচরণ এবং তাদের ধ্বংসের বিবরণ ছিল। আলোচ্য আয়াতে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে মাদীয়ান এলাকায় প্রেরণ করা হয়। মাদীয়ান মূলতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এক পুত্রের নাম। তাঁর বংশধররা এ এলাকায় বাস করতো, তাই তাঁর নামেই এর নামকরণ করা হয়েছে। আর তাদের নিকট হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করা হয়েছে । হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর খেতাব হল "খতীবুল আম্বিয়া"।

বংশ পরিচয়

মোহাম্মদ এবনে এসহাক তাঁর বংশ পরিচয় এভাবে লিখেছেনঃ শোয়ায়েব এবনে মিকাইল এবনে ইয়াসজার এবনে মাদীয়ান এবনে ইব্রাহীম।

ইনি সেই শোয়ায়েব (আঃ), যাঁর নিকট হযরত মূসা (আঃ) যৌবনে মিশর থেকে পলায়ন করে এসেছিলেন। তাঁর এক কন্যার সাথে মূসা (আঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল।

এরপর তিনি মিশর প্রত্যাবর্তন করেন। পথে কুহ-ই-তুরে নিকট আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লী দেখেন এবং নবুওয়্যত লাভ করেন।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় কুফর ও শেরকে লিপ্ত ছিল। প্রতারণা, ফাঁকিবাজী, ওজনে কম দেয়া, মানুষকে ঠকানো, ফাকিবাজী ছিল তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয় লুণ্ঠন, হত্যা সবই তারা করতো। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে শেরক ও কুফর পরিহার করার আহ্বান জানালেন।

মানুষের উপর দু'টি দায়িত্ব রয়েছে।

১. হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ব,

২. হক্কুল এবাদ বা বন্দার হক্ব।

হযরত শোয়য়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় দু'টি হক্বই নষ্ট করছিল। শেরক ও কুফর এবং মূর্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহর হক্ব নষ্ট করছিল। আর ওজনে কম দেয়া, ফাঁকিবাজী এবং প্রতারণার মাধ্যমে তারা মানুষের হক্ব নষ্ট করছিল। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস করার তথা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানালেন। এরপর তিনি তাদেরকে ফাঁকিবাজী, প্রতারণা পরিহার করার এবং ওজনে কম না দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নসিহতে কর্ণপাত করেনি, বরং তাদের অহংকারী প্রধানরা হযরত শোয়ায়েব (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ঐ এলাকা থেকে বের করে দেয়ার ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ কথা বলে। অবশেষে এক ভয়ংকর ভূমিকম্প এসে তাদের মূলোৎপাটন করে। হযরত শোয়ারেব (আঃ)-এর প্রতি অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত শোয়ায়েব (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে এ আযাব থেকে রক্ষা করেন।

পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে মাদীয়ানবাসীর নিকট প্রেরণের কথা রয়েছে। আর অন্য আয়াতে রযেছে তাঁকে আসহাবুল আইকার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ হয়ত একই স্থানের দু'টি নাম হবে অথবা এই নাম দু'টি গোত্রের, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে উভয় গোত্রের নিকটই প্রেরণ করা হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর আলোচনা করতেন তখন বলতেন তিনি খতীবুল আম্বিয়া ছিলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট অতি আকর্ষণীয় ভাষায় বক্তব্য পেশ করতেন।

পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে এ নসিহতও করেছিলেন যেন তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি না করে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবীগণ শুধু যে এবাদত-বন্দেগীর শিক্ষা দিতেন তাই নয়; বরং পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করারও তাগিদ দিতেন। পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি না করার তাগিদ রয়েছে।

বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে তার কারণ হল পবিত্র কোরআনের শিক্ষা বিস্মৃত হওয়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ না করা। আজকের অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি লাভের একমাত্র পথ হল পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ, শান্তি দূত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্ত বায়ন। বিশ্ববাসী যত দিন এ সত্য উপলব্ধি না করবে ততদিন পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করবে।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا
فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاِنْ
كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا
فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

তরজমা

(৮৬) এবং যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দানের লক্ষ্যে পথে বসোনা। আর আল্লাহর পথে বক্রতা অনুসন্ধান করোনা। স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ পাক তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা লক্ষ্য কর।

(৮৭) আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন তোমরা সবর অবলম্বন কর, তিনিই যে উত্তম মীমাংসাকারী।

তফসীরুল কোরআন

বর্ণিত আছে যে, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় পথে বসে থাকত। যখনই কোন ব্যক্তি হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট গমন করার ইচ্ছা করতো তখন তাকে বাধা দিত এবং বলতো, শোয়ায়েব মিথ্যাবাদী, তুমি যদি তার কাছে যাও তবে তোমার ধর্মকে শেষ করে দেবে। মাদীয়ানবাসীর দুবৃত্তরা মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতো, হত্যা করার হুমকি দিত। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ.

"আর তোমরা মানুষকে আল্লাহ পথ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে পথে বসোনা"।

নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া একটি অন্যায় আর অন্যকে সরল সঠিক পথ গ্রহণে বাধা দেয়া তার চেয়ে বড় অন্যায়। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় উভয় অন্যায় কাজেই লিপ্ত ছিল। তারা পথে বসে থাকত। পথচারীদের ভীতি প্রদর্শন করে তাদের টাকা-পয়সা লুণ্ঠন করতো। তাই এরশাদ হয়েছে, তোমরা পথে বসে মানুষের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করোনা। পয়গম্বরের নিকট যেতে বাধা দিওনা এবং তারা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো, তাতে খুঁত তালাশ করতো। এ ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে صراط অর্থ দ্বীনের পথ। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখনই দেখতো কেউ আল্লাহর পথে চলছে, সরল সঠিক পথ গ্রহণ করছে তখন তাকে ভয় প্রদর্শন করতো। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) একদিকে তাঁর সম্প্রদায়কে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করার, মানুষের হক্ব বিনষ্ট না করার তাগিদ করেছেন অন্যদিকে পৃথিবীতে অশান্তি-উপদ্রব না করার নির্দেশ দিয়েছেন, একই সাথে মানুষকে লুণ্ঠন না করার এবং সত্য ধর্ম গ্রহণে বাধা না দেয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। এর পাশাপাশি আল্লাহর দ্বীনে কোন প্রকার ত্রুটি বা খুঁত তালাশ না করার শিক্ষা দিয়েছেন, কেননা এসবই আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এবং মানব জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ.

আর তোমরা স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমাদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। আজ তোমরা যে জনবল ধনবলের কারণে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছো, আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হচ্ছো– এসবতো তোমাদের কাছে ছিল না, আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়েই তোমরা এসব কিছু লাভ করেছ। অতএব, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তোমাদের কর্তব্য। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনয় প্রকাশ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করাই হল তোমাদের জন্যে সঠিক পথ। কিন্তু তবুও যদি তোমরা সত্য পথ গ্রহণে প্রস্তুত না হও তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ পাকই আমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ.

আমি যা নিয়ে এসেছি, তার উপর যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে আর একদল ঈমান না আনে তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। অর্থাৎ উচিত ছিল তোমরা সত্যের উপর ন্যায়ের উপর একমত হতে, সকলেই এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে, কিন্তু তোমরা যখন দলাদলি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ, একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে অপ্রস্তুত হয়েছ তবে অপেক্ষা কর, আমাদের মাঝে আল্লাহ পাকই ফয়সালা করবেন। যারা কাফের হবে, তারা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যারা মোমেন হবে, তারা নাজাত পাবে। আর আযাব দুনিয়াতেও হতে পারে এবং আখেরাতেও হতে পারে।

وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ.

আল্লাহ পাকই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। তাঁর মীমাংসায় জুলুমের কোন সম্ভাবনা নেই এবং সে মীমাংসা অমান্য করার ক্ষমতাও কারো নেই।[১]

এ আয়াতে কাফেরদের জন্যে সতর্কবাণী এবং মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৩ সফর ১৪১১, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ ইং তফসীরে নূরুল কোরআনের অষ্টম খন্ড (আট পারা) শেষ হলো।

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৭৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫০